সংসার।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

দেবীপ্রসন্ন বাবু।

ভবানীপুরের কায়স্থদিগের মধ্যে দেবীপ্রসন্ন বাবুর ভারি নাম। তাঁহার বয়স পঞ্চাশ বৎসর হইবে, কিন্তু তাঁহার শরীরখানি এখনও বলিষ্ঠ, স্থূল ও গৌর বর্ণ। তাঁহার প্রসন্ন মুখে হাস্য সর্ব্বদাই বিরাজমান এবং তাঁহার মিষ্ট কথায় সকলেই আপ্যায়িত হইত। তাঁহাদের অবস্থা এককালে বড় মন্দ ছিল, দেবীপ্রসন্ন বাবু বাল্যকালে অনেক ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন, এবং অল্প বয়সেই লেখা পড়া ছাড়িয়া সামান্য বেতনে একটী "হৌসে" কর্ম্ম লইয়াছিলেন। তথায় অনেক বৎসর পর্য্যন্ত বিশেষ কোন উন্নতি করিতে পারেন নাই, অবশেষে হৌসের সাহেবকে অনেক ধরিয়া পড়ায় সাহেব বিলাত যাইবার সময় হৌসের পুরাতন ভৃত্যের পদ বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। সৌভাগ্য যখন একবার উদয় হয় তখন ক্রমেই তাহার জ্যোতি বিস্তার হয়। সেই সময় তিন চার বৎসর হৌসের অনেক লাভ হওয়ায় সাহেবগণ বড়ই তুষ্ট হইয়া শেষে দেবী বাবুকেই হৌসের বড় বাবু করিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য তখন দেবী বাবুর বিলক্ষণ দু পয়সা আয় হইল, এবং তিনি ভবানীপুরের পৈতৃক বাড়ীর অনেক উন্নতি করিয়া সম্মুখে একটী সুন্দর বৈঠকখানা প্রস্তুত করাইলেন, এবং সুন্দররূপে সাজাইলেন। বৈঠকখানায় দেবী বাবু প্রত্যহ ৮ টার সময় বসিতেন, প্রত্যহ অনেক লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন।

ক্রমেই দেবীবাবুর নাম বিস্তার হইতে লাগিল। দুর্গোৎসবের সময় তাঁহার বাটীতে বহু সমারোহে পূজা হইত, এবং যাত্রা ও নাচ দেখিতে ভবানীপুরের যাবতীয় লোক আসিত। তদ্ভিন্ন বাড়ীতে একটী বিগ্রহ ছিল,

প্রত্যহ তাহার সেবা হইত, এবং বাড়ীর মেয়েরা নানারূপ ব্রত উপলক্ষে অনেক দান ধর্ম্ম করিত। দুই একজন করিয়া দেবীবাবুর দরিদ্রা জ্ঞাতি কুটুম্বিনীগণ সেই বিস্তীর্ণ বাটীতে আশ্রয় পাইল, পাড়ার মেয়েরাও সর্ব্বদা তথায় আসিত, সুতরাং বাহির বাটী ও ভিতরবাটী সমান লোকসমাকীর্ণ।

হেমচন্দ্র কলিকাতায় আসিবার পর অল্প দিনের মধ্যেই দেবীপ্রসন্ন বাবুর সহিত আলাপ করিলেন, এবং দেবী বাবুও সেই নবাগত ভদ্রলোককে যথোচিত সম্মান করিয়া আপন বৈটকখানায় লইয়া যাইতেন। বৈঠকখানায় সুন্দর পরিষ্কার বিছানা পাতা আছে, দুই তিনটী মোটা মোটা গিদ্দে, এবং একটী কুলুঙ্গিতে দুইটী শামাদান। ঘরের দেয়াল হইতে জোড়া জোড়া দেয়ালগিরি বস্ত্রে ঢাকা রহিয়াছে এবং নানারূপ উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট ছবিতে পরিপূর্ণ। কোথাও হিন্দু দেবদেবীদিগের ছবি রহিয়াছে, তাহার পার্শ্বে জর্ম্মনি দেশস্থ অতি অল্প মূল্যের অপকৃষ্ট ছবিগুলি বিরাজ করিতেছে। সে ছবির কোন রমণী চুল বাঁধিতেছে, কেহ স্নান করিতেছে, কেহ শুইয়া রহিয়াছে; কাহারও শরীর আবৃত, কাহারও অর্দ্ধেক আবৃত, কাহারও অনাবৃত। আবার তাহাদের মধ্যে কারেজীওর একখানি "মেগ্‌ডেলীন", টিসীয়নের "ভিনস্‌" ও লেণ্ডসিয়রের এক জোড়া হরিণ ও বিকাশ পাইতেছে, কিন্তু সে ছাপা এত নিকৃষ্ট যে ছবিগুলি চেনা ভার। বহুবাজারে বা নিলামে যাহা শস্তা পাওয়া গিয়াছে এবং দেবী বাবু বা দেবী বাবুর সরকারের রুচি সম্মত হইয়াছে, তাহাই ছাপা হউক, ওলিও গ্রাফ হউক, সংগ্রহ পূর্ব্বক বৈটকখানার দেয়াল সাজান হইয়াছে।

হেম সর্ব্বদাই দেবী বাবুর সহিত আলাপ করিতে যাইতেন এবং কখন কখন সময় পাইলে আপনার কলিকাতা আসার উদ্দেশ্যটী প্রকাশ করিয়াও বলিতেন। দেবী বাবু অনেক আশ্বাস দিতেন, বলিতেন হেম বাবুর মত লোকের অবশ্যই একটী চাকুরি হইবে, তিনি স্বয়ং সাহেবদের নিকট হেম বাবুকে লইয়া যাইবেন, হেম বাবুর ন্যায় লোকের জন্য তিনি এই টুকু করিবেন না তবে কাহার জন্য করিবেন?—ইত্যাদি। এইরূপ কথাবার্ত্তা শুনিয় হেমচন্দ্র একটু আশ্বস্ত হইলেন; দেবীপ্রসন্ন বাবুর প্রধান গুণ এইটী

যে তাহার নিকট শত শত প্রার্থী আসিত, তিনি কাহাকেও আশ্বাস বাক্য দিতে ক্রটী করিতেন না।

কিন্তু কার্য্য সম্বন্ধে যাহাই হউক না কেন, ভদ্রাচরণে দেবী বাবু ক্রটী করিলেন না। তিনি দুই তিন দিন হেম ও শরৎকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন, এবং তাঁহার গৃহিণী হেম বাবুর স্ত্রীকে একবার দেখিতে চাহিয়াছেন বলিয়া পাঠাইলেন। বিন্দু কায কর্ম্ম করিয়া প্রায় অবসর পাইতেন না, কিন্তু দেবী বাবুর স্ত্রীর আজ্ঞা ঠেলিতে পারিলেন না, সুতরাং এক দিন সকাল সকাল ভাত খাইয়া সুধাকে ও দুইটী ছেলেকে লইয়া পালকী করিয়া দেবী বাবুর বাড়ী গেলেন। দেবী বাবু তখন আপিশে গিয়াছেন, সুতরাং বহির্বাটী নিস্তব্ধ; কিন্তু বিন্দু বাড়ীর ভিতর যাইয়া দেখিলেন সে অন্দর মহল লোকাকীর্ণ। উঠানে দাসীরা কেহ ঝাট দিতেছে কেহ ঘর নিকাইতেছে, কেহ কাপড় শুখাইতে দিতেছে, কেহ এখনও মাছ কুটিতেছে, কেহ সকল কার্য্যের বড় কার্য্য—কলহ করিতেছে। কলিকাতার দাসীগণের বড় পায়া, মা ঠাকরুণের কথাই গায়ে সয় না,—কোনও আশ্রিতা আত্মীয়া কিছু বলিয়াছে তাহা সহিবে কেন—দশ গুণ শুনাইয়া দিতেছে, ভদ্র রমণী সে বাক্যলহরী রোধ করার উপায়ান্তর না দেখিয়া চক্ষুর জল মুছিয়া স্থানান্তর হইলেন। পাতকো তলায় ঝি বৌয়ের হাট, সকলে একেবারে নাইতে গিয়াছে, সুতরাং রূপের ছটা, গল্পের ছটা, হাস্যের ছটার শেষ নাই। আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই সুন্দরীগণ তথায় অবর্ত্তমানা প্রিয় বন্ধুদিগের চরিত্রের শ্রাদ্ধ করিতেছিলেন। কেহ গুল দিয়ে দাঁত মাজিতে মাজিতে বলিলেন, "হেঁলা ও বাড়ীর ন বৌয়ের জাঁক দেখিছিস, সে দিন যগ্‌গিতে এসেছিল তা গয়নার জাঁকে আর ভুঁয়ে পা পড়ে না, হেঁ গা তা তার স্বামীর বড় চাকুরি হয়েছে হই-ইচে, তা এত জাঁক কিসের লা।" কেহ চুল খুলিতে খুলিতে কহিলেন "তা হোক বন, তার জাঁক আছে জাঁকই আছে, তার শাশুড়ী কি হারামজাদা। মা গো মা, অমন বৌ-কাঁটকী শাশুড়ী ত দেখিনি, বৌকে স্বামী ভালবাসে বলে সে বুড়ী যেন দু চক্ষে দেখতে পারে না। ঢের ঢের দেখেছি, অমনটী আর দেখিনি।" অন্য সুন্দরী গায়ে জল ঢালিতে ঢালিতে বলিলেন "ও সব সোমান গো, সব সোমান, শাশুড়ী আবার কোন্ কালে মায়ের মত হয়," দু বেলা

খকুনি খেতে খেতে আমাদের প্রাণ যায়।" "ওলো চুপ কর লো চুপ কর, এখনি নাইতে আসবে, তোর কথা শুনতে পেলে গায়ের চামড়া রাখবে না। তবু বন আমাদের বাড়ী হাজার গুণে ভাল, ঐ ঘোষেদের বাড়ীর শাশুড়ী মাগীর কথা শুনেছিস, সে দিন বউকে কাঠের চালাব বাড়ী ঠেঙ্গিয়েছিল।" "তা সে শাশুড়ীও যেমন বৌও তেমন, সে নাকি শাশুড়ীর উপর রাগ করে হাতের নো খুলে ফেলেছিল, তাহাতেই ত শাশুড়ী মেরেছিল।" "তা রাগ করবে না, গায়ের জ্বালায় করে, স্বামীটাও হয়েছে নক্ষীছাড়া, তার মা ও তেমনি, তা বৌয়ের দোষ কি ?" ইত্যাদি।

রান্নাঘরে কোন কোন বৃদ্ধা আত্মীয়াগণ বসিয়াছিলেন, কেহ বা গিন্নীর জন্য ভাত নামাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, কেহ দু'টা কথা কহিতে আসিয়াছিলেন, কেহ ছেলে কোলে করে কেবল একটু ঝিমোতে ছিলেন। বামীর মা ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন "হে লা ও পালকী করে কারা আজ এলো ? ঐ যে হন্ হন্ করে শিড়ি দে উঠে গিন্নীর কাছে গেল।" শ্যামীর মা, "তা জানিস নি ওরা যে এক ঘর কায়েত কোন পাড়া গাঁ থেকে এসেছে, এই ভবানীপুরে আছে, তা ঐ বড় যেটা দেখলি, তার স্বামী বুঝি বাবুর আপিষে চাকরি করবে, ওর বন ছোটটা বিধবা হয়েছে। গিন্নী ওদের ডেকে পাঠিয়েছিল।" "না জানি কেমন তর কায়েত, গায়ে দুখানা গয়না নেই, নোকের বাড়ী আসবে তা পায়ে মল নেই,. খালি গায়ে ভদ্র নোকের বাড়ী আসতে নজ্জা করে না ?" "তা বোন, ওরা পাড়া গাঁ থেকে এছে, আমাদের কলকেতার চালচোল এখনও শেখেনি।" "তা শিখবে কবে ? দু ছেলের মা হয়েও শিখলে না ত শিখবে কবে ?" "তা গরিবের ঘরে সকলেরই কি গয়না থাকে ?" "তবে এমন গরিবকে ডাকা কেন ? আমাদের গিন্নীর ও যেমন আক্কেল, তিনি যদি ভদ্র ইতর চিনবেন তবে আমাদেরই এমন কষ্ট কেন বল ? এই ছিলুম আমার মাসতুত বনের বাড়ী, তা সে আমার কত যত্ন করত, দুবেলা দুধ বরাদ্দ ছিল। তারা নোক চিনত। গিন্নী যদি লোক চিনবে তবে আমার এমন দুরবস্থা ? তা গিন্নীরই দোষ কি বল ? যেমন বাপ মায়ের মেয়ে তেমনি স্বভাব চরিত্র,—টাকা হলে জাত ত আর ঘোচে না।" এইরূপে বৃদ্ধা আপন

গৌরব নাশের আক্ষেপ ও আশ্রয়দাত্রী ও তাঁহার পিতা মাতার অনেক সুখ্যাতি প্রকটিত করিতে লাগিলেন।

বিন্দু ও সুধা সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া রেল দেওয়া বারাণ্ডা দিয়া গিন্নীর শোবার ঘরে গেলেন। গিন্নী তেল মাখছিলেন একজন আশ্রিতা আত্মীয়া তাঁহার চুল খুলিয়া দিতেছিলেন, আর একজন বুকে বেশ করে তেল মালিস করিয়া দিতেছেন। তাঁহার বুকে কেমন এক রকম ব্যথা আছে (বড় মানুষ গিন্নীদের একটা কিছু থাকেই.) তা কবিরাজ বলিয়াছে রোজ স্নানের আগে এক ঘণ্টা করিয়া বেশ করে তেল মালিস করিতে। গিন্নী দেবী বাবুর ন্যায় বলিষ্ঠ নহেন, তাঁহার শরীর শীর্ণ, চেহারা খানা একটু রুক্ষ, মেজাজটা একটু খিট্‌খিটে. সেই বৃহৎ পরিবারের আত্মীয়া, দাসী. বৌ. ঝি. সকলেই সে মেজাজের গুণ প্রত্যহই সকাল সন্ধ্যা অনুভব করিত, শুনিযাছি দেবী বাবু স্বয়ং রজনীকালে তাহার কিছু কিছু আস্বাদন পাইতেন দেবী বাবু স্বয়ং বিষয় করিয়াছেন. তাঁহার আচরণটী পূর্ব্ববৎ নম্র ছিল, কিন্তু নূতন বড় মানুষের মহিষীর ততটা নম্রতা অসম্ভব, নবাগত ধন দর্প দেবী বাবুর গৃহিণীতেই একমাত্র আধার পাইয়া দ্বিগুণ ভাবে উথলিয়া উঠিয়াছিল ?

গিন্নী। "কে গা তোমরা ?"

বিন্দু। "আমরা তালপুখুরের বোসেদের বাড়ীর গো, এই কলকেতা এসেছি। আপনি আসতে বলেছিলেন, কাযের গতিকে এত দিন আসতে পারিনি, তা আজ মনে করলুম দেখা করে আসি।"

গিন্নী। "হাঁ হাঁ বুঝেছি, তা বস বন। তখনকার কালে নূতন নোক এলেই পাড়ার লোকেদের সঙ্গে দেখা করা রীতি ছিল, তা এখন বাছা সে রীতি উঠে গিয়েছে, এখন নোকের কোথাও যাবার বার হয় না। তা তবু ভাল তোমরা এসেছ, ভাল। তালপুখুর কোথায় গা ? সেখানে ভদ্র নোকের বাস আছে ?"

বিন্দু। "আছে বৈকি, সেখানে তিরিশ চল্লিশ ঘর ভদ্রনোক আছে, আর অনেক ইতর নোকের ঘর আছে। ঐ বর্দ্ধমান জেলার নাম শুনেছেন, সেই জেলায় কাটওয়া থেকে ৭। ৮ ক্রোশ পশ্চিমে তালপুখুর গ্রাম।"

গিন্নী। "হাঁ২ কাটওয়া শুনেছি বৈ কি —ঐ আমাদের ঝিয়েরা সব সেইখান থেকে আসে।" অল্প হাস্য সেই ধনাঢ্যের গৃহিণীর ওষ্ঠে দেখা দিল। বিন্দু চুপ করিয়া রহিলেন। ক্ষণেক পর গৃহিণী বলিলেন "ঐটি বুঝি তোমার বন?• আহা এই কচি বয়সে বিধবা হয়েছে! তা ভগবানের ইচ্ছা, সকলের কপালে কি সুখ থাকে তা নয়, সকলের টাকা হয় তা নয়, বিধাতা কাউকে বড় করেন কাউকে ছোট করেন।"

প্রথম সংখ্যক আশ্রিতা, যিনি চুল খুলিয়া দিতেছিলেন, তিনি সময় বুঝিয়া বলিলেন "তা নয় ত কি, এই ভগবানের ইচ্ছায় আমাদের বাবুর যেমন টাকা কড়ি, ঘর সংসার, তেমন কি সকলের কপালে ঘটে? তা নয়, ও যার যেমন কপালের লিখন।"

দ্বিতীয় সংখ্যক আশ্রিতা অনেকক্ষণ ক্রমাগত তেল মালিশ করিতে করিতে হাঁপাইতেছিলেন। তিনি দেখিলেন তাঁহারও একটী কথা এই সময়ে বলিলে আশু মঙ্গলেব সম্ভাবনা আছে। বলিলেন "কেবল টাকা কড়ি কেন বল বন, যেমন মান, তেমনি যশ, তেমনি লেখা পড়া, সাহেব মহলে কত সম্মান। লক্ষ্মী সরস্বতী যেন ঐ খাটের খুরোয় বাঁধা আছে।"

ঈষৎ হাস্যের আলোক গিন্নীর রুক্ষ বদনে লক্ষিত হইল, কথাটী তাঁহাব মনের মত হয়েছিল। একটু সদয় হইয়া সেই আশ্রিতাকে বলিলেন "আহা তুমি কতক্ষণ মালিশ করবে গা? তুমি হাঁপাচ্ছ যে। আর সব গেল কোথা, কাযের সময় যদি একজন লোক দেখ্‌তে পাওয়া যায়, সব রান্নাঘরের দিকে মন পড়ে আছে তা কায করবে কেমন করে?"

তীব্র স্বরে এই কথাগুলি উচ্চারিত হইল, দাসীতে২ এই কথা কানা কানি হইতে হইতে তারের খবরেব ন্যায় পাতকোতলায় পহুঁছিল। সহসা তথায় যুবতীদিগের হাস্যধ্বনি থামিয়া গেল, বৌয়ে বৌয়ে ঝিয়ে ঝিয়ে কানা কানি হইতে হইতে সেই খবব রান্নাঘরে গিয়া পহুঁছিল। তথায় যে উনানে কাট দিতে ছিল সে স্তম্ভিত হইল, যে ঝিমাইতেছিল সে সহসা জাগরিত হইল, ও শ্যামীর মা ও বামীর মা গিন্নীর সুখ্যাতি প্রকটিত করিতে করিতে সহসা হৃদ্‌কম্প বোধ করিল। তাহারা ঊর্দ্ধশ্বাসে রান্নাঘর হইতে উপরে আসিয়া সভয়ে গিন্নীর ঘরে প্রবেশ করিল।

বামীর মা। "হে গা আজ বুকটা কেমন আছে গা? আমি এই রান্নাঘরে উনুনে কাট দিচ্ছিলুম তাই আস্‌তে পারি নি, তা একবার দি না বুকটা মালিস করে।"

গিন্নী। "এই যে এসেছ, তবু ভাল। তোমাদের আর বার হয় না, নোকটা মরে গেল কি বেঁচে আছে একবার খোঁজ খবরও কি নিতে নেই। উঃ যে বেথা, একি আর কমে, পোড়ামুখো কবরেজ এই এক মাস ধরে দেখছে তা ও ত কিছু কত্তে পাল্লে না। তা কবরেজেরই বা দোষ কি, বাড়ীর নোক একটু সেবা টেবা করে, একটু দেখে শুনে তবে ত ভাল হয়। তা কি কেউ করবে? বলে কার দায়ে কে ঠেকে?"

বামীর মা ও শ্যামীর মা আর প্রত্যুত্তর না করিয়া দুই জনে দুই পাশে বসিয়া মালিশ আরম্ভ করিল, গিন্নী পা দুটী ছড়াইয়া মুখে তেল মাখিতে মাখিতে আবার বিন্দুর সহিত কথা আরম্ভ করিলেন।

গৃহিণী। "তোমার ছেলে দুটী ভাল আছে, অমন কাহিল কেন গা?"

বিন্দু। "ওরা হয়ে অবধি কাহিল, মধ্যে মধ্যে জ্বর হয়, আর ছোটটীর আবার একটু পেটের অসুখ করেছিল, এখন সেরেছে।"

গৃহ। "তাইত. হাড় গুণো যেন জির জির করছে! তা বাছা একটু জেয়দা করে দুদ খাওয়াতে পার না, তা হলে ছেলে দুটী একটু মোটা হয়। এই আমার ছেলেদের দিন এক সের করে দুদ বরাদ্দ, সকালে আধ সের বিকেলে আধ সের। তা না হলে কি ছেলে মানুষ হয়?"

বিন্দু। "দুদ খায়, গয়লানীর যে দুদ, আদ্দেক জল, তাতে আর কি হবে বল?"

গৃ। "ও মা ছি! তোমরা গয়ালনীর দুদ খাওয়াও, আমাদের বাড়ীতে গয়লানী পা দেবার যো নেই। আমাদের বাড়ীর গরু আছে, ঐ সে দিন ৮০ টাকা দিয়ে বাবু আপিষের কোন সাহেবের গরু কিনে এনেছেন, ৫ সের করে দুদ দেয়। তা ছাড়া দুটা দিশি গরু আছে, তাহারও ৩।৪ সের দুদ হয়। বাড়ীর গরুর দুদ না খেয়ে কি ছেলে মানুষ হয়, গয়লানীর আবার দুদ, সে পচা পুখুরের পানা বৈত নয়, সে নদ্দমার জল বৈত নয়।"

বিন্দু একটু ক্ষীণ স্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন "তা সকলের ত সমান

অবস্থা নয়, ভগবান্ আপনার মত ঐশ্বর্য্য ক জনকে দিয়াছেন? আমরা গরু কোথা পাব বল? যা পাই তাইতে ছেলে মানুষ কত্তে হয়।"

একটু হৃষ্ট হইয়া গৃহিণী বলিলেন,

"তা ত বটেই। তা কি করবে বাছা, যেমন করে পার ছেলে দুটীকে মানুষ কর। তা যখন যা দরকার হবে আমার কাছে এস. আমার বাড়ীতে দুধের অভাব নেই, যখন চাইবে তখনই পাবে।"

বামীর মা। "তা বই কি, এ সংসারে কি কিছুর অভাব আছে? দুধ দৈয়ের ছড়াছড়ি আমরা খেয়ে উঠ্‌তে পরি নি, দাসী চাকরে খেয়ে উঠতে পারে না। তোমার যখন যা দরকার হবে বাছা গিন্নীর কাছে এসে বোলো, গিন্নীর দয়ার শরীর।"

শ্যামীর মা। "হাঁ তা ভগবানের ইচ্ছায় যেমন ঐশ্বর্য্য তেমনি দান ধর্ম্ম। গিন্নীর হিল্লতে পাড়ার পাঁচ জন খেয়ে বাঁচ্ছে।"

গৃ। "তোমার স্বামীর একটা চাকরী টাকরী হল? বাবুর কাছে এসেছিল না।"

বিন্দু। "হেঁ এসেছিলেন তা এখনও কিছু হয় নাই, বাবু বলেছেন একটা কিছু করে দিবেন। তা আপনারা মনোযোগ করিলে চাকরী পেতে কতক্ষণ?"

গৃ। "হাঁ তা বাবুর সাহেব মহলে ভারি মান, তার কথা কি সাহেবরা কাট্‌তে পারে? ঐ সে দিন বাঁড়ুজ্যোদের বাড়ীর ছোঁড়াটাকে একটা সরকারী করে দিয়েছেন, বামুণের ছেলেটা হেঁটে হেঁটে মরতো, খেতে পেত না, তাই বল্লুম ছেলেটার কিছু একটা করে দাও। বাবু তখনই সাহেবদের বলে একটা চাকুরি করে দিলেন। আর ঐ মিত্তিরদের বাড়ীর ছোগরাটা, সে এখানেই থাকে, বাজার টাজার করে; তার মা তিন মাস ধরে আমার দোরে হাঁটাহাঁটি করলে; তার বৌ একদিন আমার কাছে কেঁদে পড়ল, যে সংসারে চাল ডাল নেই, খেতে পায় না। তা কি করি, তারও একটা চাকরি করে দিলুম। তবে কি জান বাছা, এখন সব ঐ রকম হয়েছে, পয়সা ত কারও নাই, সবাই কাঙ্গাল, সবাই খাবার জন্যে লালায়িত, সবাই আমাকে এসে ধরে, আমি আর ব্যারাম শরীর নিয়ে পেরে

প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।

এই সংখ্যায় (১০,০০০) দশ হাজার লাইন আছে।

সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ! সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ!! সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ!!!

গ্রন্থ-জগতে হিমালয় পর্ব্বত স্বরূপ

মহাভারত।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল সংস্কৃত হইতে

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় কর্ত্তৃক

সরল ও বিশুদ্ধ বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদিত। সটীক।

মূল্যের নিয়ম।—এই মহাভারত ৩৬ খণ্ডে শেষ হইবে। শেষ হইলে মূল্য ১৫৲ টাকা। কিন্তু বর্ত্তমান মাঘ মাস হইতে আগামী ৩০এ ফাল্গুন পর্য্যন্ত ৪।৽ টাকা, ডাঃ মাঃ ১৲। প্রথম ১২ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ঐ সময় পর্য্যন্ত ২৲ টাকা, ডাঃ মাঃ ।৵৽। নগদ প্রতি সংখ্যা ।৽ ডাঃ মাঃ ৴১৽।

এই মহাভারত ৺কাশীরাম দাসের মহাভারত অপেক্ষা পাঁচ গুণ বৃহৎ, অথচ মূল্য তাহার হিসাবে অনেক সুলভ। আদ্যোপান্ত উৎকৃষ্ট কাগজ ও উত্তম নূতন অক্ষরে ছাপা।

আমি মূল বাল্মীকীয় রামায়ণের সপ্তকাণ্ডের পদ্যানুবাদ সম্পূর্ণ করাতে অনেকে মূল মহাভারতের পদ্যানুবাদ করিতে আমাকে অনুরোধ করেন। আমি তাঁহাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এই অবশ্য-প্রয়োজনীয় কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। মহাভারতের পদ্যানুবাদ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়া দুই বৎসরে সম্পূর্ণ হইবে। কি পণ্ডিত, কি অপণ্ডিত, কি বৃদ্ধ, কি বালক, কি বৃদ্ধা কি বালিকা সকলেই যাহাতে ভগবান ব্যাসদেবের স্বর্গাপেক্ষাও গরীয়ান্, সুধাপেক্ষাও সুমধুর, সমস্ত রত্নাপেক্ষাও অমূল্য এবং কাব্যজগতে অতুল্য মহাভারতের সমস্ত বিষয় অনায়াসে বুঝিতে পারেন, পদ্যানুবাদ সেইরূপ সরল করা যাইতেছে। মূল্যাদি আমার নিকট পাঠাইতে হইবে।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

পদ্য-মহাভারত কার্য্যালয়,
৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, ঠনঠনিয়া—কলিকাতা।
১লা মাঘ, ১২৯২

প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত দ্বিতীয় ভাগ

গ্রন্থাবলী।

১১ এগার খানি উৎকৃষ্ট চিত্র সমেত।

স্বর্ণাক্ষরাঙ্কিত উত্তম কাপড়ে বান্ধান হইয়াছে।

আর কাহাকেও বান্ধাইতে হইবে না।

১০।০ মূল্যের ১১ খানি গ্রন্থ এক্ষণে ৪।০ টাকা, কিন্তু অদ্য হইতে আগামী ১১ই চৈত্র পর্য্যন্ত মূল্য ২।০ টাকা ও ডাকমাশুল ।৵০ আনা আমার নিকট পাঠাইলেই গ্রন্থাবলী পাওয়া যাইবে। তার পর সকলকে ৪৷৵০ দিতে হইবে। দ্বিতীয় ভাগ গ্রন্থাবলীতে আছে—১ প্রহ্লাদ-চরিত্র, ২ গঙ্গামহিমা, ৩ বামন-ভিক্ষা, ৪ যদু-বংশধ্বংস, ৫ রাজা বিক্রমাদিত্য, ৬ দশরথের মৃগয়া, ৭ হরধনুর্ভঙ্গ, ৮ রামের বনবাস, ৯ অবসর-সরোজিনী, ৩য় ভাগ, ১০ ষড়ঋতু ১১ 'অনন্ত' কি ?

(বেঙ্গল থিয়েটর কোম্পানি রাজকৃষ্ণ বাবুর এক প্রহ্লাদ-চরিত্র নাটক গত বৎসর আশ্বিন মাস হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রতি-সপ্তাহে অভিনয় করিয়া আসিতেছেন। দর্শকসংখ্যা এক লক্ষ অপেক্ষা বেশী হইয়াছে। উক্ত থিয়েটর কোম্পানি প্রহ্লাদ চরিত্রের অভিনয়ে প্রায় ৫০,০০০৲ পঞ্চাশ হাজার টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন। প্রহ্লাদ চরিত্রের অভিনয় দর্শনে অনেক পাষণ্ড, নাস্তিকেরও ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি জন্মিয়াছে।)

উক্ত কবির প্রথম ভাগ গ্রন্থাবলী, ১৪৲ টাকা মূল্যের ২৪ খানি গ্রন্থ, এক্ষণে ৪৲ টাকা, কিন্তু আর একবার ডাকমাশুল সমেত ২৷৷০ টাকায় আগামী ১১ই চৈত্র পর্য্যন্ত দেওয়া যাইবে।

উক্ত কবির ১০৲ টাকা মূল্যের ভাল চামড়া, ভাল কাপড় ও স্বর্ণাক্ষরে বান্ধান বাল্মীকীয় সপ্তকাণ্ড রামায়ণ ঐ সময় পর্য্যন্ত মায় ডাকমাশুল ৫৲ টাকায় দিব।

উহাঁর প্রণীত রুসিয়ার ইতিহাস, মূল্য ৷৷০, ডাকমাশুল ৵১০। আগামী ১১ই চৈত্র পর্য্যন্ত মায় ডাকমাশুল ।৵০।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী, ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উঠি নি। এ যেন কালিঘাটের কাঙ্গাল, হাড় জ্বালিয়ে তুলেছে। তা বলো তোমার স্বামীকে বাবুর কাছে আসতে, দেখা যাবে কি হয়।"

দেড় ঘণ্টার পর গৃহিণীর তৈলমার্জ্জন কার্য্য সমাপ্ত হইল, তিনি স্নানের জন্য উঠিলেন।

বিন্দু সর্ব্বদাই ধীর স্বভাব, সংসারের অনেক ক্লেশ সহ্য করিতে শিখিয়াছিলেন, কিন্তু বড় মানুষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতে এখনও শিখেন নাই, এই প্রথম শিক্ষাটা তাঁহার একটু তিক্ত বোধ হইল। ধীরে ধীরে গৃহিণীর নিকট বিদায় লইয়া ভগিনী ও সন্তান দুটীকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

নবীন বাবু।

কলিকাতায় আসিবার পর কয়েক সপ্তাহ সুধা বড় আহ্লাদে ছিল। যাহা দেখিত সমস্তই নূতন, যেখানে যাইত নূতন২ দৃশ্য দেখিত, বাড়ীতে যে কায করিতে হইত তাহাও অনেকটা নূতন প্রণালীতে, সুতরাং সুধার সকলই বড় ভাল লাগিত। কিন্তু কলিকাতার প্রচণ্ড গ্রীষ্মকাল পল্লীগ্রামের গ্রীষ্মকালের অপেক্ষা অধিক কষ্টদায়ক, বিন্দুদের ক্ষুদ্র বাটীতে বড় বাতাস আসিত না, কোঠা ঘরগুলি অতিশয় উত্তপ্ত হইত। সে কষ্টতেও সুধা কষ্ট বোধ করিত না, কিন্তু তাহার শরীর একটু অবসন্ন ও ক্ষীণ হইল, প্রফুল্ল চক্ষু দুটী একটু ম্লান হইল, বালিকার সুগোল বাহু দুটী একটু দুর্ব্বল হইল। তথাপি বালিকা সমস্ত দিন গৃহ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত অথবা বালোচিত চাপল্যের সহিত খেলা করিয়া বেড়াইত, সুতরাং হেম ও বিন্দু সুধার শরীরের পরিবর্ত্তন বড় লক্ষ্য করিলেন না।

বর্ষার প্রারম্ভে, কলিকাতার বর্ষার বায়ুতে সুধার জ্বর হইল। একদিন

শরীর বড় দুর্ব্বল বোধ হইল, বৈকালে বালিকা কোনও কায কর্ম্ম করিতে পারিল না, শয়ন ঘরে একটী মাদুর বিছাইয়া শুইয়া পড়িল।

সন্ধ্যার সময় বিন্দু সে ঘরে আসিয়া দেখিল বালিকা তখনও শুইয়া রহিয়াছে। লিলেন,

"এ কি সুধা, এ অবেলায় শুইয়া কেন? অবেলায় ঘুমালে অসুক করবে, এস ছাতে যাই।"

সুধা। "না দিদি, আমি আজ ছাতে যাব না।"

বিন্দু। "কেন আজ অসুক কচ্চে নাকি? তোমার মুখ খানি একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে যে।"

সুধা। "দিদি আমার গা কেমন কচ্চে, আর একটু মাথা ধরেছে,।

বিন্দু সুধার গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন গা অতিশয় উত্তপ্ত, কপাল গরম হইয়াছে। বলিলেন "সুধা তোমার জ্বরের মত হইয়াছে যে। তা মেজেয় শুয়ে কেন, উঠে বিছানায় শোও, আমি বিছানা করে দিচ্চি।"

সুধা। "না দিদি এ অসুখ কিছু নয়, এখনই ভাল হয়ে যাবে, আমি এখানে বেশ আছি, আর উঠতে ইচ্ছে কচ্চে না।"

বিন্দু। "না ব'ন্ উঠে শোও, তোমার জ্বরের মতন করেছে, মাথা ধরেছে, মাটিতে কি শোয়?"

বিন্দু বিছানা করিয়া দিলেন, ভগিনীকে তুলে বিছানায় শোয়াইলেন, এবং আপনি পার্শ্বে বসিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

রাত্রিতে হেম ও শরৎ আসিলেন, অনেকক্ষণ উভয়ে বিছানার কাছে বসিয়া আস্তে আস্তে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। রাত্রি দশটা হইয়া গেল, তখন বিন্দু হেমের জন্য ভাত বাড়িতে গেলেন। শরৎকেও ভাত খাইতে বলিলেন, শরৎ বলিলেন বাড়িতে গিয়া খাইবেন।

ভাত বাড়া হইল, হেম ভাত খাইতে গেলেন, শরৎ একাকী সেই ক্লান্তা বালিকার পার্শ্বে বসিয়া সুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। বালিকার শরীর তখন অতিশয় উত্তপ্ত হইয়াছে, চক্ষু দুটী রক্তবর্ণ হইয়াছে, বালিকা যাতনায় এপাশ ওপাশ করিতেছে, কেবল জল চাহিতেছে, আর অতিশয় শিরোবেদনার জন্য এক একবার কাঁদিতেছে। শরৎ সযত্নে চক্ষুর জল মুছাইয়া দিলেন,

মাথায় ও গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন রোগীর শুষ্ক ওষ্ঠে এক এক বিন্দু জল দিয়া আপন বস্ত্র দিয়া ওষ্ঠ দুটী মুছাইয়া দিলেন।

হেম শীঘ্র খাইয়া আসিলেন, অনেক রাত্রি হইয়াছে বলিয়া শরৎকে বাটী যাইতে বলিলেন। শরৎ দেখিলেন সুধার রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, তিনি সে দিন রাত্রি তথায় থাকিবেন বলিয়া ইচ্ছা করিলেন।

বিন্দু ও খাইয়া আসিলেন, শরৎ বলিলেন,

"বিন্দু দিদি, আজ আমি এখানে থাকিব, তোমদের হাঁড়ীতে যদি চাট্টী ভাত থাকে আমার জন্য রাখিয়া দাও।"

বিন্দু। "ভাত আছে, আজ সুধার জন্য চাল দিয়ে ছিলুম, তা সুধা ত খেলে না, ভাত আছে। কিন্তু তুমি কেন রাত জাগ্‌বে, আমরা দুই জনে আছি সুধাকে দেখব এখন, তুমি বাড়ী যাও, রাত দুপুর হয়েছে।"

শরৎ। "না বিন্দু দিদি, তোমার ছোট ছেলেটির অসুখ করেছে তাকেও তোমাকে দেখতে হবে, আর হেম বাবু আজ অনেক হেঁটেছেন, রাত্রিতে একটু না ঘুমালে অসুখ করবে। তা আমরা দুই জনে থাকলে পালা করে জাগতে পারব।"

বিন্দু। "তবে তুমি ভাত খেয়ে এস, তোমার জন্য ভাত বেড়ে দি?"

শরৎ। ভাত বেড়ে এই ঘরের এক কোনে ঢাকা দিয়ে রেখে দাও, আমি একটু পরে খাব।"

বিন্দু। "সে কি? ভাত কড়কড়ে হয়ে যাবে যে। অনেক রাত হয়েছে, কখন খাবে?"

শরৎ। "খাব এখন বিন্দু দিদি, আমি ঠাণ্ডা ভাতই ভাল বাসি, তুমি ভাত রেখে দাও।

বিন্দু রান্নাঘরে গেলেন, ভাত ব্যঞ্জনাদি থালা করিয়া সাজাইয়া আনিয়া সেই ঘরের এক কোনে রাখিয়া ঢাকা দিলেন। তাঁহার ছেলে দুটী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল তাহাদের শোয়াইলেন। অন্য দিন সুধা বিন্দুর সঙ্গে ও শিশু দুটীর সঙ্গে এক খাটে শুইতেন, আজ তাহা হইল না। আজ হেম বাবুর নিকট শিশু দুটীকে শোয়াইয়া বিন্দু ভগিনীর পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন,

বিন্দুর মাথার কাছে তখনও শরৎ বসিয়া নিঃশব্দে রোগীর শুশ্রূষা করিতেছিলেন।

শরৎ। "হেম বাবু আপনি এখন একটু ঘুমুন, আবার ও রাত্রিতে আমি আপনাকে উঠাইয়া দিয়া আমি একটু শুইব। সুধার গা অতিশয় তপ্ত হইয়াছে বড় ছট্ ফট্ করিতেছে, একজন বসিয়া থাকা ভাল। বিন্দু দিদি একা পারবেন না।"

হেমচন্দ্র শয়ন করিলেন। বিন্দু ও শরৎ রোগীর শয্যায় একবার বসিয়া একবার বালিসে একটু ঠেসান দিয়া রাত্রি কাটাইতে লাগিলেন। রোগীর আজ নিদ্রা নাই, অতিশয় ছট্‌ফট্ করিতেছে, শিরোবেদনায় অধীর হইয়া দিদির গলায় হাত জড়াইয়া এক একবার কাঁদিতেছে, তৃষ্ণায় অধীর হইয়া বার বার জল চাহিতেছে। শরৎ অনিদ্র হইয়া সেই শুষ্ক ওষ্ঠে জল দিতে লাগিলেন।

রাত্রি আড়াই প্রহরের সময় বিন্দু অতিশয় জেদ করাতে শরৎ উঠিয়া গিয়া ভাত খাইলেন। তখন সুধার রোগের একটু উপশম হইয়াছে, শরীরের উত্তাপ ঈষৎ কমিতেছে, যাতনার একটু লাঘব হওয়ায় বালিকা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

বিন্দু বলিলেন "শরৎ বাবু, তুমি এখন বাড়ী যাও, সুধা একটু ঘুমাইয়াছে, তুমি শোওগে, সমস্ত রাত্রি জাগিও না, অসুখ করিবে।"

শরৎ। 'বিন্দু দিদি তোমার কি সমস্ত রাত্রি জাগা ভাল, তুমি সমস্ত দিন সংসারের কায করিয়াছ, আবার কাল সমস্ত দিন কায করিতে হবে। আমার কি, আমি না হয় কাল কলেজে নাই গেলুম।"

বিন্দু। "না শরৎ বাবু, আমাদের রাত্রি জাগা অভ্যাস আছে, ছেলের ব্যারাম হয়, কিছু হয়, সর্ব্বদাই আমরা রাত্রি জাগিতে পারি, আমাদের কিছু হয় না। তোমরা পুরুষ মানুষ, তোমাদের সমস্ত রাত জাগা সয় না, আমার কথা রাখ, বাড়ী যাও। আবার কাল সকালে না হয় এসে দেখে যেও।"

সুধা তখন নিদ্রা যাইতেছে, নিদ্রার নিয়মিত শ্বাস প্রশ্বাসে বালিকার হৃদয় স্ফীত হইতেছে। শরৎ একটু নিরুদ্বেগ হইলেন; বিন্দুর নিকট

বিদায় লইয়া বাটী হইতে বাহির হইলেন, নিঃশব্দে নৈশ পথ দিয়া আপন বাটীতে যাইয়া প্রাতে ৪ঘটিকার সময় শয্যায় শয়ন করিলেন।

ছয়টার সময় উঠিয়া শরৎ চন্দ্র তাঁহার পরিচিত নবীন চন্দ্র নামক একজন ডাক্তারের নিকট গেলেন। তিনি মেডিকেল কলেজ হইতে সম্প্রতি পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এবং ভবানীপুরেই তাঁহার বাটী, ভবানীপুর অঞ্চলে একটু পসার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি অতিশয় পরিশ্রমী, মনোযোগী, বুদ্ধিমান ও কৃতবিদ্য, কিন্তু ডাক্তারির পসার একদিনে হয় না, কেবল গুণেও হয় না, সুতরাং নবীন বাবুর এখনও কিছু পসার হয় নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্র নাথ ভবানীপুরের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ উকিল, এবং চন্দ্র বাবুর সহায়তায় নবীন একটী ঔষধালয় খুলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও লাভ অল্প, লোকসানের সম্ভাবনাই অধিক। এ জগতে সকলেই আপন আপন চেষ্টা করিতেছে, তাহার মধ্যে একজন যুবকের অগ্রসর হওয়া কষ্টসাধ্য, চারি দিকেই পথ অবরুদ্ধ, সকল পথই জনাকীর্ণ। তথাপি নবীন বাবু পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী ছিলেন, পরিশ্রম ও যত্ন ও গুণদ্বারা ক্রমে উন্নতির পথ পরিষ্কার করিবেন স্থির সঙ্কল্প করিয়া ধীর চিত্তে কার্য্য করিতেছিলেন। দুই একটী বাড়ীতে তাঁহার বড় যশ হইয়াছিল, যাহাদিগের বাড়ীতে তাঁহাকে দুই চারিবার ডাকা হইয়াছিল তাহারা অন্য চিকিৎসক আনাইত না।

সাতটার সময় শরৎ নবীন বাবুকে লইয়া হেমবাবুর বাড়ী পহুছিলেন। নবীন বাবু অনেকক্ষণ যত্ন করিয়া সুধাকে দেখিলেন। জ্বর তখন কমিয়াছে কিন্তু তাপযন্ত্রে তখনও ১০১দাগ দেখা গেল; নাড়ী তখনও ১২০। অনেকক্ষণ দেখিয়া বাহিরে আসিলেন, তাঁহার মুখ গম্ভীর।

হেম জিজ্ঞাসা করিলেন "কি দেখিলেন? রাত্রি অপেক্ষা অনেক জ্বর কমিয়াছে, আজ উপবাস করিলে জ্বর ছাড়িয়া যাবে বোধ হয়?"

নবীন। "বোধ হয় না। আমি রিমিটাণ্ট জ্বরের সমস্ত লক্ষণ দেখিতেছি। এখন একটু কমিয়াছে কিন্তু এখনও বেশ জ্বর আছে, দিনের বেলা আবার বাড়াই সম্ভব।"

হেম একটু ভীত হইলেন। সেই সময়ে ভবানীপুরে অনেক

রিমিটাণ্ট জ্বর হইতেছিল, অনেকের সেই জ্বরে মৃত্যু হইতেছিল। বলিলেন "তবে কি কয়েক দিন ভুগিবে?"

নবীন। "এখনও ঠিক বলিতে পারি না, আর একবার আসিয়া দেখিলে বলিব। বোধ হইতেছে রিমিটাণ্ট জ্বর, তাহা হইলে ভুগিতে হবে বৈকি। কিন্তু আপনারা কোনও আশঙ্কা করিবেন না, আশঙ্কার কোনও কারণ নাই।"

এই বলিয়া একটী ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। বলিলেন "এই ঔষধটী দুই ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবেন, বৈকাল পর্য্যন্ত খাওয়াইবেন, বৈকালে আমি আবার আসিব। আর রোগীর মাথা বড় গরম হইয়াছে, চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে, সমস্ত দিন মাথায় বরফ দিবেন, তৃষ্ণা পাইলেই বরফ খাইতে দিবেন, কিম্বা দুই একখানি আকের কুচি দিবেন। আর এরারুট কিম্বা নেস্‌লের দুগ্ধ খুব খাওয়াইবেন, দিনে তিন চারি বার খাওয়াইবেন। এ পীড়ায় খাদ্যই ঔষধ।"

শরতের সহিত বাটী হইতে বাহিরে আসিয়া নবীন বলিলেন "শরৎ তোমাকে একটী কায করিতে হইবে।"

শরৎ। "বলুন।"

নবীন। "হেম বাবুকে অবকাশ অনুসারে জানাইবেন এ চিকিৎসার জন্য আমি অর্থ গ্রহণ করিব না।"

শরৎ। "কেন?"

নবীন। "তোমার সহিত আমার অনেক দিন হইতে বন্ধুত্ব. তোমাদের গ্রামের লোকের নিকট আমি অর্থ গ্রহণ করিব না। হেম বাবুর অধিক টাকা কড়ি নাই, তাঁহার নিকট আমি অর্থ লইব না।"

শরৎ। "হেমবাবু দরিদ্র বটেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে বিশেষ করিয়া জানি,—আপনি বিনা বেতনে চিকিৎসা করা অপেক্ষা আপনি অর্থ গ্রহণ করিলে তিনি সত্য সত্যই তুষ্ট হইবেন।"

নবীন। "না শরৎ, আমার কথাটী রাখ, আমি যাহা বলিলাম তাহা করিও। এ ব্যারাম সহসা ভাল হইবে আমি প্রত্যাশা করি না, আমাকে অনেক দিন আসিতে হইবে, সর্ব্বদা আসিতে হইবে। আমি যদি বিনা অর্থে

আসিতে পারি তবে যখন আবশ্যক বোধ হইবে তখনই নিঃসঙ্কোচে আসিতে পারিব।"

শরৎ। "নবীনবাবু আপনি যাহা বলিলেন তাহা করিব। কিন্তু আপনার সময়ের মূল্য আছে, অর্থেরও আবশ্যক আছে, বিনা পারিতোষিকে সকল রোগীকে দেখিলে আপনার ব্যবসা চলিবে কিরূপে?"

নবীন। "না শরৎ, আমার সময়ের বড় মূল্য নাই, তুমি জান আমার এখনও অধিক পসার নাই, বাড়ীতেই বসিয়া থাকি। আর আমার পসার সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কি হয় তাহা আমি জানি না, কিন্তু এই একটী রোগের চিকিৎসায় অর্থ গ্রহণ না করিলে তাহাতে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না। বন্ধুর জন্য একটী বন্ধুর কায কর, আমার এই কথাটী রাখিও।"

শরৎ সম্মত হইলেন, নবীন চলিয়া গেলেন। শরৎ তখন ঔষধ, পথ্য বরফ, আক প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য কিনিয়া আনিলেন। সেদিন রোগীর শয্যার নিকট থাকিতে অনেক জেদ করিলেন, কিন্তু হেম সে কথা শুনিলেন না, শরৎকে জোর করিয়া কলেজে পাঠাইলেন।

অপরাহ্লে শরৎ নবীনবাবুর সহিত আবার আসিলেন। নবীনবাবু রোগীকে দেখিয়াই বুঝিলেন তিনি যাহা ভয় করিয়াছিলেন তাহাই হইয়াছে, এ স্পষ্ট রিমিটাণ্ট জ্বর। রোগীর চক্ষু দুটী আরও রক্তবর্ণ হইয়াছে, রোগীর মাথায় সমস্ত দিন বরফ দেওয়াতেও উত্তাপ কমে নাই, সুধার স্বাভাবিক গৌর-বর্ণ মুখখানি জ্বরের আভায় রঞ্জিত, এবং সুধা সমস্ত দিন ছট্‌ফট্‌ করিয়াছে, এপাশ ওপাশ করিয়াছে, কখনও শুইয়াছে, কখনও বায়না করিয়া দিদির গলা ধরিয়া বসিয়াছে, কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে আবার শ্রান্ত হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। নবীনবাবু সভয়ে দেখিলেন নাড়ী প্রায় ১৫০, তাপযন্ত্র দিয়া দেখিলেন তাপ ১০৫ ডিগ্রি!

ঔষধ ঘন ঘন খাওয়াইতে বারণ করিলেন, আর একটী ঔষধ লিখিয়া দিলেন ও বলিলেন যে সেটী দিনের মধ্যে তিন বার, এবং রাত্রিতে যখন আপনাআপনি ঘুম ভাঙ্গিবে তখন একবার খাওয়াইলেই হইবে। খাদ্যের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া গেলেন, শরৎকে ডাকিয়া বলিয়া গেলেন "এ রোগের খাদ্যই ঔষধ, সর্ব্বদা খাদ্য দিবে, যথেষ্ট খাওয়াইতে ত্রুটী হইলে রোগী বাঁচিবে না।"

কয়েক দিন পর্য্যন্ত সুধা সেই ভয়ঙ্কর জ্বরে যাতনা পাইতে লাগিল। শরৎ তখন হেমের কথা আর মানিলেন না, পড়া শুনা বন্ধ করিয়া দিবা রাত্রি হেমের বাড়ীতে আসিয়া থাকিতেন, ঔষধ আনিয়া দিতেন, নিজ হস্তে সাবু বা দুগ্ধ প্রস্তুত করিয়া দিতেন। বিন্দু সংসার কার্য্যবশতঃ কখন কখন রোগ-শয্যা পরিত্যাগ করিলে শরৎ তথায় নিঃশব্দে বসিয়া থাকিতেন, হেমচন্দ্র শ্রান্তি ও চিন্তা বশতঃ নিদ্রিত হইলে শরৎ অনিদ্র হইয়া সেই রোগীর সেবা করিতেন। জ্বরের প্রচণ্ড উত্তাপে বালিকা ছট্‌ফট্‌ করিলে শরৎ আপনার শ্রান্তি ও নিদ্রা ও আহার ভুলিয়া গিয়া নানারূপ কথা কহিয়া, নানারূপ গল্প করিয়া, নানা প্রবোধ বাক্য ও আশ্বাস দিয়া সুধাকে শান্ত করিতেন, জ্বরের অসহ্য যাতনায়ও সুধা সেই কথা শুনিয়া একটু শান্তি লাভ করিত। কখনও বালিকার ললাটে হাত বুলাইয়া তাহাকে ধীরে ধীরে নিদ্রিত করিতেন, কখন তাহার অতি ক্ষীণ দুর্ব্বল রক্তশূন্য গৌরবর্ণ বাহুলতা বা অঙ্গুলি গুলি হস্তে ধারণ করিয়া রোগীকে তুষ্ট করিতেন; মাথা উষ্ণ হইলে শরৎ সমস্ত দিন বরফ ধরিয়া থাকিতেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় রোগীর অর্দ্ধস্ফুট শব্দগুলি শরতের কর্ণে অগ্রে প্রবেশ করিত, বালিকা শুষ্ক ওষ্ঠদ্বয়ে সেই শরতের হস্ত হইতে একবিন্দু জল বা দুইখানি আকের কুচি পাইত, নিদ্রা না ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে সেই শরতের হস্ত হইতে উত্তপ্ত পথ্য পাইত।

১০।১২ দিবসে সুধা অতিশয় ক্ষীণ হইয়া গেল, আর উঠিয়া বসিতে পারিত না চক্ষুতে ভাল দেখিতে পাইত না, মুখখানি অতিশয় শীর্ণ, কিন্তু তখনও জ্বরের হ্রাস নাই। প্রাতঃকালে ১০২ দাগের বড় কম হয় না, প্রত্যহ বৈকালে ১০৫ দাগ পর্য্যন্ত উঠে। নবীন একটু চিন্তিত হইলেন, বলিলেন "শরৎ, চতুর্দ্দশ দিবসে এ রোগের আরোগ্য হওয়া সম্ভব, যদি না হয় তবে সুধার জীবনের একটু সংশয় আছে। সুধা যেরূপ দুর্ব্বল হইয়াছে, আর অধিক দিন এ পীড়া সহ্য করিতে পারিবে এরূপ বোধ হয় না।"

ত্রয়োদশ দিবসে নবীন সমস্ত দিন সেই বাটীতে থাকিয়া রোগীর রোগ লক্ষ্য করিলেন। বৈকালে জ্বর একটু কম হইল, কিন্তু সে অতি সামান্য উন্নতি, তাহা হইতে কিছু ভরসা করা যায় না। শরৎকে বলিলেন "অদ্য রাত্রিতে তুমি রোগীকে ভাল করিয়া দেখিও, কল্য ভোরের সময় তাপমান

যন্ত্রে শরীরের কত উত্তাপ লক্ষ্য করিও। যদি ৯৮ হয়, যদি ৯৯ হয়, যদি ১০০ তাপের কম হয় তৎক্ষণাৎ পাঁচ গ্রেন কুইনাইন দিও, ৮টার মধ্যেই আমি আসিব। যদি কাল বা পরশ্ব এ জ্বরের উপশম না হয়, সুধার জীবনের সংশয় আছে।”

শরৎ এ কথা বিন্দুকে বলিলেন না, হেমকেও বলিলেন না। সন্ধ্যার সময় বাটী হইতে খাইয়া আসিলেন এবং সুধার শয্যার পার্শ্বে বসিলেন;—সে দিন সমস্ত রাত্রি তিনি সেই স্থান হইতে উঠিলেন না;—এক মুহূর্ত্তের জন্য নিদ্রায় চক্ষু মুদিত করিলেন না।

উষার প্রথম আলোকচ্ছটা জানালার ভিতর দিয়া অল্প অল্প দেখা গেল। তখন সে ঘর নিঃশব্দ। হেমচন্দ্র ঘুমাইয়াছেন, বিন্দু সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর ছেলে দুটীর পাশে শুইয়া পড়িয়াছেন,—ছেলে দুটী নিদ্রিত। সুধা প্রথম রাত্রিতে ছট্‌ফট্‌ করিয়া শেষ রাত্রিতে নিদ্রা যাইতেছে। ঘরে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে, নির্ব্বাণ প্রায় প্রদীপের স্তিমিত আলোক রোগীর শীর্ণ শুষ্ক মুখের উপর পরিয়াছে।

শরৎ ধীরে ধীরে উঠিলেন, ধীরে ধীরে সেই অতি শীর্ণ বাহুটী আপন হস্তে ধারণ করিলেন,—নাড়ী এত চঞ্চল, তিনি গণনা করিতে পারিলেন না। তখন তাপযন্ত্র লইলেন, ধীরে ধীরে তাপযন্ত্র বসাইলেন,—নিঃশব্দে ঘড়ির দিকে চাহিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার হৃদয় উদ্বেগে জোরে আঘাত করিতেছিল।

টিক্‌ টিক্‌ টিক্‌ করিয়া ঘড়ির শব্দ হইতে লাগিল, এক মিনিট, দুই মিনিট, চারি মিনিট, পাঁচ মিনিট হইল; শরৎ তাপযন্ত্র তুলিয়া লইলেন। প্রদীপের নিকটে গেলেন, তাঁহার হৃদয় আরও বেগে আঘাত করিতেছে, তাঁহার হাত কাঁপিতেছে।

প্রদীপের স্তীমিত আলোকে প্রথমে কিছু দেখিতে পাইলেন না। হস্ত দ্বারা ললাট হইতে গুচ্ছ২ কেশ সরাইলেন; ললাটের স্বেদ অপনয়ন করিলেন, নিদ্রাশূন্য চক্ষুদ্বয় একবার, দুইবার মুছিলেন, পুনরায় তাপ যন্ত্রেরদিকে দেখিলেন।

শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু প্রদীপের আলোকে ঠিক বিশ্বাস হয় না,

বোধ হয় তাঁহার দেখিতে ভ্রম হইয়াছে। ভরসায় ভর দিয়া গবাক্ষের নিকটে যাইলেন,—দিবালোকে তাপ যন্ত্র আবার দেখিলেন। জ্বর কল্য প্রাতঃকাল অপেক্ষা অধিক হইয়াছে, তাপ যন্ত্র ১০ ডিগ্রি দেখাইতেছে! ললাটে করাঘাত করিয়া শরৎ ভূতলে পতিত হইলেন।

শব্দে বিন্দু উঠিলেন। ভগিনীর নিকট গিয়া দেখিলেন, সুধা নিদ্রা যাইতেছে; গবাক্ষের কাছে আসিয়া দেখিলেন শরৎ বাবু ভূমিতে শুইয়া আছেন। বলিলেন "আহা শরৎ বাবু রাত্রি জেগে ক্লান্ত হইয়াছেন, মাটিতে শুইয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন; আহা আমাদের জন্য কত কষ্টই সহ্য করিতেছেন।" শরৎ উত্তর করিলেন না, তাঁহার হৃদয়ে যে ভীষণ ব্যথা পাইয়াছিলেন, কেন বিন্দুকে সে ব্যথা দিবেন?

আর এক সপ্তাহ জ্বর রহিল। তখন সুধা এত দুর্ব্বল হইয়া গেল যে এক পাশ হইতে অন্য পাশ ফিরিতে পারিত না, মাথা তুলিয়া জল খাইতে পারিত না, কষ্টে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কখন এক আধটী কথা কহিত, খেংরা কাঠির ন্যায় অঙ্গুলিগুলি একটু একটু নাড়িত। সুধার মুখের দিকে চাওয়া যাইত না, অথবা নৈরাশ্যে জ্ঞান হারাইয়া নিশ্চেষ্ট পুত্তলির ন্যায় বসিয়া শরৎ সেই মুখের দিকে সমস্ত রাত্রি চাহিয়া থাকিত। গরিবের ঘরের মেয়েটী শৈশবে অন্ন বস্ত্রের কষ্টেও মাতৃস্নেহে জীবনধারণ করিয়াছিল, অকালে বিধবা হইয়াও ভগিনীর স্নেহে সেই ক্ষুদ্র পুষ্পটী কয়েক দিন পল্লিগ্রামে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, অদ্য সে পুষ্প বুঝি আবার মুদিত হইয়া নম্রশির নত করিল। দরিদ্র বালিকার ক্ষুদ্র জীবন-ইতিহাস বুঝি সাঙ্গ হইল।

বিংশ দিবস হইতে নবীনও দিবারাত্রি হেমের বাটীতে রহিলেন। শরৎকে গোপনে বলিলেন "শরৎ তোমার নিকট কোন কথা গোপন করিব না, আর দুই এক দিনের মধ্যে যদি এই জ্বর না ছাড়ে তবে ঐ দুর্ব্বল মৃতপ্রায় শরীরকে জীবিত রাখা মনুষ্য-সাধ্য নহে। আর দুই তিন দিন আমি দেখিব, তাহার পর আমাকে বিদায় দাও। আবার যাহা সাধ্য করিলাম, জীবন দেওয়া না দেওয়া জগদীশ্বরের ইচ্ছা।"

দ্বাবিংশ দিবসের সন্ধ্যার সময় জ্বর একটু হ্রাস হইল, কিন্তু তাহাতেও কিছু ভরসা করা যায় না। রাত্রিতে দুই জনই শয্যা পার্শ্বে বসিয়া রহি-

লেন,—সে দিন সমস্ত রাত্রি সুধা নিদ্রিতা। এ কি আরোগ্যের লক্ষণ, না দুর্ব্বলতায় মৃত্যুর পূর্ব্ব চিহ্ন?

অতি প্রত্যুষে শরৎ আবার তাপযন্ত্র বসাইলেন। তাপ যন্ত্র উঠাইয়া গবাক্ষের নিকট যাইলেন। কি দেখিলেন জানি না, ললাটে করাঘাত করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন!

নবীনচন্দ্র ধীরে ধীরে সেই যন্ত্র শরতের হস্ত হইতে লইলেন, বিপদ্‌কালে ধীরতাই চিকিৎসকের বীরত্ব। তাপযন্ত্র দেখিলেন,—আস্তে আস্তে শরৎকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন।

শরৎ হতাশের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে বালিকার পরমায়ু শেষ হইয়াছে?"

নবীন। "পরমেশ্বর বালিকাকে দীর্ঘায়ুঃ করুন, এযাত্রা সে পরিত্রাণ পাইয়াছে।"

তাপযন্ত্র দেখিতে শরৎ ভুল করিয়াছিলেন, নবীন দেখাইলেন তাপযন্ত্রে ৯৮ ডিগ্রি লক্ষিত হইতেছে। সুধার শরীরে হাত দিয়া দেখাইলেন জ্বর নাই, জ্বর উপশম হওয়ায় ক্ষীণ বালিকা গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত রহিয়াছে।

ললাট হইতে কেশগুচ্ছ সরাইয়া প্রাতঃকালে শরৎ বাড়ী আসিলেন। এক সপ্তাহ তিনি প্রায় রাত্রিতে নিদ্রা যান নাই, তাঁহার মুখখানি শুষ্ক, নয়ন দুটী কালিমা-বেষ্টিত,—কিন্তু তাঁহার হৃদয় আজি নিরুদ্বেগ।

সীতারাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গঙ্গারাম কখন সীতারামের অন্তঃপুরে আসে নাই, নন্দা কি রমাকে কখন দেখে নাই। কিন্তু মহামূল্য গৃহসজ্জা দেখিয়া বুঝিল যে ইনি একজন

রাণী হইবেন। রাণীদিগের মধ্যে নন্দার অপেক্ষা রমারই সৌন্দর্য্যের খ্যাতিটা বেশী ছিল—এজন্য গঙ্গারাম সিদ্ধান্ত করিল, যে ইনি কনিষ্ঠা মহিষী রমা। অতএব জিজ্ঞাসা করিল,

"মহারাণী কি আমাকে তলব করিয়াছেন ?'

রমা উঠিয়া গঙ্গারামকে প্রণাম করিল। বলিল, 'আপনি আমার দাদা হন্—জ্যেষ্ঠ ভাই, আপনার পক্ষে শ্রীও যেমন, আমিও তাই। অতএব আপনাকে যে এমন সময়ে ডাকাইয়াছি, তাহাতে দোষ ধরিবেন না।"

গঙ্গা। আমাকে যখন আজ্ঞা করিবেন তখনই আসিতে পারি—আপনিই কর্ত্রী—

রমা। মুরলা বলিল, যে প্রকাশ্যে আপনি আসিতে সাহস করিবেন না। সে আরও বলে—পোড়ার মুখী কত কি বলে, তা আমি কি বল্‌ব ? তা, দাদা মহাশয় ! আমি বড় ভীত হইয়াই এমন সাহসের কাজ করিয়াছি। তুমি আমায় রক্ষা কর।

বলিতে বলিতে রমা কাঁদিয়া ফেলিল। সে কান্না দেখিয়া গঙ্গারাম কাতর হইল। বলিল,

"কি হইয়াছে ? কি করিতে হইবে ?"

রমা। কি হইয়াছে ? কেন তুমি কি জান না, যে মুসলমান, মহম্মদপুর লুঠিতে আসিতেছে—আমাদের সব খুন করিয়া, সহর পোড়াইয়া দিয়া চলিয়া যাইবে ?''

গঙ্গা। কে তোমাকে ভয় দেখাইয়াছে ? মুসলমান আসিয়া সহর পোড়াইয়া দিয়া যাইবে, তবে আমরা আছি কি জন্যে ? আমরা তবে তোমার অন্ন খাই কেন ?

রমা। তোমরা পুরুষ মানুষ, তোমাদের সাহস বড়—তোমরা অত বোঝ না। যদি তোমরা না রাখিতে পার, তখন কি হবে ?

রমা আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

গঙ্গা। সাধ্যানুসারে আপনাদের রক্ষা করিব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

রমা। তা ত কর্‌বে—কিন্তু যদি না পারিলে ?

গঙ্গা। না পারি, মরিব।

রমা। তা করিও না। আমার কথা শোন। আজ সকলে বড় রাণীকে বলিতেছিল, মুসলমানকে আদর করিয়া ডাকিয়া, সহর তাহাদের সুঁপিয়া দাও—আপনাদের সকলের প্রাণ ভিক্ষা মাগিয়া লও। বড় রাণী সে কথায় বড় কান দিলেন না—তাঁর বুদ্ধি শুদ্ধি বড় ভাল নয়। আমি তাই তোমায় ডাকিয়াছি। তা কি হয় না?

গঙ্গা। আমাকে কি করিতে বলেন?

রমা। এই আমার গহনা পাতি আছে, সব নাও। আর আমার টাকা কড়ি যা আছে, সব না হয় দিতেছি, সব নাও। তুমি কাহাকে কিছু না বলিয়া মুসলমানের কাছে যাও। বল গিয়া, যে আমরা রাজ্য ছাড়িয়া দিতেছি, নগর তোমাদের ছাড়িয়া দিতেছি, তোমরা কাহাকে প্রাণে মারিবে না, কেবল এইটি স্বীকার কর।" যদি তাহারা রাজি হয়, তবে নগর তোমার হাতে—তুমি তাদের গোপনে এনে কেল্লায় তাদের দখল দিও। সকলে বাঁচিয়া যাইবে।"

গঙ্গারাম শিহরিয়া উঠিল—বলিল, "মহারাণী! আমার সাক্ষাতে যা বল্লেন বল্লেন—আর কখন কাহারও সাক্ষাতে এমন কথা মুখে আনিবেন না। আমি প্রাণে মরিলেও একাজ আমা হইতে হইবে না। যদি এমন কাজ আর কেহ করে, আমি স্বহস্তে তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিব।"

রমার শেষ আশা ভরসা ফরসা হইল। রমা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, "তবে আমার বাছার দশা কি হইবে?" গঙ্গারাম ভীত হইয়া বলিল,

"চুপ কর! যদি তোমার কান্না শুনিয়া কেহ এখানে আসে, তবে আমাদের দুইজনেরই পক্ষে অমঙ্গল। আপনার ছেলের জন্যই আপনি এত ভীত হইয়াছেন, আমি সে বিষয়ে কোন উপায় করিব। আপনি স্থানান্তরে যাইতে রাজি আছেন?"

রমা। যদি আমায় বাপের বাড়ী রাখিয়া আসিতে পার, তবে যাইতে পারি। তা, বড় রাণীই বা যাইতে দিবেন কেন? ঠাকুর মহাশয় বা যাইতে দিবেন কেন?"

গঙ্গা। তবে লুকাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। এক্ষণে তাহার কোল

প্রয়োজন নাই। যদি তেমন বিপদ দেখি, আমি আসিয়া আপনাদিগকে লইয়া গিয়া রাখিয়া আসিব।

রমা। আমি কি প্রকারে সম্বাদ পাইব?

গঙ্গা। মুরলার দ্বারা সম্বাদ লইবেন। কিন্তু মুরলা যেন অতি গোপনে আমার নিকট যায়।

রমা নিশ্বাস ছাড়িয়া, কাঁপিয়া বলিল, "তুমি আমার প্রাণ দান দিলে, আমি চিরকাল তোমার দাসী হইয়া থাকিব। দেবতারা তোমার মঙ্গল করুন।"

এই বলিয়া রমা, গঙ্গারামকে বিদায় দিল। মুরলা গঙ্গারামকে বাহিরে রাখিয়া আসিল।

কাহারও মনে কিছু মলা নাই। তথাপি একটা গুরুতর দোষের কাজ হইয়া গেল। রমা ও গঙ্গারাম উভয়ে তাহা মনে মনে বুঝিল। গঙ্গারাম ভাবিল, "আমার দোষ কি?"—রমা বলিল, "এ না করিয়া কি করি—প্রাণ যায় যে!" কেবল মুরলা সন্তুষ্ট।

গঙ্গারামের যদি তেমন চক্ষু থাকিত, তবে গঙ্গারাম ইহার ভিতর আর একজন লুকাইয়া আছে দেখিতে পাইতেন। সে মনুষ্য নহে—দেখিতেন—

* দক্ষিণাপাঙ্গনিবিষ্টমুষ্টিং নতংসমাকুঞ্চিত সব্যপাদম্।
* * * চক্রীকৃত চারুচাপং প্রহর্ত্তুমভ্যুদ্যতমাত্মযোনিম্॥

এদিকে বাদীর মনেও যা, বিবির মনেও তা। চন্দ্রচূড় ঠাকুর তোরাব খাঁর কাছে, এই বলিয়া গুপ্তচর পাঠাইলেন, যে "আমরা এ রাজ্য মায় কিল্লা সেলেখানা আপনাদিগকে বিক্রয় করিব—কত টাকা দিবেন? যুদ্ধে কাজ কি—টাকা দিয়া নিন্ না?"

চন্দ্রচূড় মৃণ্ময়কে ও গঙ্গারামকে এ কথা শুনাইলেন। মৃণ্ময় ক্রুদ্ধ হইয়া, চোখ ঘুরাইয়া বলিল,

"কি, এত বড় কথা?"

চন্দ্রচূড় বলিলেন, "দূর মূর্খ! কিছু বুদ্ধি নাই কি? দরদস্তর করিতে করিতে এখন দুই মাস কাটাইতে পারিব। তত দিনে রাজা আসিয়া পড়িবেন।"

গঙ্গারামের মনে কি হইল, বলিতে পারি না সে কিছুই বলিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

তা, সে দিন গঙ্গরামের কোন কাজ করা হইল না। রমার মুখখানি বড় সুন্দর! কি সুন্দর আলোই তার মুখের উপর পড়িয়াছিল! সেই কথা ভাবিতেই গঙ্গারামের দিন গেল। বাতির আলো বলিয়াই কি অমন দেখাইল! তা হ'লে মানুষ রাত্রি দিন বাতির আলো জ্বালিয়া বসিয়া থাকে না কেন? কি মিসমিসে কোঁকড়া কোঁকড়া চুলের গোছা! কি ফলান রঙ্! কি ভুরু! কি চোখ! কি ঠোঁট—যেমন রাঙা, তেমনি পাতলা! কি গড়ন! তা কোন্‌টাই বা গঙ্গারাম ভাবিবে? সবই যেন দেবী-দুর্লভ! গঙ্গারাম ভাবিল, "মানুষ যে এমন সুন্দর হয়, তা জানতেম না! একবার যে দেখিলাম, আমার যেন জন্ম সার্থক হইল। আমি তাই ভাবিয়া, যে কয় বৎসর বাঁচিব, সুখে কাটাইতে পারিব।"

তা কি পারা যায় রে, মূর্খ! একবার দেখিয়া, অমন হইলে, আর একবার দেখিতে ইচ্ছা করে। দুপর বেলা গঙ্গারাম ভাবিতেছিল, "একবার যে দেখিয়াছি, আমি তাই ভাবিয়া যে কয় বৎসর বাঁচি, সে কয় বৎসর সুখে কাটাইতে পারিব।"—কিন্তু সন্ধ্যা বেলা ভাবিল—"আর একবার কি দেখিতে পাই না?" রাত্র দুই চারি দণ্ডের সময়ে গঙ্গারাম ভাবিল, "আজ আবার মুরলা আসে না!" রাত্রি প্রহরেকের সময়ে মুরলা তাঁহাকে নিভৃত স্থানে গেরেফতার করিল।

গঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর?"

মুরলা। তোমার খবর কি?

গঙ্গা। কিসের খবর চাও?

মুরলা। বাপের বাড়ী যাওয়ার।

গঙ্গা। আবশ্যক হইবে না বোধ হয়। রাজ্য রক্ষা হইবে।

মুরলা। কিসে জানিলে?

গঙ্গা। তা কি তোমায় বলা যায়?

মুরলা। তবে আমি এই কথা বলি গে?

গঙ্গা। বল গে।

মুরলা। যদি আমাকে আবার পাঠান?

গঙ্গা। কাল যেখানে আমাকে ধরিয়াছিলে, সেইখানে আমাকে পাইবে।

মুরলা চলিয়া গিয়া, মহিষী-সমীপে সম্বাদ নিবেদন করিল। গঙ্গারাম কিছুই খুলিয়া বলেন নাই, সুতরাং রমাও কিছু বুঝিতে পারিল না। না বুঝিতে পারিয়া আবার ব্যস্ত হইল। আবার মুরলা গঙ্গারামকে ধরিয়া লইয়া তৃতীয় প্রহর রাত্রে, রমার ঘরে আনিয়া উপস্থিত করিল। সেই পাহারাওয়ালা সেইখানে ছিল, আবার গঙ্গারাম, মুরলার ভাই বলিয়া পার হইলেন।

গঙ্গারাম, রমার কাছে আসিয়া মাথা মুণ্ড কি বলিল, তাহা গঙ্গারাম নিজেই কিছু বুঝিতে পারিল না, রমা ত নয়ই। আসল কথা, গঙ্গারামের মাথা মুণ্ড তখন কিছুই ছিল না, সেই ধনুর্দ্ধর ঠাকুর ফুলের বাণ মারিয়া তাহা উড়াইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। কেবল তাহার চক্ষু দুইটি ছিল, প্রাণপাত করিয়া গঙ্গারাম দেখিয়া লইল, কান ভরিয়া কথা শুনিয়া লইল, কিন্তু তৃপ্তি হইল না।

গঙ্গারামের এইটুকু মাত্র চৈতন্য ছিল, যে চন্দ্রচূড় ঠাকুরের কল কৌশল রমার সাক্ষাতে কিছুই সে প্রকাশ করিল না। বস্তুতঃ কোন কথা প্রকাশ করিতে সে আসে নাই, কেবল দেখিতে আসিয়াছিল। তাই দেখিয়া, দক্ষিণা স্বরূপ আপনার চিত্ত রমারে দিয়া, চলিয়া গেল। আবার মুরলা তাহাকে বাহির করিয়া দিয়া আসিল। গমনকালে মুরলা গঙ্গারামকে বলিল, "আবার আসিবে?"

গঙ্গা। কেন আসিব?

মুরলা বলিল, "আসিবে বোধ হইতেছে।"

গঙ্গারাম চোখ্ বুজিয়া পিছল পথে পা দিয়াছে—কিছু বলিল না।

এদিগে চন্দ্রচূড়ের কথায় তোরাব খাঁ উত্তর পাঠাইলেন, "যদি অল্প স্বল্প টাকা দিলে, মুলুক ছাড়িয়া দাও, তবে টাকা দিতে রাজি আছি। কিন্তু সীতারামকে ধরিয়া দিতে হইবে।"

চন্দ্রচূড় উত্তর পাঠাইলেন "সীতারামকে ধরাইয়া দিব, কিন্তু অল্প টাকায় হইবে না।

তোরাব খাঁ বলিয়া পাঠাইলেন, কত টাকা চাও। চন্দ্রচূড় একটা চড়া দর হাঁকিলেন, তোরাব খাঁ একটা নরম দর দিয়া পাঠাইলেন। তার পর চন্দ্রচূড় কিছু নামিলেন, তোরাব খাঁ তদুত্তরে কিছু উঠিলেন। চন্দ্রচূড় এইরূপে মুসলমানকে ভুলাইয়া রাখিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কালামুখী মুরলা যা বলিল তাই হইল। গঙ্গারাম আবার রমার কাছে গেল। তার কারণ, গঙ্গারাম না গিয়া আর থাকিতে পারে না। রমা আর ডাকে নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে মুরলাকে গঙ্গারামের কাছে সম্বাদ লইতে পাঠাইত; কিন্তু গঙ্গারাম মুরলার কাছে কোন কথাই বলিত না, বলিত "তোমাদের বিশ্বাস করিয়া এ সকল গোপন কথা কি বলা যায়? আমি একদিন নিজে গিয়া বলিয়া আসিব।" কাজেই রমা আবার গঙ্গারামকে ডাকিয়া পাঠাইল—মুসলমান কবে আসিবে সে বিষয়ে খবর না জানিলে রমার প্রাণ বাঁচে না—যদি হঠাৎ একদিন দুপর বেলা খাওয়া দাওয়ার সময় আসিয়া পড়ে?

কাজেই গঙ্গারাম আবার আসিল। এবার গঙ্গারাম সাহস দিল না—বরং একটু ভয় দেখাইয়া গেল। যাহাতে আবার ডাক পড়ে, তার পথ করিয়া গেল। রমাকে আপনার প্রাণের কথা বলে, গঙ্গারামের সে সাহস হয় না—সরলা রমা তার মনের সে কথা অণুমাত্র বুঝিতে পারে না। তা, প্রেম জ্ঞাপনের ভরসায় গঙ্গারামের যাতায়াতের চেষ্টা নয়। গঙ্গারাম জানিত সে পথ বন্ধ! তবু শুধু দেখিয়া, কেবল কথাবার্ত্তা কহিয়াই এত আনন্দ!

এঁকে ভালবাসা বলে না—তাহা হইলে গঙ্গারাম কখন রমাকে ভয় দেখাইয়া, যাহাতে তাহার যন্ত্রণা বাড়ে তাহা করিয়া যাইতে পারিত না। এ একটা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট চিত্তবৃত্তি—যাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে তার সর্ব্বনাশ করিয়া ছাড়ে।

ভয় দেখাইয়া, গঙ্গারাম চলিয়া গেল। রমা তখন বাপের বাড়ী যাইতে চাহিল, কিন্তু গঙ্গারাম, আজ কালি নহে বলিয়া চলিয়া গেল। কাজেই আজ কাল বাদে রমা আবার গঙ্গারামকে ডাকাইল। আবার গঙ্গারাম আসিল। এই রকম চলিল।

একেবারে "ধরি মাছ, না ছুই পানি" চলে না। রমার সঙ্গে লোকালয়ে যদি গঙ্গারামের পঞ্চাশ বার সাক্ষাৎ হইত, তাহা হইলে কিছুই দোষ হইত না, কেন না রমার মন বড় পরিষ্কার, পবিত্র। কিন্তু এখন ভয়ে ভয়ে, অতি গোপনে, রাত্রি তৃতীয় প্রহরে সাক্ষাৎটা ভাল নহে। আর কিছু হউক না কেন, একটু বেশী আদর, একটু বেশী খোলা কথা, কথাবার্ত্তায় একটু বেশী অসাবধানতা, একটু বেশী মনের মিল হইয়া পড়ে। তা যে হইল না এমত নহে। রমা তাহা আগে বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু মুরলার একটা কথা দৈববাণীর মত তাহার কানে লাগিল। একদিন মুরলার সঙ্গে পাঁড়ে ঠাকুরের সে বিষয়ে কিছু কথা হইল। পাঁড়ে ঠাকুর বলিলেন,

"তোমারা ভাই হামেশা রাতকো ভিতরমে যায়া আয়া করতাহৈ কাহেকো?"

মু। তোর কিরে বিট্‌লে? থ্যাংরার ভয় নেই?

পাঁড়ে। ডর্ ত হৈ, লেকেন্ জানকাভী ডর হৈ।

মু। তোর আবার আর জান আছে না কি? আমিই ত তোর জান!

পাঁড়ে। তোম ছোড়্‌নে সে মরেঙ্গে নেহি, লেকেন জান ছোড়্‌নে সে সব আঁধিয়ারা লাগেগী। তোমারা ভাইকো হম্ ঔর ছোড়েঙ্গে নেহি।

মু। তা না ছোড়িস আমি তোকে ছোড়েঙ্গে। কেমন কি বলিস্?

পাঁড়ে। দেখো, বহ আদমি তোমারা ভাই নেহি, কোই বড়ে আদমী হোগা, বক্সা হিঁয়া কিয়া কাম, হামকো কুছু মালুম নেহি, মালুম হোনাভী কুছ জরুর নেহি। কিয়া জানে, বহ অন্দরকা খবরদারিকে লিয়ে আতা যাতা হৈ।

তৌ ভী, যব পুষিদা হোকে আতা যাতা, তব হম লোগোঁকে কুছ মিল না চাহিয়ে। তোমকো কুছ মিলা হোগা—আধা হমকো দে দেও, হম নেহি কুছ বোলেঙ্গে।

মু। সে আমায় কিছু দেয় নাই। পাইলে দিব।

পাঁড়ে। আদা কর্‌কে লে লেও।

মুরলা ভাবিল, এ সৎ পরামর্শ। রাণীর কাছে গহনা খানা, কাপড় খানা, মুরলার পাওয়া হইয়াছে, কিন্তু গঙ্গারামের কাছে কিছু হয় নাই। অতএব বুদ্ধি খাটাইয়া পাঁড়েজীকে বলিল,

"আচ্ছা, এবার যে দিন আসিবে, তুমি ছাড়িও না। আমি বলিলেও ছাড়িও না। তা হলে কিছু আদায় হইবে।"

তার পর যে রাত্রে গঙ্গারাম পুর প্রবেশার্থ আসিল পাঁড়জী ছাড়িলেন না। মুরলা অনেক বকিল ঝকিল, শেষ অনুনয় বিনয় করিল, কিছুতেই না। গঙ্গারাম পরামর্শ করিলেন, পাঁড়ের কাছে প্রকাশ হইবেন, নগররক্ষক জানিতে পারিলে, পাঁড়ে আর আপত্তি করিবে না। মুরলা বলিল, "আপত্তি করিবে না, কিন্তু লোকের কাছে গল্প করিবে। এ আমার ভাই যায় আসে গল্প করিলে, যা দোষ আমার ঘাড়ের উপর দিয়া যাইবে" কথা যথার্থ বলিয়া গঙ্গারাম স্বীকার করিলেন। তার পর গঙ্গারাম মনে করিলেন, এটাকে এইখানে মারিয়া ফেলিয়া দিয়া যাই।" কিন্তু তাতে আরও গোল। হয় ত, একেবারে এ পথ বন্ধ হইয়া যাইবে। সুতরাং নিরস্ত হইলেন। পাঁড়ে কিছুতেই ছাড়িল না, সুতরাং সে রাত্রে ঘরে ফিরিয়া যাইতে হইল।

মুরলা একা ফিরিয়া আসিলে, রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তিনি কি আজ আসিলেন না?"

মু। তিনি আসিয়া ছিলেন—পাহারাওয়ালা ছাড়িল না।

রাণী। রোজ ছাড়ে, আজ ছাড়িল না কেন?

মু। তার মনে একটা সন্দেহ হইয়াছে।

রাণী। কি সন্দেহ?

মু। আপনার শুনিয়া কায কি? সে সকল আপনার সাক্ষাতে

আমরা মুখে আনিতে পারি না, তাঁহাকে কিছু দিয়া বশীভূত করিলে ভাল হয়।

রমার গা দিয়া, ঘাম বাহির হইতে লাগিল। রমা ঘামিয়া, কাঁপিয়া বসিয়া পড়িল। বসিয়া, শুইয়া পড়িল। শুইয়া চক্ষু বুজিয়া, অজ্ঞান হইল। এমন কথা রমার এক দিনও মনে আসে নাই। আর কেহ হইলে মনে আসিত, কিন্তু রমা এমনই ভয়বিহ্বলা হইয়া গিয়াছিল, যে সে দিকটা একেবারে নজর করিয়া দেখে নাই। এখন বজ্রাঘাতের মত কথাটা বুকের উপর পড়িল। দেখিল, ভিতরে যাই থাক, বাহিরে কথাটা ঠিক। মনে ভাবিয়া দেখিল, বড় অপরাধ হইয়াছে। রমার স্থূল বুদ্ধি, তবু স্ত্রীলোকের, বিশেষতঃ হিন্দুর মেয়ের, একটা বুদ্ধি আছে, যাহা একবার উদয় হইলে, এ সকল কথা বড় পরিষ্কার হইয়া আসে। যত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, রমা মনে করিয়া দেখিল—বুঝিল বড় অপরাধ হইয়াছে। তখন রমা মনে ভাবিল, বিষ খাইব কি গলায় ছুরি দিব। ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল, গলায় ছুরি দেওয়াই উচিত, তাহা হইলে সব পাপ চুকিয়া যায়, মুসলমানের ভয়ও ঘুচিয়া যায়, কিন্তু ছেলের কি হইবে? রমা শেষ স্থির করিল, রাজা আসিলে গলায় ছুরি দেওয়া যাইবে, তিনি আসিয়া, ছেলের বন্দোবস্ত যা হয় করিবেন—তত দিন মুসলমানের হাতে যদি বাঁচি। মুসলমানের হাতে ত বাঁচিব না নিশ্চিত, তবু গঙ্গারামকে আর ডাকিব না, কি লোক পাঠাইব না। তা, রমা আর গঙ্গারামের কাছে লোক পাঠাইল না, কি মুরলাকে যাইতে দিল না।

মুরলা আর আসে না, রমা আর ডাকে না, গঙ্গারাম অস্থির হইল। আহার নিদ্রা বন্ধ হইল। গঙ্গারাম মুরলার সন্ধানে ফিরিতে লাগিল। কিন্তু মুরলা রাজবাটীর পরিচারিকা—রাস্তা ঘাটে সচরাচর বাহির হয় না, কেবল মহিষীর হুকুমে গঙ্গারামের সন্ধানে বাহির হইয়াছিল। গঙ্গারাম মুরলার কোন সন্ধান পাইলেন না। শেষ নিজে এক দূতী খাড়া করিয়া মুরলার কাছে পাঠাইলেন—তাকে ডাকিতে। রমার কাছে পাঠাইতে সাহস হয় না।

মুরলা আসিল—জিজ্ঞাসা করিল "ডাকিয়াছ কেন?"

গঙ্গারাম। আর খবর নাও না কেন?

মুরলা। জিজ্ঞাসা করিলে খবর দাও কই? আমাদের ত তোমার বিশ্বাস হয় না?

গঙ্গা। তা ভাল, আমি গিয়াও না হয় বলিয়া আসিতে পারি।

মুরলা। বালি।

গঙ্গা। সে আবার কি?

মুরলা। ছোট রাণী আরাম হইয়াছেন।

গঙ্গা। কি হইয়াছিল যে আরাম হইয়াছেন?

মুরলা। তুমি আর জান না কি হইয়াছিল।

গঙ্গা। না।

মুরলা। দেখ নাই? বাতিকের ব্যামো।

গঙ্গা। সে কি?

মুরলা। নহিলে তুমি অন্দরমহলে ঢুকিতে পাও?

গঙ্গা। কেন আমি কি?

মুরলা। তুমি কি সেখানকার যোগ্য?

গঙ্গা। আমি তবে কোথ কার যোগ্য?

মু। এই ছেঁড়া আঁচলের। বাপের বাড়ী লইয়া যাইতে হয়, ত আমাকে লইয়া চল। আমি জেতে কৈবর্ত্ত, বিবাহ আড়াইটা হইয়াছে, তাতে যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তবে আমারও সাড়ে তিনটায় আপত্তি নাই।

এই বলিয়া মুরলা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। গঙ্গারাম বুঝিল, এ দিগে কোন ভরসা নাই। ভরসা নাই, এ কথা কি তখন মন বুঝে? যতক্ষণ পাপ করিবার শক্তি থাকে, ততক্ষণ যার মন পাপে রত হইয়াছে, তার ভরসা থাকে। "পৃথিবীতে যত পাপ থাকে, সব আমি করিব তবু আমি রমাকে ছাড়িব না।" এই সঙ্কল্প করিয়া কৃতঘ্ন গঙ্গারাম, ভীষণমূর্ত্তি হইয়া আপনার গৃহে প্রত্যাগমন করিল। সেই রাত্রে ভাবিয়া ভাবিয়া গঙ্গারাম, রমা ও সীতারামের সর্ব্বনাশের উপায় চিন্তা করিল।

কৃষ্ণচরিত্র।

রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরিয়া গেলেন। সভাপর্ব্বে আর তাঁহাকে দেখিতে পাই না। তবে এক স্থানে তাঁহার নাম হইয়াছে—সে কথাটা সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত।

দ্যুতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে হারিলেন। তার পর দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, এবং সভা মধ্যে বস্ত্র হরণ। মহাভারতের এই ভাগের মত, কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট রচনা জগতের সাহিত্যে বড় দুর্ল্লভ। কিন্তু কাব্য এখন আমাদের সমালোচনীয় নহে—ঐতিহাসিক মূল্য কিছু আছে কি না পরীক্ষা করিতে হইবে। যখন দুঃশাসন সভা মধ্যে দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করিতে প্রবৃত্ত, নিরুপায় দ্রৌপদী তখন কৃষ্ণকে মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন। সে অংশ উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

"তদনন্তর দুঃশাসন সভা মধ্যে বলপূর্ব্বক দ্রৌপদীর পরিধেয় বসন আকর্ষণ করিবার উপক্রম করিলে দ্রৌপদী এইরূপে শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "হে গোবিন্দ! হে দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ! হে গোপীজনবল্লভ! কৌরবগণ আমাকে অভিভূত করিতেছে, আপনি কি তাহার কিছুই জানিতেছেন না? হা নাথ! হা রমানাথ! হা ব্রজনাথ! হা দুঃখনাশন! আমি কৌরব সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, আমাকে উদ্ধার কর! হা জনার্দ্দন! হা কৃষ্ণ! হে মহাযোগিন্! বিশ্বাত্মন্! বিশ্বভাবন! আমি কুরুমধ্যে অবসন্ন হইতেছি, হে গোবিন্দ! এই বিপন্নজনকে পরিত্রাণ কর।' সেই দুঃখিনী ভাবিনী এইরূপে ভুবনেশ্বর কৃষ্ণের স্মরণ করিয়া অবগুণ্ঠিতমুখী হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন'। করুণাময় কেশব যাজ্ঞসেনীর করুণ বাক্য শ্রবণে শয্যাসন এবং প্রাণপ্রিয়তমা কমলাকে পরিত্যাগ করিয়া আগমন করিতে লাগিলেন। * এ দিকে মহাত্মা ধর্ম্ম অন্তরিত হইয়া নানাবিধ বস্ত্রে দ্রৌপদীকে আচ্ছাদিত করিলেন। তাঁহার বস্ত্র যত আকর্ষণ

---

* আসেন নাই।

করে ততই অনেক প্রকার বস্ত্র প্রকাশিত হয়। ধর্ম্মের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা। ধর্ম্ম প্রভাবে নানারাগরঞ্জিত বসন সকল ক্রমে ক্রমে প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সভামধ্যে ঘোরতর কলেরব আরম্ভ হইল।"

ইহার মধ্যে দুইটী পদ প্রতি বিশেষ মনোযোগ আবশ্যক—"গোপীজন বল্লভ!" এবং "ব্রজনাথ।" এই স্থানটিকে যদি মৌলিক মহাভারতের অন্তর্গত স্বীকার করা যায় এবং উহা যদি ব্যাসদেব বা অন্য কোন সমকালবর্ত্তী ঋষি প্রণীত হয়, তবে তন্মধ্যে এই দুইটি শব্দ থাকাতে কৃষ্ণের ব্রজলীলা মৌলিক বৃত্তান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। একটু বিচার করিয়া দেখা যাক।

এ রকম কাপড় বাড়াটা বড় অনৈসর্গিক ব্যাপার। যাহা অনৈসর্গিক, প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ, তাহা অলীক এবং অনৈতিহাসিক বলিয়া অগ্রাহ্য করিবার আমাদের অধিকার আছে। যাঁহারা বলিবেন, যে ঈশ্বরের ইচ্ছায় সকলই হইতে পারে, তাঁহাদিগকে আমরা এই উত্তর দিই—ঈশ্বরের ইচ্ছায় সকলই হইতে পারে বটে, কিন্তু তিনি যাহা করেন তাহা স্বপ্রণীত নৈসর্গিক নিয়মের দ্বারাই সম্পন্ন করেন। তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি বিপদ হইতে উদ্ধার করেন বটে, কিন্তু ইহা নৈসর্গিক ক্রিয়া ভিন্ন অনৈসর্গিক উপায়ের দ্বারা করিয়াছেন, ইহা কখন দৃষ্টি গোচর হয় না। যাঁহারা বলিবেন, কলিযুগে হয় না, কিন্তু যুগান্তরে হইত, তাঁহাদের স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে জগৎ চিরকাল এক নিয়মেই চলিতেছে। যদি তাহার অন্যথা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে জাগতিক নিয়ম সকল পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ইহা বিজ্ঞান বিরুদ্ধ।

এক্ষণে, মহাভারতের মৌলিক অংশ যদি কোন সমকালবর্ত্তী ঋষি প্রণীত বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে স্পষ্টই এই বস্ত্রবৃদ্ধি ব্যাপারটাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কেন না কোন সমকালবর্ত্তী লেখকই এত বড় মিথ্যাটা প্রচার করিতে সাহস পাইতেন না। তখনকার আর্য্যবংশীয়গণ এখনকার বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগের মত যদি নিরক্ষর ও নির্ব্বোধ হইতেন, তাহা হইলেই এ সাহস সম্ভব।

আর যদি মৌলিক মহাভারত সমকালবর্ত্তী ঋষি প্রণীত না হয়,

যদি তৎপ্রণেতা অনেক পরবর্ত্তী হন, তাহা হইলে মৌলিক মহাভারতে এরূপ অনৈসর্গিক কথা থাকিতে পারে, কেন না তাঁহাকে কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করিতে হয়। এবং কিম্বদন্তীর সঙ্গে অনেক মিথ্যা কথা জড়াইয়া আসিয়া পড়ে। কিন্তু মৌলিক মহাভারত যদি পরবর্ত্তী ঋষি প্রণীত হয়, তাহা হইলে যে অংশ অনৈসর্গিক তাহা প্রক্ষিপ্ত না হইলেও অলীক বলিয়া অগ্রাহ্য।

আমরা মহাভারতে যেখানে যেখানে ব্রজলীলা প্রাসঙ্গিক এইরূপ কোন কথা পাই, সেই খানেই দেখি যে তাহা কোন অনৈসর্গিক ব্যাপারের সঙ্গে গাঁথা আছে। সুভদ্রা হরণ, বা দ্রোপদীস্বয়ম্বরের ন্যায় প্রকৃত এবং নৈসর্গিক ঘটনার সঙ্গে এমন কোন প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না; চক্রাস্ত্র দ্বারা শিশুপাল বধ, বা দ্রৌপদীর বস্ত্র বৃদ্ধি প্রভৃতি অনৈসর্গিক ব্যাপারের সঙ্গেই এরূপ কথা দেখি। ইহা হইতে যে সিদ্ধান্ত ন্যায্য হয় পাঠক তাহা করিবেন।

তার পর বনপর্ব্ব। বনপর্ব্বে দুইবার মাত্র কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। প্রথম, পাণ্ডবেরা বনে গিয়াছেন শুনিয়া বৃষ্ণিভোজেরা সকলে তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিয়াছিল—কৃষ্ণও সেই সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ইহা সম্ভব। কিন্তু যে অংশে এই বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহা মহাভারতের প্রথম স্তরগতও নহে, দ্বিতীয় স্তরগতও নহে। রচনার সাদৃশ্য কিছু মাত্র নাই। চরিত্রগত সঙ্গতি কিছু মাত্র নাই। কৃষ্ণকে আর কোথাও রাগিতে দেখা যায় না, কিন্তু এখানে, যুধিষ্ঠিরের কাছে আসিয়াই কৃষ্ণ চটিয়া লাল। কারণ কিছুই নাই, কেহ শত্রু উপস্থিত নাই, কেহ কিছু বলে নাই, কেবল দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে মারিয়া ফেলিতে হইবে, এই বলিয়াই এমন রাগ যে যুধিষ্ঠির বহুতর স্তব স্তুতি মিনতি করিয়া তাঁহাকে থামাইলেন। যে কবি লিখিয়াছেন, যে কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে মহাভারতের যুদ্ধে তিনি অস্ত্রধারণ করিবেন না, একথা সে কবির লেখা নয়, ইহা নিশ্চিত। তার পর এখনকার হোঁৎকাদিগের মত কৃষ্ণ বলিয়া বসিলেন, "আমি থাকিলে এতটা হয়!—আমি বাড়ী ছিলাম না।" তখন যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ কোথায় গিয়াছিলেন, সেই পরিচয় লইতে লাগিলেন। তাহাতে শাল্ববধের কথাটা

উঠিল। তাহার সঙ্গে কৃষ্ণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই পরিচয় দিলেন। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। সৌভ নামে তাহার রাজধানী। সেই রাজধানী আকাশময় উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়: শাল্ব তাহার উপর থাকিয়া যুদ্ধ করে। সেই অবস্থায় কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ হইল। যুদ্ধের সময়ে কৃষ্ণের বিস্তর কাঁদা কাটি। শাল্ব একটা মায়া বসুদেব গড়িয়া তাহাকে কৃষ্ণের সম্মুখে বধ করিল দেখিয়া কৃষ্ণ কাঁদিয়া মূর্চ্ছিত। এ জগদীশ্বরের চিত্র ও নহে. কোন মানুষিক ব্যাপারের চিত্রও নহে। ভরসা করি কোন পাঠক এসকল উপন্যাসের সমালোচনার প্রত্যাশা করেন না।

তার পর বনপর্ব্বের শেষের দিগে মার্কণ্ডেয় সমস্যা পর্ব্বাধ্যায়ে আবার কৃষ্ণকে দেখিতে পাই। পাণ্ডবেরা কাম্যক বনে আসিয়াছেন শুনিয়া, কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে আবার দেখিতে আসিয়াছিলেন—এবার একা নহে. ছোট ঠাকুরাণীটী সঙ্গে। মার্কণ্ডেয় সমস্যা পর্ব্বাধ্যায় একখানি বৃহৎ গ্রন্থ বলিলেও হয়। কিন্তু মহাভারতের সসম্বন্ধ আছে, এমন কথা উহাতে কিছুই নাই। সমস্তটাই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয়। মহাভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের রচনার সঙ্গে কোন সাদৃশ্যই নাই। কিন্তু ইহা মৌলিক মহাভারতের অংশ কিনা তাহা আমাদের বিচারে কোন প্রয়োজন রাখে না। কেন না কৃষ্ণ এখানে কিছুই করেন নাই। আসিয়া যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী প্রভৃতিকে কিছু মিষ্ট কথা বলিলেন, উত্তরে কিছু মিষ্ট কথা শুনিলেন। তার পর কয় জনে মিলিয়া ঋষি ঠাকুরের আষাঢ়ে গল্প সকল শুনিতে লাগিলেন।

যদিও কৃষ্ণচরিত্রের সঙ্গে ইহার বিশেষ সম্বন্ধ নাই, তথাপি এই মার্কণ্ডেয় সমস্যা পর্ব্বাধ্যায় হইতে দুই একটা কথা চুনিয়া পাঠককে উপহার দিলে বোধ হয় কোন ক্ষতি হইবে না।

যথার্থ ব্রাহ্মণ কে? এই প্রশ্নের উত্তরে কথিত হইতেছে। "যিনি ক্রোধ মোহ পরিত্যাগ করেন, সতত সত্য বাক্য কহেন ও গুরুজনকে সন্তুষ্ট করেন, যিনি হিংসিত হইয়াও হিংসা করেন না, সতত শুচি, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ, স্বাধ্যায়নিরত হইয়া থাকেন, এবং কামক্রোধ প্রভৃতি রিপু বর্গকে বশীভূত করেন। যিনি সমুদায় লোককে আত্মবৎ বিবেচনা করেন

ও সর্ব্ব ধর্ম্মে রত হন, যিনি যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও যথাশক্তি দান করিয়া থাকেন, যিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক অপ্রমত্ত হইয়া বেদাধ্যয়ন করেন, দেবগণ তাঁহাকেই যথার্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।" তা হইলে পাঠকদিগকে উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে, যে এই লক্ষণচ্যুত কোনব্যক্তি বামনাই ফলাইলে, তাহার সঙ্গে শূদ্রবৎ ব্যবহার করিতে পারেন।

পরোপকারের নিয়ম—"অযাচিত হইয়া অন্যের প্রিয়কার্য্য করিবে।"

খ্রীষ্টানদিগের Doctrine of Repentance—'কুকর্ম্ম করিয়া অনুতাপ করিলে পাপ হইতে মুক্ত হয়।'"

তিন কথায় ধর্ম্ম শাস্ত্র সংগ্রহ—"কখন পরের অনিষ্ট চিন্তা করিবে না। দান করিবে ও সত্য কথা কহিবে।"

Doctrine of Utility—"যাহা সাধারণের একান্ত হিতজনক তাহা সত্য।"

যথার্থ তপস্যা কি? "ইন্দ্রিয় সংযম"করিলেই তপস্যা হয়; উহা ভিন্ন তপোঽনুষ্ঠানের আর কোন প্রকার উপায় নাই।"

যথার্থ যোগবিধি কি? "ইন্দ্রিয় ধারণের নামই যোগবিধি।"

মার্কণ্ডেয়ের কথা ফুরাইলে দ্রৌপদী সত্যভামাতে কিছু কথা হইল। কৃষ্ণচরিত্রের সঙ্গে তাহার কিছু সম্বন্ধ নাই। বড় মনোহর কথা, কিন্তু সকল গুলি কথা উদ্ধৃত করা যায় না।

তাহার পর বিরাটপর্ব্ব। বিরাটপর্ব্বে কৃষ্ণ দেখা দেন নাই—কেবল শেষে উত্তরার বিবাহে আসিয়া উপস্থিত। আসিয়া যে সকল কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন, তাহা উদ্যোগপর্ব্বে আছে। উদ্যোগপর্ব্বে কৃষ্ণের অনেক কথা আছে। ক্রমশঃ সমালোচনা করিব।

হিন্দুধর্ম্মে ঈশ্বরভিন্ন দেবতা নাই।

প্রথমে জড়োপাসনা। তখন জড়কেই চৈতন্যবিশিষ্ট বিবেচনা হয়, জড় হইতে জাগতিক ব্যাপার নিষ্পন্ন হইতেছে বোধ হয়। তাহার পর দেখিতে

পাওয়া যায়, জাগতিক ব্যাপার সকল নিয়মাধীন। একজন সর্ব্বনিয়ন্তা তখন পাওয়া যায়। ইহাই ঈশ্বর জ্ঞান। কিন্তু যে সকল জড়কে চৈতন্য বিশিষ্ট বলিয়া কল্পনা করিয়া লোকে উপাসনা করিত, ঈশ্বর-জ্ঞান হইলেই তাহাদের উপাসনা লোপ পায় না। তাহারা সেই সর্ব্বস্রষ্টা ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট চৈতন্য এবং বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত বলিয়া উপাসিত হইতে থাকে।

তবে দেবগণ ঈশ্বরসৃষ্ট, এ কথা ঋগ্বেদের সূক্তের ভিতর পাইবার তেমন সম্ভাবনা নাই। কেন না সূক্ত সকল ঐ সকল দেবগণেই স্তোত্র; স্তোত্রে স্তুতকে কেহ ক্ষুদ্র বলিয়া উল্লেখ করিতে চাহে না। কিন্তু ঐ ভাব উপনিষদ্ সকলে অত্যন্ত পরিস্ফুট। ঋগ্বেদীয় ঐতরেয়োপনিষদের আরম্ভেই আছে,

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ।

অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল একমাত্র আত্মাই ছিলেন—আর কিছুমাত্র ছিল না। পরে তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়া, দেবগণকে সৃষ্টি করিলেন;

স ঈক্ষতে মেনু লোকা লোকপালান্নু সৃজা ইতি। ইত্যাদি।

আমরা বলিয়াছি যে পরিশেষে যখন জ্ঞানের আধিক্যে লোকের আর জড় চৈতন্যে বিশ্বাস থাকে না, তখন উপাসক ঐ সকল জড়কে ঈশ্বরের শক্তি বা বিকাশ মাত্র বিবেচনা করে। তখন ঈশ্বর হইতে ইন্দ্রাদির ভেদ থাকে না, ইন্দ্রাদি নাম, ঈশ্বরের নামে পরিণত হয়। ইহাই আচার্য্য মাক্ষ মূলরের Henotheism. ঋগ্বেদ হইতে তিনি ইহার বিস্তর উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন. সুতরাং যাঁহারা এই কথার বৈদিক প্রমাণ চাহেন, তাঁহাকে উক্ত লেখকের গ্রন্থাবলীর উপর বরাত দিলাম। এখানে সে সকল প্রমাণের পুনঃ সংগ্রহের প্রয়োজন নাই। যে কথাটা আচার্য্য মহাশয় বুঝেন নাই. তাহা এই। তিনি বলেন, এটি বৈদিক ধর্ম্মের বিশেষ লক্ষণ. যে যখন যে দেবতার স্তুতি করা হয়, তখন সেই দেবতাকে সকলের উপর বাড়ান হয়। স্থূল কথা যে উহা বৈদিক ধর্ম্মের বিশেষ লক্ষণ নহে—পুরাণেতিহাসে সর্ব্বত্র আছে;—উহা পরিণত হিন্দু ধর্ম্মের একেশ্বর বাদের সঙ্গে প্রাচীন বহু দেবোপাসনার সংমিলন। যখন দেবতা একমাত্র বলিয়া স্বীকৃত হইলেন, তখন ইন্দ্র, বায়ু বরুণাদি নাম গুলি তাঁহারই নাম হইল। এবং তিনিই ইন্দ্রাদি নামে স্তুত হইতে লাগিলেন।

এই ইন্দ্রাদি যে দেবে সকলই ঈশ্বর স্বরূপ উপাসিত হইতেন, তাহার প্রমাণ বেদ হইতে দিলাম না। আচার্য্য মাক্ষ মূলরের গ্রন্থে সকল উদ্ধৃত Henotheism সম্বন্ধীয় উদাহরণ গুলিই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ।—আমি দেখাইব যে ইহা কেবল বেদে নহে, পুরাণেতিহাসেও আছে। তজ্জন্য মহাভারত হইতে কয়েকটি স্তোত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

ইন্দ্র স্তোত্র আদি পর্ব্বের পঞ্চবিংশ অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। "হে সুরপতে! সম্প্রতি তোমা ব্যতিরেকে আমাদিগের প্রাণ রক্ষার আর কোন উপায়ান্তর নাই—যে হেতু তুমিই প্রচুর বারি বর্ষণ করিতে সমর্থ। তুমি বায়ু; তুমি মেঘ, তুমি অগ্নি; তুমি গগন মণ্ডলে সৌদামিনী রূপে প্রকাশমান হও এবং তোমা হইতেই ঘনাবলী পরিচালিত হইয়া থাকে; তোমাকেই লোকে মহামেঘ বলিয়া নির্দ্দেশ করে; তুমি ঘোর ও প্রকাণ্ড বজ্রজ্যোতিঃস্বরূপ, তুমি আদিত্য; তুমি বিভাবসু; তুমি অত্যাশ্চর্য্য মহাভূত; তুমি নিখিল দেবগণের অধিপতি; তুমি সহস্রাক্ষ; তুমি দেব; তুমি পরমগতি; তুমি অক্ষয় অমৃত; তুমি পরম পূজিত সৌম্যমূর্ত্তি; তুমি মুহূর্ত্ত; তুমি তিথি; তুমি বল; তুমি ক্ষণ; তুমি শুক্লপক্ষ; তুমি কৃষ্ণপক্ষ; তুমিই কলা, কাষ্ঠা, ত্রুটী, মাস, ঋতু, সম্বৎসর ও অহোরাত্র; তুমি সমস্ত পর্ব্বত ও বনসমাকীর্ণ বসুন্ধরা; তুমি তিমিরবিরহিত ও সূর্য্যসংস্কৃত আকাশ; তুমি তিমিতিমিঙ্গিল সহিত উত্তুঙ্গতরঙ্গকুলসঙ্কুল মহার্ণব।" এই স্তোত্রে জগদ্ব্যাপী পরমেশ্বরের বর্ণনা করা হইল।

তার পর আদি পর্ব্বের দুই শত উনবিংশ অধ্যায় হইতে অগ্নি স্তোত্র উদ্ধৃত করি।

'হে হুতাশন! মহর্ষিগণ কহেন, তুমিই এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছ, তুমি না থাকিলে এই সমস্ত জগৎ ক্ষণকালমধ্যে ধ্বংস হইয়া যায়; বিপ্রগণ স্ত্রীপুত্র সমভিব্যাহারে তোমাকে নমস্কার করিয়া স্বধর্ম্মবির্জিত ইষ্টগতিপ্রাপ্ত হন। হে অগ্নে! সজ্জনগণ তোমাকে আকাশবিলগ্ন সবিদ্যুৎ জলধর বলিয়া থাকেন: তোমা হইতে অস্ত্র সমুদায় নির্গত হইয়া সমস্ত ভূতগণকে দগ্ধ করে; হে জাতবেদঃ! এই সমস্ত চরাচর বিশ্ব তুমিই নির্ম্মাণ করিয়াছ; তুমিই সর্ব্বাগ্রে জলের সৃষ্টি করিয়া তৎপরে তাহা হইতে সমস্ত জগৎ

উৎপাদন করিয়াছ; তোমাতেই হব্য ও কব্য যথাবিধি প্রতিষ্ঠিত থাকে; হে দেব! তুমি দহন; তুমি ধাতা; তুমি বৃহস্পতি; তুমি অশ্বিনীকুমার, তুমি মিত্র; তুমি সোম এবং তুমিই পবন।"

বনপর্ব্বের তৃতীয় অধ্যায়ে সূর্য্য স্তোত্র এইরূপ—"ওঁ সূর্য্য; অর্য্যমা ভগ, ত্বষ্টা, পূষা, অর্ক, সবিতা, রবি, গভস্তিমান, অজ, কাল, মৃত্যু, ধাতব, প্রভাকর, পৃথিবী, জল, তেজঃ, আকাশ, বায়ু, সোম, বৃহস্পতি, শুক্র, বুধ, অঙ্গারক, ইন্দ্র, বিবস্বান, দীপ্তাংশু, শুচি, সৌরি, শনৈশ্চর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, স্কন্দ, বরুণ, যম, বৈদ্যুতাগ্নি, জঠরাগ্নি, ঐন্ধনাগ্নি, তেজঃপতি, ধর্ম্মধ্বজ, বেদকর্ত্তা, বেদাঙ্গ, বেদবাহন, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, ক্ষপা, যাম, ক্ষণ, সম্বৎসরকর, অশ্বত্থ, কালচক্র, বিভাবসু, ব্যক্তাব্যক্ত, পুরুষ, শাশ্বতযোগী কালাধ্যক্ষ, প্রজাধ্যক্ষ, বিশ্বকর্ম্মা, তমোনুদ, বরুণ, সাগর অংশ, জীমূত, জীবন, অরিহা, ভূতাশ্রয়, ভূতপতি, স্রষ্টা, সম্বর্ত্তক, বহ্নি, সর্ব্বাদি, অলোলুপ, অনন্ত, কপিল, ভানু, কামদ, জয়, বিশাল, বরদ, মন, সুপর্ণ, ভূতাদি, শীঘ্রগ, ধন্বন্তরি, ধূমকেতু, আদিদেব, দিতিসুত, দ্বাদশাক্ষর, অরবিন্দাক্ষ, পিতা, মাতা, পিতামহ, স্বর্গদ্বার, প্রজাদ্বার, মোক্ষদ্বার, ত্রিবিষ্টপ, দেহকর্ত্তা, প্রশান্তাত্মা, বিশ্বাত্মা, বিশ্বতোমুখ, চরাচরাত্মা, সূক্ষ্মাত্মা ও মৈত্রেয়। স্বয়ম্ভু ও অমিততেজা।"

তার পর আদিপর্ব্বে তৃতীয় অধ্যায়ের অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তোত্র উদ্ধৃত করিতেছি:—

"হে অশ্বিনীকুমার! তোমরা সৃষ্টির প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলে, তোমরাই সর্ব্বভূত-প্রধান হিরণ্যগর্ভরূপে উৎপন্ন হইয়াছ, পরে তোমরাই সংসারে প্রপঞ্চস্বরূপে প্রকাশমান হইয়াছ। দেশকাল ও অবস্থাদ্বারা তোমাদিগের ইয়ত্তা করা যায় না; তোমরাই মায়া ও মায়ারূঢ় চৈতন্যরূপে দ্যোতমান আছ; তোমরা শরীর বৃক্ষে পক্ষিরূপে অবস্থান করিতেছ; তোমরা সৃষ্টির প্রক্রিয়ার পরমাণু সমষ্টি ও প্রকৃতির সহযোগিতার আবশ্যকতা রাখ না; তোমরা বাক্য ও মনের অগোচর, তোমরাই স্বীয়প্রকৃতি বিক্ষেপশক্তি দ্বারা নিখিলবিশ্বকে সুপ্রকাশ করিয়াছ।"

দুই শত একত্রিশ অধ্যায়ে কার্ত্তিকেয়ের স্তোত্র এইরূপঃ—

"তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমি পরম পবিত্র; মন্ত্র সকল তোমারই স্তব করিয়া থাকে; তুমিই বিখ্যাত হুতাশন, তুমিই সংবৎসর, তুমিই ছয় ঋতু, মাস, অর্দ্ধ মাস, অয়ণ ও দিক্। হে রাজীবলোচন! তুমি সহস্রমুখ ও সহস্র বাহু; তুমি লোক সকলের পাতা. তুমি পরমপবিত্র হবি, তুমিই সুরাসুরগণের শুদ্ধিকর্ত্তা; তুমিই প্রচণ্ড প্রভু ও শত্রুগণের জেতা; তুমি সহস্রভূ; তুমি সহস্রভুজ ও সহস্রশীর্ষ; তুমি অনন্তরূপ, তুমি সহস্রপাৎ, তুমিই গুরু-শক্তিধারী"

তার পর আদি পর্ব্বে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের গরুড় স্তোত্রে

"হে মহাভাগ পতগেশ্বর! তুমি ঋষি, তুমি দেব, তুমি প্রভু. তুমি সূর্য্য, তুমি প্রজাপতি, তুমি ব্রহ্মা, তুমি ইন্দ্র. তুমি হয়গ্রীব, তুমি শর, তুমি জগৎ-পতি, তমি সুখ, তুমি দুঃখ, তুমি বিপ্র, তুমি অগ্নি, তুমি পবন, তুমি ধাতা, তুমি বিধাতা, তুমি বিষ্ণু, তুমি অমৃত. তুমি মহৎযশঃ, তুমি প্রভা, তুমি আমাদিগের পবিত্রস্থান, তুমি বল, তুমি সাধু, তুমি মহাত্মা, তুমি সমৃদ্ধিমান, তুমি অন্তক, তুমি স্থিরাস্থির সমস্ত পদার্থ, তুমি অতি দুঃসহ, তুমি উত্তম, তুমি চরাচর স্বরূপ, হে প্রভূতকীর্ত্তি গরুড়! ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তোমা হইতেই ঘটিতেছে, তুমি স্বকীয় প্রভাপুঞ্জে সূর্য্যের তেজোরাশি সমাক্ষিপ্ত করিতেছ, হে হুতাশনপ্রভ! তুমি কোপাবিষ্ট দিবাকরের ন্যায় প্রজা সকলকে দগ্ধ করিতেছ, তুমি সর্ব্বসংহারে উদ্যত যুগান্ত বায়ুর ন্যায় নিতান্ত ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়াছ। আমরা মহাবলপরাক্রান্ত বিদ্যুৎসমান-কান্তি, গগণবিহারী, অমিতপরাক্রমশালী, খগকুলচূড়ামণি, গরুড়ের শরণ লইলাম।"

ব্রহ্মা, বিষ্ণু. এবং শিব সম্বন্ধে এইরূপ স্তোত্রের এতই বাহুল্য পুরাণাদিতে আছে, যে তাহার উদাহরণ দিবার প্রয়োজন হইতেছে না। এক্ষণে আমরা সেই ভগবদ্বাক্য স্মরণ করি—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তাঃ যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ

তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকং। গীতা। ৯। ২৩।

অর্থাৎ ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতা নাই। যে অন্য দেবতাকে ভজনা করে সে অবিধিপূর্ব্বক ঈশ্বরকেই ভজনা করে।

পরকাল।

পরকালের কথা সকলেরই পক্ষে আবশ্যক—সকলেই এ বিষয়ে একটা না একটা স্থির করিয়া রাখিয়াছে। বৃদ্ধা শাকওয়ালী মাছওয়ালী যাহাকেই ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর—সে অভ্রান্ত ভাবে উত্তর দিবে যে মৃত্যুর পর বৈতরণী নদী পার হইয়া যমের বাটী যাইতে হয়, তথায় বিচার হইয়া গেলে দণ্ড লইতে হয়—অথবা স্বর্গে যাইতে হয়। এ বিশ্বাস পৌরাণিক। দার্শনিক মত স্বতন্ত্র। তাহা সত্য কি মিথ্যা দার্শনিকেরাই জানিতেন। পরলোকের কথা যিনি যাহাই বলুন, সমুদয় অনুভবমূলক। তবে যে আমরা এ বিষয় কিছু বলিতে সাহস করি তাহা আমাদের ধৃষ্টতা মাত্র। কিন্তু যাঁহারা বাল্য সংস্কার ছাড়িয়া নিজে নিজে বিচার করিয়া পরকালসম্বন্ধে একটা বিশ্বাস দৃঢ় করিতে চাহেন—তাঁহাদের বলি আমাদের কথা সম্বন্ধে যুক্তি ও প্রমাণ গ্রহণ করুন। প্রমাণ আমাদের নিকট লইতে হইবে না, তাঁহারা নিজের প্রমাণ নিজে অনুসন্ধান করুন—তার পর বুঝিবেন আমরা যাহা বলিতেছি তাহা নিতান্ত অমূলক নহে।

মাতৃগর্ভে আমাদের দেহ গঠিত হয়, তখন আমাদের মন বুদ্ধি এ সকল কিছুই হয় না, কেবল মাত্র দেহটী হয়। মাতৃগর্ভের কার্য্য দেহ গঠন, তাহা সমাধা হইলে, দেহ বহিষ্কৃত বা ভূমিষ্ঠ হয়। তাহার পর দেহের মধ্যে মনুষ্যত্ব সঞ্চার হইতে থাকে। দেহ দ্বিতীয় গর্ভ। তথায় সেই মনুষ্যত্ব যে দেহেরা যে অবস্থায় যতটুকু সম্ভব তাহা প্রাপ্ত হইয়া বহিষ্কৃত হয়—সেই দ্বিতীয় জন্মকে লোকে বলে মৃত্যু। মৃত ব্যক্তিই দ্বিজ। প্রথম জন্ম মাতৃগর্ভ হইতে—দ্বিতীয় জন্ম দেহ হইতে।

যাঁহারা বলেন মৃত্যুর পর আর কিছুই থাকে না—সকলই ফুরায়—তাঁহারা এ দ্বিজত্ব স্বীকার করিবেন না—তাঁহারা মৃতব্যক্তিকে দেখিতে পান না বলিয়া তাঁহাদের এ ভ্রান্তি। মৃত ব্যক্তিকে দেখিতে না পাওয়া যাক—তাহাদের কার্য্যকারিতা দেখিতে পাওয়া যায়। সকলে সে দিকে দৃষ্টিপাত করেন না, এই জন্য তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। অনেক ঘটনা তাঁহারা দৈবাৎ ঘটিয়াছে

বলিয়া নিশ্চিন্ত হন—কিন্তু ঘটনাগুলি বাছিয়া, বুঝিয়া দেখিতে পারিলে—তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে দেহমুক্ত ব্যক্তি দ্বারা ঘটিয়াছে।

মৃত্যুর পর মনুষ্য সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তৎপূর্ব্বে মনুষ্য কেবল গঠিত হইতে থাকে মাত্র। আমরা বলিয়াছি মাতৃগর্ভে দেহ মাত্র হয়—ভূমিষ্ঠ হইবার পর দেহের ভিতর মনুষ্য গঠিত হইতে থাকে। তখন একটী দুইটী করিয়া ক্রমে বৃত্তি গুলির উদ্ভাবন আরম্ভ হয়। প্রথমের অধিকাংশ বৃত্তি গুলি দেহরক্ষার্থ, দেহ গেলে সে গুলি আর থাকে না—যথা রাগাদি। কতকগুলি সদ্বৃত্তি দেহসম্বন্ধে নহে, সে গুলি মৃত্যুর পর থাকিয়া যায়। সেই গুলি লইয়াই মানুষ মানুষ। তাহা না জন্মিলে মনুষ্য অসম্পূর্ণ হয়—নষ্ট হইয়া যায়—মৃত্যুর পর আর তাহার অস্তিত্ব থাকে না। যেমন মাতৃগর্ভে দেহ গঠন হইতে হইতে কোন অভাব বা অসম্পূর্ণতা প্রযুক্ত গর্ভস্রাবে দেহ নষ্ট হইয়া যায়—এ সংসারে সে দেহের আর অস্তিত্ব থাকে না, সেইরূপ, ভূমিষ্ঠ দেহে নানা বৃত্তির স্থানে যদি কেবল দৈহিক বৃত্তিই উদ্ভূত হয়, তাহা হইলে দেহ নাশের সঙ্গে সে বৃত্তিগুলি যায়, পরকালে আর সে মৃত ব্যক্তির অস্তিত্ব থাকে না। এই জন্য শিশু ও বালক প্রভৃতির পরকাল নাই। তাহাদের দৈহিক বৃত্তি-মাত্র হইয়াছিল—দেহের সঙ্গে সেগুলি গেল—বাকি কিছুই থাকিল না; সেইরূপ আবার যে সকল বৃদ্ধের কেবল কাম ক্রোধাদি দৈহিক বৃত্তিমাত্র জন্মিয়াছে আর কোন সদ্বৃত্তি বিকাশিত বা অঙ্কুরিত হয় নাই তাহাদেরও সেই দশা, তাহাদেরও পরকাল নাই।

সকল দেশে ধর্ম্মবেত্তারা সদ্বৃত্তির আলোচনার যে অনুরোধ করিয়া থাকেন, সদ্বৃত্তি থাকিলেই পরকাল ভাল হয় যে বলেন, তাহার হেতু এই। ধর্ম্মোপদেষ্টার উপদেশ এইরূপে ব্যাখ্যা করিলে একটা কথা মনে হয় যে সদ্বৃত্তিই আমাদের দীর্ঘায়ুর মূল। সদ্বৃত্তি না থাকিলে দেহ নাশের সঙ্গে আমরা নষ্ট হই, সেই দেহনাশই আমাদের যথার্থ মৃত্যু। আর সদ্বৃত্তি থাকিলে আমরা দীর্ঘায়ু হই, দেহনাশের পরও জীবিত থাকি।

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সীতারাম।
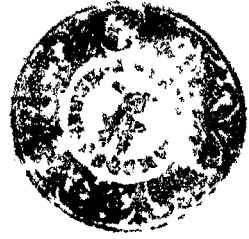
অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অনেকদিন পরে, আবার শ্রী ও জয়ন্তী বিরূপাতীরে, ললিতগিরির উপত্যকায় আসিয়াছে। মহাপুরুষ আসিতে বলিয়াছিলেন, পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে। তাই, দুইজনে আসিয়া উপস্থিত।

মহাপুরুষ কেবল জয়ন্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন—শ্রীর সঙ্গে নহে। জয়ন্তী একা হস্তিগুম্ফা মধ্যে প্রবেশ করিল,—শ্রী, ততক্ষণে বিরূপাতীরে বেড়াইতে লাগিল। পরে, শিখরদেশে আরোহণ করিয়া চন্দন বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া, নিম্নে ভূতলস্থ নদীতীরে এক তালবনের অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিতে লাগিল। পরে জয়ন্তী ফিরিয়া আসিল।

মহাপুরুষ কি আদেশ করিলেন, জয়ন্তীকে তাহা না জিজ্ঞাসা করিয়া, বলিল—"কি মিষ্ট পাখির শব্দ! কাণ ভরিয়া গেল!"

জয়ন্তী। স্বামির কণ্ঠস্বরের তুল্য কি?

শ্রী। এই নদীর তরতর গদ্‌গদ্ শব্দের তুল্য।

জয়ন্তী। স্বামির কণ্ঠশব্দের তুল্য কি?

শ্রী। অনেক দিন, স্বামির কণ্ঠ শুনি নাই—বড় আর মনে নাই।

হায়! সীতারাম!

জয়ন্তী তাহা জানিত, মনে করাইবার জন্য সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। জয়ন্তী বলিল,

"এখন শুনিলে আর তেমন ভাল লাগিবে না কি?"

শ্রী চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে, মুখ তুলিয়া, জয়ন্তীর পানে চাহিয়া, শ্রী জিজ্ঞাসা করিল,

"কেন, ঠাকুর কি আমাকে পতিসন্দর্শনে যাইতে অনুমতি করিয়াছেন?"

জয়ন্তী। তোমাকে ত যাইতেই হইবে—আমাকেও তোমার সঙ্গে যাইতে বলিয়াছেন।

শ্রী। কেন?

জয়ন্তী। তিনি বলেন, শুভ হইবে।

শ্রী। এখন আর আমার তাহাতে শুভাশুভ, সুখ দুঃখ কি ভগিনি?

জয়ন্তী। বুঝিতে পারিলে না কি শ্রি? তোমায় আজি কি এত বুঝাইতে হইবে?

শ্রী। না—বুঝি নাই।

জয়ন্তী। তোমার শুভাশুভ উদ্দিষ্ট হইলে, ঠাকুর, তোমাকে কোন আদেশ করিতেন না—আপনার স্বার্থ খুঁজিতে তিনি কাহাকেও আদেশ করেন না। ইহাতে তোমার শুভাশুভ কিছু নাই।

শ্রী। বুঝিয়াছি—আমি এখন গেলে আমার স্বামির শুভ হইবার সম্ভাবনা?

জয়ন্তী। তিনি কিছুই স্পষ্ট বলেন না—অত ভাঙ্গিয়াও বলেন না, আমাদিগের সঙ্গে বেশী কথা কহিতে চাহেন না। তবে তাঁহার কথার এইমাত্র তাৎপর্য্য হইতে পারে, ইহা আমি বুঝি। আর তুমিও আমার কাছে এতদিন যাহা শুনিলে শিখিলে, তাহাতে তুমিও বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ।

শ্রী। তুমি যাইবে কেন?

জয়ন্তী। তাহা আমাকে কিছুই বলেন নাই। তিনি আজ্ঞা করিয়াছেন, তাই আমি যাইব। এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়ানই আমার কাম—আমার অন্য কাজ নাই; না যাইব কেন? তুমি যাইবে?

শ্রী। তাই ভাবিতেছি।

জয়ন্তী। ভাবিতেছ কেন? সেই পতিপ্রাণহন্ত্রী কথাটা মনে পড়িয়াছে বলিয়া কি?

শ্রী। না। এখন আর তাহাতে ভীত নই।

জয়ন্তী। কেন ভীত নও আমাকে বুঝাও? তা বুঝিয়া তোমার সঙ্গে যাওয়া না যাওয়া আমি স্থির করিব।

শ্রী। কে কাকে মারে বহিন্? মারিবার কর্ত্তা একজন—যে মরিবে, তিনি তাহাকে মারিয়া রাখিয়াছেন। সকলেই মরে। আমার হাতে হউক, পরের হাতে হউক, তিনি একদিন মৃত্যুকে পাইবেন। আমি কখন ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহাকে হত্যা করিব না, ইহা বলাই বাহুল্য, তবে যিনি সর্ব্বকর্ত্তা তিনি যদি ঠিক করিয়া রাখিয়া থাকেন, যে আমারই হাতে তাঁহার সংসার যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি ঘটিবে, তবে কাহার সাধ্য অন্যথা করে? আমি বনে বনেই বেড়াই, আর সমুদ্র পারেই যাই, তাঁহার আজ্ঞার বশীভূত হইতেই হইবে। আপনি সাবধান হইয়া ধর্ম্মমত আচরণ করিব—তাহাতে তাঁহার বিপদ্ ঘটে, আমার তাহাতে সুখ দুঃখ কিছুই নাই।

হো হো সীতারাম! কাহার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছ!

জয়ন্তী, মনে মনে বড় খুসী হইল। কথাগুলি শিষ্যার নিকট প্রাপ্ত গুরুদক্ষিণার ন্যায় সাদরে গ্রহণ করিল। কিন্তু এখনও জয়ন্তীর কথা ফুরায় নাই। জয়ন্তী জিজ্ঞাসা করিল,

"তবে ভাবিতেছ কেন?"

শ্রী। ভাবিতেছি, গেলে যদি তিনি আর না ছাড়িয়া দেন?

জয়ন্তী। যদি কোষ্ঠীর ভয় আর নাই, তবে ছাড়িয়া নাই দিলেন? তুমিই আসিবে কেন?

শ্রী। আমি কি আর রাজ শেষ গঙ্গার সেবার যোগ্য?

জয়ন্তী। এক হাজা যখন তোমাকে সুবর্ণরেখার ধারে কি বৈতরণী তীরে প্রথম দেখিয়াছিলাম, তাহার অপেক্ষা তোমার রূপ কত গুণে বাড়িয়াছে তাহা তুমি কিছুই জান না।

শ্রী। ছি!

জয়ন্তী। গুণ কত গুণে বাড়িয়াছে তাও কি জান না? কোন্ রাজমহিষী গুণে তোমার তুল্য?

শ্রী। আমার কথা বুঝিলে কই? কই, তোমার আমার মনের মধ্যে বাঁধা রাস্তা বাঁধিয়াছ কই? আমি কি তাহা বলিতেছিলাম? বলিতেছিলাম যে, যে শ্রীকে ফিরাইবার জন্য তিনি ডাকাডাকি করিয়াছিলেন, সে শ্রী আর নাই—তোমার হাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। এখন আছে কেবল তোমার

শিষ্যা। তোমার শিষ্যাকে নিয়া মহারাজাধিরাজ সীতারাম রায় সুখী হইবেন? না তোমার শিষ্যাই মহারাজাধিরাজ লইয়া সুখী হইবে? রাজরাণীগিরি চাকরি তোমার শিষ্যার যোগ্য নহে।

জয়ন্তী। আমার শিষ্যার আবার সুখ দুঃখ কি? যোগ্যাযোগ্য কি? (পরে, সহাস্যে) ধিক্ এমন শিষ্যায়!

শ্রী। আমার সুখ দুঃখ নাই, কিন্তু তাঁহার আছে। যখন দেখিবেন, তাঁহার শ্রী মরিয়া গিয়াছে, তাহার দেহ লইয়া একজন ভৈরবী বা বৈষ্ণবীর শিষ্যা প্রবঞ্চনা করিয়া বেড়াইতেছেন, তখন কি তাঁর দুঃখ হইবে না?

জয়ন্তী। হইতে পারে, না হইতে পারে। সে সকল কথার বিচারে কোন প্রয়োজন নাই। যে অনন্তসুন্দর কৃষ্ণপাদপদ্মে মন স্থির করিয়াছ, তাহা ছাড়া আর কিছুই চিত্তে যেন স্থান না পায়—সকল দিকেই তাহা হইলে ঠিক কাজ হইবে; এক্ষণে, চল, তোমার স্বামির হউক কি যাহারই হউক, যখন শুভ সাধন করিতে হইবে, তখন এখনই যাত্রা করি।

তখন উভয়ে পর্ব্বত আরোহণ করিয়া, বিরূপা তীরবর্ত্তী পথে গঙ্গাভিমুখে চলিল। পথপার্শ্ববর্ত্তী বন হইতে বন্য পুষ্প চয়ন করিয়া উভয়ে তাহার দল কেশর রেণু প্রভৃতি ত[illegible] পরীক্ষা করিতে করিতে এবং পুষ্পনির্ম্মাতার অনন্ত কৌশলে[illegible]হিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিল। সীতারামের নাম আর কে[illegible]রও মুখে আনিল না। এ পোড়ারমুখীদিগকে জগদীশ্বর কেন রূপ যৌব[illegible] দিয়াছিলেন, তাহা তিনিই জানেন। আর যে গণ্ডমূর্খ সীতারাম শ্রী! শ্রী! করিয়া পাতি পাতি করিল সেই বলিতে পারে। পাঠক বোধ হয়, দুইটাকেই ডাকিনী শ্রেণীমধ্যে গণ্য করিবেন। তাহাতে গ্রন্থকারের সম্পূর্ণ মত আছে।

নবম পরিচ্ছেদ।

রমা বাঁচিয়া গেল, কিন্তু গঙ্গারাম বাঁচিল না। তখন গঙ্গারাম শয্যা লইল। রাজকার্য্য সকল বন্ধ করিল। সেও রমার মত স্থির করিল, বিষ খাইয়া মরিবে। কিন্তু রমাও বিষ খায় নাই, গঙ্গারামও বিষ খাইল না।

চন্দ্রচূড় ঠাকুর জানিতে পারিলেন, নগর রক্ষার কাজ, এ দুঃসময়ে, ভাল হইতেছে না, নগররক্ষক আদৌ দেখেন না। শুনিলেন, নগররক্ষক পীড়িত—শয্যাগত। তিনি নগররক্ষককে দেখিতে গেলেন। গঙ্গারাম বলিল,

"দশ পাঁচ দিন আমায় অবসর দিন। আমার শরীর ভাল নহে—আমি এখন পারিব না।"

চন্দ্রচূড়। শরীর ত উত্তম দেখিতেছি। বোধ হয় মন ভাল নহে। সেইরূপ দেখিতেছি।

গঙ্গারাম বিছানায় পড়িয়া রহিল। বিছানায় পড়িয়া অন্তর্দ্দাহ আরও বাড়িল—নিষ্কর্ম্মারই বড় অন্তর্দ্দাহ। কাজ কর্ম্মই, অন্তরের রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া শেষ গঙ্গারাম যাহা ভাবিয়া স্থির করিল, তাহা এই।

"ধর্ম্মে হৌক অধর্ম্মে হৌক, আমার রমাকে পাইতে হইবে। নহিলে মরিতে হইবে।

তা, মরি তাতে আপত্তি নাই, কিন্তু রমাকে না পাইয়া মরাও কষ্ট। কাজেই মরা হইবে না, রমাকে পাইতে হইবে।

ধর্ম্মপথে, পাইবার উপায় নাই। কাজেই অধর্ম্ম পথে পাইতে হইবে। ধর্ম্ম যে পারে, সে করুক, যে পারিল না, সে কি প্রকারে করিবে?"

গঙ্গারামের যে স্থূলভুল হইল, অধার্ম্মিক লোক মাত্রেরই সেইটি ঘটিয়া থাকে। তাহারা মনে করে, ধর্ম্মাচরণ পারিয়া উঠিলাম না, তাই অধর্ম্ম

করিতেছি। তাহা নহে; ধর্ম্ম যে চেষ্টা করে, সেই করিতে পারে। অধার্ম্মিকেরা চেষ্টা করে না, কাজেই পারে না।

গঙ্গারাম তার পর ভাবিয়া ঠিক করিতে লাগিল—

“অধর্ম্মের পথে যাইতে হইবে—কিন্তু তাই বা পথ কই? রমাকে হস্তগত করা কঠিন নহে। আমি যদি আজ বলিয়া পাঠাই, যে কাল মুসলমান আসিবে, আজ বাপের বাড়ী যাইতে হইবে, তাহা হইলে সে এখনই চলিয়া আসিতে পারে। তার পর যেখানে লইয়া যাইব, কাজেই সেইখানে যাইতে হইবে। কিন্তু নিয়া যাই কোথায়? সীতারামের এলেকায় ত একদিনও কাটিবে না। সীতারাম ফিরিয়া আসিবার অপেক্ষা সহিবে না। এখনই চন্দ্রচূড় আমার মাথা কাটিতে হুকুম দিবে, আর মেনাহাতী আমার মাথা কাটিয়া ফেলিবে। কাজেই সীতারামের এলাকার বাহিরে, যেখানে সীতারাম নাগাল না পায়, সেইখানে যাইতে হইবে। সে সবই মুসলমানের এলাকা। মুসলমানের ত আমি ফেরারি আশামী—যেখানে যাইব, সম্বাদ পাইলে আমাকে সেইখান হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া শূলে দিবে। ইহার কেবল এক উপায় আছে—যদি তোরাব খাঁর সঙ্গে ভাব করিতে পারি। তোরাব খাঁ অনুগ্রহ করিলে, জীবন ও পাইব, রমাও পাইব। ইহার উপায় আছে।”

দশম পরিচ্ছেদ।

বন্দেআলি নামে ভূষণার একজন ছোট মুসলমান একজন বড় মুসলমানের কবিলাকে বাহির করিয়া তাহাকে নেকা করিয়াছিল। পতি গিয়া বলপূর্ব্বক অপহৃতা সীতার উদ্ধারের উদ্যোগী হইল; উপপতি বিবি লইয়া মহম্মদপুর পলায়ন করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিল। গঙ্গারামের নিকট সে পূর্ব্ব হইতে পরিচিত ছিল। তাঁহার অনুগ্রহে সে সীতারামের নাগরিক সৈন্য মধ্যে শিপাহী হইল। গঙ্গারাম, তাহাকে বড় বিশ্বাস করিতেন। তিনি এক্ষণে গোপনে তাহাকে তোরাব খাঁর নিকট পাঠাইলেন। বলিয়া

পাঠাইলেন, "চন্দ্রচূড় ঠাকুর বঞ্চক। চন্দ্রচূড় যে বলিতেছেন, যে টাকা দিলে আমি মহম্মদপুর ফৌজদারের হস্তে দিব, সে কেবল প্রবঞ্চনা বাক্য। প্রবঞ্চনার দ্বারা কাল হরণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য, যাহাতে সীতারাম আসিয়া পৌছে, তিনি তাহাই করিতেছেন। নগরও তাঁহার হাতে নয়। তিনি মনে করিলেও নগর ফৌজদারকে দিতে পারেন না। নগর আমার হাতে। আমি না দিলে নগর কেহ পাইবে না, সীতারামও না। আমি ফৌজদারকে নগর ছাড়িয়া দিতে পারি। কিন্তু তাহার কথাবার্ত্তা আমি ফৌজদার সাহেবের সহিত কহিতে ইচ্ছা করি—নহিলে হইবে না। কিন্তু আমি ত ফেরারী আশামী—প্রাণভয়ে যাইতে সাহস করি না। ফৌজদার সাহেব অভয় দিলে যাইতে পারি।"

বন্দেআলি সেখকে এই সকল কথা বলিতে বলিয়া দিয়া, গঙ্গারাম বলিলেন, "লিখিত উত্তর লইয়া আইস।"

বন্দেআলি বলিল, "আমার কথায় ফৌজদার সাহেব বিশ্বাস করিয়া খত দিবেন কেন?"

গঙ্গারাম বলিল, পত্র লিখিতে আমার সাহস হয় না। আমার এই মোহর লইয়া যাও। আমার মোহর তোমার হাতে দেখিলে তিনি অবশ্য বিশ্বাস করিবেন।

বন্দেআলি মোহর লইয়া ভূষণায় গেল। ফৌজদারিতে তার চেনা লোক ছিল। ফৌজদারী সরকারে, কারকুন দপ্তরের বখশী চেরাগ আলির সঙ্গে তাহার দোস্তী ছিল। বন্দে আলি চেরাগ আলিকে ধরিল যে ফৌজদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া দাও, আমার বিশেষ জরুরী কথা আছে। বখশী গিয়া কারকুনকে ধরিল, কারকুন পেস্কারকে ধরিল, পেস্কার সাক্ষাৎ করাইয়া দিল।

গঙ্গারাম যেমন যেমন বলিয়া দিয়াছিলেন, বন্দেআলি অবিকল সেই রকম বলিল। লিখিত উত্তর চাহিল। তোরাব খাঁ কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। বুঝিলেন, যে গঙ্গারাম ত হাতছাড়া হইয়াইছে—এখন তাহাকে মাফ করায় কোন ক্ষতি হইতে পারে না। অতএব স্বহস্তে গঙ্গারামকে এই পত্র লিখিলেন,

"তোমার সকল কসুর মাফ করা গেল। কাল রাত্রিকালে হুজুরে হাজির হইবে।"

বন্দেআলি ভূষণায় ফিরিল। যে নৌকায় সে পার হইল, সেই নৌকায় চাঁদ শাহা ফকির—যাহার সঙ্গে পাঠকের মন্দিরে পরিচয় হইয়াছিল,—সেও পার হইতেছিল। ফকির, বন্দেআলির সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল। "কোথায় গিয়াছিল?" জিজ্ঞাসা করায় বন্দে আলি বলিল, "ভূষণায় গিয়াছিলাম।" ফকির ভূষণার খবর জিজ্ঞাসা করিল। বন্দেআলি ফৌজদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছে, সুতরাং একটু উঁচু মেজাজে ছিল। ভূষণার খবর বলিতে একেবারে কোতোয়াল, বকশী, মুনশী, কারকুন, পেস্কার, নাগায়েৎ খোদ ফৌজদারের খবর বলিয়া ফেলিল। ফকির বিস্মিত হইল। ফকির সীতারামের হিতাকাঙ্ক্ষী। সে মনে মনে স্থির করিল, "আমাকে একটু সন্ধানে থাকিতে হইবে।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

গঙ্গারাম ফৌজদারের সঙ্গে নিভৃতে সাক্ষাৎ করিলেন। ফৌজদার, তাঁহাকে কোন প্রকার ভয় দেখাইল না। কাজের কথা সব ঠিক হইল। ফৌজদারের সৈন্য মহম্মদপুরের দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইলে, গঙ্গারাম দুর্গদ্বার খুলিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু ফৌজদার বলিলেন,

'দুর্গদ্বারে পৌঁছিলে ত তুমি আমাদের দুর্গদ্বার খুলিয়া দিবে। এখন মেনাহাতীর তাঁবে অনেক শিপাহী আছে। পথিমধ্যে, বিশেষ পারের সময়ে তাহারা যুদ্ধ করিবে, ইহাই সম্ভব। যুদ্ধে জয়পরাজয় আছে। যদি যুদ্ধে আমাদের জয় হয়, তবে তোমার সাহায্য ব্যতীতও আমরা দুর্গ অধিকার করিতে পারি। যদি পরাজয় হয়, তবে, তোমার সাহায্যে আমাদের কোন উপকার হইবে না। তার কি পরামর্শ করিয়াছ?"

গঙ্গা। ভূষণা হইতে মহম্মদপুর যাইবার দুই পথ আছে। এক উত্তর পথ, এক দক্ষিণ পথ। দক্ষিণ পথে, দূরে দক্ষিণে পার হইতে হয়—উত্তর

বিজ্ঞাপন।

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামী কর্ত্তৃক বিরচিত,

টীকা, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সহিত।

বর্ত্তমান সময় ধর্ম্মান্দোলনের যুগ। সর্ব্বসাধারণের মন আজ কাল ধর্ম্মানুসন্ধানে রত হইতেছে। এই সকল দেখিয়া আমি প্রেমাবতার চৈতন্যদেবের জীবনলীলা ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম সম্বলিত এই অপূর্ব্ব ভক্তি গ্রন্থ প্রকাশ করিতে উৎসাহিত হইয়াছি। ধর্ম্ম পিপাসু ব্যক্তি মাত্রেই ইহা পাঠে যে অতুল আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বৈষ্ণব সমাজে এই গ্রন্থের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পুস্তকের সুবিধা না থাকায় অনেকে আপন আপন ভক্তি পিপাসা পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেছেন না। এই অপূর্ব্ব ভক্তিশাস্ত্র এপর্য্যন্ত বটতলার ও শ্রীরামপুর প্রভৃতির ছাপাখানা ভিন্ন অন্য কোন স্থান হইতে প্রকাশিত হয় না।ই যে সকল মুদ্রিত গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা অশুদ্ধি ও ভ্রমে পরিপূর্ণ। বিশেষত শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতগ্রন্থ বহুল সংস্কৃত শ্লোকে পূর্ণ এবং ইহার কবিতা সকলে ষড়দর্শন প্রভৃতি গভীর আধ্যাত্মিক মত সকল সন্নিবেশিত হওয়ায় তাহা এত দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে যে টীকা, ব্যাখ্যা ও অনুবাদের সাহায্য ভিন্ন তাহা সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হওয়া কঠিন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমি বহু পরিশ্রম সহকারে প্রাচীন হস্ত লিখিত পুঁথি ও কয়েক খানি ছাপার পুস্তকের পাঠ ঐক্য করত সংস্কৃত অংশে একটী সরল টীকা ও বঙ্গানুবাদ এবং দুরূহ বাঙ্গলা কবিতার সহজ ব্যাখ্যা সম্বলিত এই গ্রন্থ সাধরণ্যে প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। ইহাতে গ্রন্থকারের একটী সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থের স্থূল মর্ম্ম একটী দীর্ঘ ভূমিকাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার এই গ্রন্থকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। চৈতন্যাবতারের প্রয়োজন ও চৈতন্যদেবের জন্ম হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ পর্য্যন্ত বিবরণ

আদিলীলা, সন্ন্যাস হইতে দেশ পর্য্যটন ও পুরুষোত্তমে স্থিতি, মধ্য লীলা, ও শেষজীবনের অষ্টাদশবর্ষের ঘটনাবলী শেষলীলা নামে অভিহিত হইয়াছে। সমস্ত গ্রন্থ একেবারে মুদ্রিত করিতে গেলে গ্রন্থের কলেবর অতিশয় দীর্ঘ হইয়া পড়ে ও ব্যয় বাহুল্যও অতিরিক্ত হয়। সেজন্য তিনলীলা তিনখানি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবে। সম্প্রতি আদিলীলা মুদ্রিত হই তেছে। ইহা ডিমাই আটপেজি প্রায় ২০০ পৃষ্ঠায় পূর্ণ হইবে। তিন খণ্ডের মূল্য পাঁচটাকা অবধারিত হইল ; কিন্তু আগামী চৈত্রমাসের মধ্যে যাঁহারা মূল্য দিবেন তাঁহাদের তিন টাকায় সমগ্র গ্রন্থ দেওয়া হইবে। ইচ্ছা করিলে প্রথমখণ্ড প্রকাশের পূর্ব্বে ১৷৷০ ও পরে আর ১৷৷০ দিলেও চলিবে। মপস্বলে স্বতন্ত্র ডাক মাস্থল লাগিবেনা। প্রথম খণ্ড আগামী বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হইবে।

গ্রাহকগণ আপন আপন নাম ধাম সহ নিম্ন লিখিত ঠিকানায় নব্যভারতের সম্পাদকের নিকট মূল্যের টাকা প্রেরণ করিবেন। পুস্তক প্রকাশ না হইলে টাকা ফেরত দিব।

২১০।৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।
মাঘ ১২৯২

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত বিএ, বিএল,
মুন্সেফ।

পথে কিল্লার সম্মুখেই পার হইতে হয়। আপনি রাষ্ট করিবেন যে, আপনি মহম্মদপুর আক্রমণ করিতে দক্ষিণ পথে সেনা লইয়া যাইবেন। মেনাহাতী তাহা বিশ্বাস করিবে, কেন না কিল্লার সম্মুখে নদীপার কঠিন বা অসম্ভব। অতএব সেও সৈন্য লইয়া দক্ষিণ পথে আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইবে। আপনি সেই সময়ে উত্তর পথে সৈন্য লইয়া কিল্লার সম্মুখে নদী পার হইবেন। তখন দুর্গে সৈন্য থাকিবে না, বা অল্পই থাকিবে। অতএব আপনি অনায়াসে নদী পার হইয়া খোলা পথে দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিবেন।

ফৌজদার। কিন্তু যদি মেনাহাতী দক্ষিণ পথে যাইতে যাইতে শুনিতে পায়. যে আমরা উত্তর পথে সৈন্য লইয়া যাইতেছি, তবে সে পথ হইতে ফিরিতে পারে।

গঙ্গারাম। আপনি অর্দ্ধেক সৈন্য দক্ষিণ পথে, অর্দ্ধেক সৈন্য উত্তর পথে পাঠাইবেন। উত্তর পথে যে সৈন্য পাঠাইবেন, পূর্ব্বে যেন কেহ তাহা না জানিতে পারে। ঐ সৈন্য রাত্রে রওয়ানা করিয়া নদীতীর হইতে কিছু দূরে বনজঙ্গল মধ্যে লুকাইয়া রাখিলে ভাল হয়। তার পর মেনাহাতী ফৌজ লইয়া বাহির হইয়া কিছু দূর গেলে পর নদী পার হইলেই নির্বিঘ্ন হইবেন। মেনাহাতীর সৈন্যও উত্তর দক্ষিণ দুই পথের সৈন্যের মাঝখানে পড়িয়া নষ্ট হইবে।

ফৌজদার পরামর্শ শুনিয়া সন্তুষ্ট ও সম্মত হইলেন। বলিলেন "উত্তম। তুমি আমাদিগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বটে। কোন পুরস্কারের লোভেতেই এরূপ করিতেছ সন্দেহ নাই। কি পুরস্কার তোমার বাঞ্ছিত ?

গঙ্গা। নলদী পরগণা আমাকে দিবেন।

ফৌজদার। মহম্মদপুর আর হিন্দুর হাতে রাখিব না। কিন্তু তুমি যদি চাও, তবে তোমাকে এখানে শিপাহশালার করিতে পারি। আর টাকা ও গ্রাম দিতে পারি।

গঙ্গারাম। তাহাই যথেষ্ট। কিন্তু আর এক ভিক্ষা আছে। সীতারামের দুই মহিষী আছে।

ফৌজ। তাহারা নবাবের জন্য। তাহাদের পাইবে না।

গঙ্গা। জ্যেষ্ঠাকে মুরশিদাবাদে পাঠাইবেন। কনিষ্ঠাকে নফরকে বখশিষ করিবেন।

ফৌজদার তামাসা করিয়া বলিলেন—তুমি সীতারামের স্ত্রী নিয়া কি করিবে? সীতারাম যেন মরিল, কিন্তু তবু ত হিন্দুর মাঝে বিধবার বিবাহ নাই। যদি মুসলমান হইতে, তবে বুঝিতাম যে তুমি রাণীকে নেকা করিতে পারিতে।

গঙ্গারাম ভাবিল, এ পরামর্শ মন্দ নহে। যদি নিজে মুসলমান হইয়া, রমাকে ফৌজদারের সাহায্যে মুসলমান করিয়া নেকা করিতে পারে, তবে সীতারাম জীবিত থাকিলে, আর কোন দাবী দাওয়া করিতে পারিবে না। গঙ্গারাম নির্ব্বিঘ্নে রমাকে ভোগ দখল করিতে পারিবে। অতএব ফৌজদারকে বলিল,

"মুসলমান ধর্ম্মই সত্য ধর্ম্ম, এইরূপ আমি ক্রমে বুঝিতেছি। মুসলমান হইব, এখন আমি স্থির করিয়াছি। কিন্তু রমাকে না পাইলে মুসলমান হইব না।"

ফৌজদার হাসিয়া বলিলেন, "রমা কে? সীতারামের কনিষ্ঠা ভার্য্যা? সে নহিলে, যদি তোমার পরকালের গতি না হয়, তবে অবশ্য তুমি যাহাতে তাহাকে পাও, তাহা আমি করিব। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। কিন্তু আর একটা কথা, সীতারামের অনেক ধনদৌলত পোতা আছে না?"

গঙ্গা। শুনিয়াছি, আছে।

তোরাব খাঁ। তাহা তুমি দেখাইয়া দিবে?

গঙ্গা। কোথায় আছে তাহা আমি জানি না।

তোরাব খাঁ। সন্ধান করিতে পারিবে?

গঙ্গা। এখন করিতে গেলে লোকে আমায় অবিশ্বাস করিবে।

তোরাব খাঁ আর কিছুই বলিলেন না।

তখন সন্তুষ্ট হইয়া গঙ্গারাম বিদায় হইল। এবং সেই রাত্রেই মহম্মদপুর ফিরিয়া আসিল।

গঙ্গারাম জানিত না, যে চাঁদশাহ ফকির তাহার অনুবর্ত্তী হইয়াছিল। চাঁদশাহ ফকির পরদিন নিভৃতে চন্দ্রচূড়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, "আহ্লাদের সম্বাদ আপনাকে দিতে আসিয়াছি। ইস্‌লামের জয় হইবে।"

চন্দ্রচূড় জানিতেন, চাঁদশাহের কাছে হিন্দু মুসলমান এক—সে কোন

পক্ষে নহে—ধর্ম্মের পক্ষ এবং সীতারামের পক্ষ। অতএব এ কথার কিছু মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন,

"ব্যাপার কি ?"

চাঁদশাহ। হিন্দুরাও ইসলামের পক্ষ।

চন্দ্রচূড়। কোন কোন হিন্দু বটে।

চাঁদ। আপনারাও।

চন্দ্র। সে কি ?

চাঁদ। মনে করুন, নগরপাল গঙ্গারাম রায়।

চন্দ্র। গঙ্গারাম খাটি হিন্দু—রাজার বড় বিশ্বাসী।

চাঁদ। তাই কাল রাত্রে ভূষণায় গিয়া তোরাব খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছে।

চন্দ্র। অাঁ ? না, মিছে কথা।

চাঁদ। আমি সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসিয়াছি।

এই বলিয়া চাঁদশাহ সেখান হইতে চলিয়া গেল। চন্দ্রচূড় স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন—তাঁহার তেজস্বিনী বুদ্ধি যেন হঠাৎ নিবিয়া গেল।

সংসার।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রনাথ বাবু।

পীড়া আরোগ্য হইলেও স্থধা কয়েকদিন শয্যা হইতে উঠিতে পারিল না। শয্যা হইতে উঠিয়া কয়েক দিন ঘর হইতে বাহির হইতে পারিল না।

তাহার পর অল্প অল্প করিয়া ঘরে বারাণ্ডায় বেড়াইত, অথবা শরতের সাহায্যে ছাদে গিয়া একটু বসিত। পক্ষীর ন্যায় সেই লঘু ক্ষীণ শরীরটী শরৎ অনায়াসে আপনার দুই হস্তে উঠাইয়া ছাদে লইয়া যাইতেন, আবার ছাদ হইতে নামাইয়া আনিতেন।

এক্ষণে শরৎ পুনরায় কলেজে যাইতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু প্রতিদিন বৈকালে হেমের বাটীতে আসিতেন, সুধাকে অনেক কথা, অনেক গল্প বলিয়া প্রফুল্ল রাখিতেন, রাত্রি নয়টার সময় সুধা শয়ন করিলে বাটী আসিতেন। সুধাও প্রতিদিন শরৎকে প্রতীক্ষা করিত, শরতের আগমনের পদধ্বনি প্রথমে সুধার কর্ণে উঠিত, শরৎ সিঁড়ি হইতে উঠিতে না উঠিতে প্রথমেই সেই ক্ষীণ কিন্তু শান্ত, কমনীয়, হাস্যরঞ্জিত মুখ খানি দেখিয়া হৃদয় তৃপ্ত করিতেন।

ছাদে গিয়া শরৎ অনেকক্ষণ অবধি সুধাকে অনেক গল্প শুনাইতেন। তালপুখুর গ্রামের গল্প, বাল্যকালের গল্প, সুধার দরিদ্রা মাতার গল্প, শরতের মাতার গল্প, শরতের ভগিনীর গল্প, অনেক বিষয়ের অনেক গল্প করিতেন। সুধাও একাগ্রচিত্তে সেই মধুর কথাগুলি শুনিত, শরতের প্রসন্ন মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। রোগে বা শোকে যখন আমাদিগের শরীর দুর্ব্বল হয়, অন্তঃকরণ ক্ষীণ হয়, তখনই আমরা প্রকৃত বন্ধুর দয়া ও স্নেহের সম্পূর্ণ মহিমা অনুভব করিতে পারি। অন্য সময়ে গর্ব্ব করিয়া যে পরামর্শ শুনি না, সে সময়ে সেই পরামর্শ হৃদয়ে স্থান পায়, অন্য সময়ে যে স্নেহ আমরা তুচ্ছ করি, সে সময়ে সেই স্নেহে আমাদিগের হৃদয় সিক্ত হয়, কেন না হৃদয় তখন দুর্ব্বল, স্নেহের বারি প্রত্যাশা করে। লতা যেরূপ সবল বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া ধীরে ধীরে বৃদ্ধি ও স্ফূর্ত্তিলাভ করে, সুধা শরতের অমৃত বচনে সেইরূপ শান্তিলাভ করিল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সুধা সেই অমৃতমাখা কথাগুলি শ্রবণ করিত, সেই স্নেহময় মধুর প্রসন্ন মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত, অথবা ক্লান্ত হইয়া সেই মধুর হৃদয়ে মস্তক স্থাপন করিত। যত্নের সহিত শরতেরও স্নেহ বাড়িতে লাগিল, তিনি বালিকার ক্ষীণ বাহুলতা স্বহস্তে ধারণ করিয়া বালিকার মস্তক আপন বক্ষে স্থাপন করিয়া শান্তিলাভ করিতেন।

এক দিন উভয়ে এইরূপে ছাদে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে হেমচন্দ্র ছাদে আসিলেন ও শরৎকে বলিলেন,

"শরৎ, আজ চন্দ্রনাথ বাবু আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, যাবে না?"

শরৎ। "হাঁ; সে কথা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমার কোথাও যাইতে রুচি নাই. না গেলে হয় না"?

হেম। না, সুধার পীড়ার সময় চন্দ্র বাবু ও নবীন বাবু আমাদের অনেক যত্ন ও সাহায্য করিয়াছেন, নবীন বাবু ঘরের ছেলের মত আমাদের বাড়ীতে থাকিতেন, তাঁহাদের বাড়ী না গেলেই নয়। আইস এইক্ষণই যাইতে হইবে।

শরৎ ও সুধা উঠিলেন। হেম সুধাকে ধরিয়া আস্তে আস্তে সিঁড়ি নামাইলেন, তাহাকে ঘরে শয়ন করাইয়া উভয়ে বাটী হইতে বাহির হইলেন। পথে হেম বলিলেন,

"শরৎ, এই পীড়ায় তুমি আমাদের জন্য যাহা করিয়াছ, সে ঋণ জীবনে আমি পরিশোধ করিতে পারিব না। কিন্তু এই কারণে তোমার পড়াশুনার অতিশয় ক্ষতি হইয়াছে। প্রায় মাসাবধি কলেজে যাও নাই, এক্ষণও তোমার ভাল পড়া হইতেছে না। একটু মন দিয়া পড়, তোমার পরীক্ষার বড় বিলম্ব নাই।"

শরৎ ক্ষণেক চুপ করিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন "হাঁ আর অল্পই সময় আছে, এখন একটু মন দিয়া লেখাপড়া আবশ্যক। সুধা এখন ভাল হইয়াছে, কিন্তু বিন্দুদিদিকে বলিবেন যখন অবকাশ হইবে, ছাদে লইয়া গিয়া প্রত্যহ গল্প করিয়া সুধার মনটী প্রফুল্ল রাখেন। নবীন বাবু বলিয়াছেন, সুধার মনপ্রফুল্ল থাকিলে শীঘ্র শরীরও পুষ্ট হইবে।" এইরূপ কথা কহিতে কহিতে উভয়ে চন্দ্রনাথ বাবুর বাসায় পঁহুছিলেন।

নবীন বাবুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা চন্দ্রনাথ বাবু ভবানীপুরের মধ্যে একজন সুযোগ্য সম্ভ্রান্ত কায়স্থ। তাঁহার বয়স ত্রিংশৎ বৎসরের বড় অধিক হয় নাই; তিনি কৃতবিদ্য, সৎকার্য্যে উৎসাহী, এবং এই বয়সেই একজন হাইকোর্টের গণ্য উকিল হইয়াছিলেন। তিনি সবর্বন মিউনিসিপালিটীর একজন মাননীয় সভ্য ছিলেন এবং সবর্বের উন্নতির জন্য যথেষ্ট যত্ন করিতেন।

তাঁহার বাড়ী বৃহৎ নহে কিন্তু পরিষ্কার এবং সুন্দররূপে নির্ম্মিত

ও রঞ্জিত। বাহিরে দুইটী একতালা বৈটকখানা ছিল, বড়টীতে চন্দ্রবাবু বসিতেন, ছোটটী নবীন বাবুর ঘর। বাড়ীর ভিতর দ্বিতল। চন্দ্রবাবুর বৈটকখানায় টেবিল, চৌকি, পুস্তক পরিপূর্ণ দুইটী বুকশেল্ফ, কয়েকখানি সুরুচি সম্মত ছবি। মেজে "মেটিং" করা এবং সমস্ত ঘর পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। দেখিলেই বোধ হয় কোন কৃতবিদ্য কার্য্যদক্ষ কার্য্যপ্রিয় যুবকের কার্য্যস্থান, পরিষ্কার ও সুশৃঙ্খল।

টেবিলের উপর দুইটী শামাদানে বাতী জ্বলিতেছে; চন্দ্রবাবু, নবীন, হেম ও শরৎ অনেকক্ষণ বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। চন্দ্রবাবু স্বভাবতঃ গম্ভীর ও অল্পভাষী, কিন্তু অতিশয় ভদ্র, সুধার পীড়ার সময় তিনি যথা সাধ্য হেমের সহায়তা করিয়াছিলেন, এবং সর্ব্বদাই ভদ্রোচিত কথা দ্বারা হেমকে তুষ্ট করিতেন।

অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর হেমচন্দ্র বলিলেন, "কলিকাতায় আসিয়া আপনাদিগের ন্যায় কৃতবিদ্য লোকদিগের সহিত আলাপ করিয়া বড় প্রীত হইলাম। আমার চিরকালই পল্লিগ্রামে বাস, পল্লিগ্রামে কৃতবিদ্য লোক বড় অল্প, আপনাদিগের কার্য্যে যেরূপ উৎসাহ তাহাও অল্প দেখিতে পাই, আপনাদিগের ন্যায় দেশহিতৈষিতাও অল্প দেখিতে পাই।"

চন্দ্র। "হেমবাবু দেশহিতৈষিতা কেবল মুখে। অথবা হৃদয়েও যদি সেরূপ বাঞ্ছা থাকে তাহাও কার্য্যে পরিণত হয় না। আমরা ক্ষুদ্র লোক, দেশের জন্য কি করিব? সে ক্ষমতা কৈ? তাহার উপযুক্ত স্থান, কালই বা কৈ?"

হেম। "যাহার যে টুকু ক্ষমতা সে সেইটুকু করিলেই অনেক হয়। শুনিয়াছি আপনি সবর্ব্বান কমিটীর সভ্য হইযা অনেক কায কর্ম্ম করিতেছেন, তাহার জন্য অনেক প্রশংসা পাইয়াছেন।"

চন্দ্র। "কায কি? কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা যাহা বলেন তাহাই হয়, আমরাও তাহাই নির্ব্বাহ করি। কলিকাতার অধিবাসিগণ সভ্য নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা পাইয়াছে, লর্ড রিপন ভারতবর্ষের সমস্ত প্রধান নগরীতে সেই ক্ষমতা দিয়া চিরস্মরণীয় হইবেন; আমরাও সেই ক্ষমতা পাইবার চেষ্টা করিতেছি, পাই কি না সন্দেহ।"

হেম। আমার বিশ্বাস, এ ক্ষমতা আমরা অবশ্যই পাইব, এবং পাইলে আমাদের বিস্তর লাভ।

চন্দ্রনাথ। পাইলে আমাদের যথেষ্ট লাভ তাহার সন্দেহ কি? আমরা দেশশাসন কার্য্য বহু শতাব্দী হইতে ভুলিয়া গিয়াছি, গ্রামশাসন প্রথাও ভুলিয়াছি, এক্ষণে দলাদলি করা ও পরস্পরকে গালি দেওয়া ভিন্ন আমাদের জাতীয়ত্বের নিদর্শন নাই! ক্রমে আমরা উন্নত শিক্ষা পাইব, ক্রমে ক্ষমতা পাইব, আমার এরূপ স্থির বিশ্বাস। নিশার পর প্রভাত যেরূপ অবশ্যম্ভাবী, শিক্ষার পর আমাদিগের ক্ষমতা বিস্তারও সেইরূপ অবশ্যম্ভাবী।

শরৎ। আপনার কথাগুলি শুনিয়া আমি তৃপ্ত হইলাম, আমারও হৃদয়ে এইরূপ আশা উদয় হয়। কিন্তু আমাদিগের এই কঠোর চেষ্টাতে কে একটু সহানুভূতি করে? আমাদিগের উচ্চাভিলাষ অন্যের বিদ্রূপের বিষয়, আমাদিগের চেষ্টার বিফলতা তাঁহাদিগের আনন্দের বিষয়, আমাদিগের জাতীয় চেষ্টা, জাতীয় অভিলাষ, জাতীয় জীবন তাঁহাদিগের উপহাসের অনন্ত ভাণ্ডার। মৃতবৎ জাতি যখন পুনরায় জীবনলাভের জন্য একটু আশা করে, একটু চেষ্টা করে, তখন তাহারা কি অন্যের সহানুভূতি প্রত্যাশা করিতে পারে না?

চন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে বলিলেন, "শরৎ, তোমার বয়সে আমিও ঐরূপ চিন্তা করিতাম, সংবাদ পত্রে একটী বিদ্রূপ দেখিলে ব্যথিত হইতাম। কিন্তু দেখ, সহানুভূতি প্রভৃতি সদ্‌গুণ গুলি ফাঁপা মাল, দেখিতে বড় সুন্দর, তত মূল্যবান্ নহে। যদি সে গুলি দিতে অন্যের বড়ই কষ্ট হয়, তাঁহারা বাক্‌সে বন্ধ করিয়া রাখুন, আমাদের আবশ্যক নাই। যদি উপহাস করিতেই তাঁহাদিগের ভাল লাগে, তাঁহাদিগের উপহাসই আমাদিগের জাতীয় জীবনের বন্ধনীস্বরূপ হউক। শরৎ, আমাদিগের ক্ষমতা নিজের যোগ্যতা ও সত্তার উপর নির্ভর করে, অন্য লোকের হস্তে নহে। আইস, আমরা কার্য্যদক্ষতা শিক্ষা করি, তাহা হইলে সহানুভূতি প্রতীক্ষা না করিয়া, উপহাস গ্রাহ্য না করিয়া দিন দিন অগ্রসর হইব। আমাদিগের উন্নতির পথ অবারিত।"

নবীন। আমারও বিশ্বাস আমরা ক্রমে উন্নতিলাভ করিতেছি, কিন্তু

সে উন্নতি কত আস্তে আস্তে হইতেছে। রাজনীতির কথা ছাড়িয়া দিন, সমাজের কথা ধরুন। আমরা মুখে বা পুস্তকে কত বাদানুবাদ করি, কার্য্যে একটী সামাজিক উন্নতি লাভ করিতে কত বিলম্ব হয়, পঞ্চাশৎ বৎসর আলোচনা ও বাগাড়ম্বরের পর একটী কুরীতি উঠে না, একটী সামাজিক সুরীতি স্থাপন হয় না।

চন্দ্র। নবীন, আমি এটী গুণ বলিয়া মনে করি, দোষ বলিয়া মনে করি না। যে সমাজ শীঘ্র শীঘ্র পূর্ব্ব প্রচলিত রীতি পরিবর্ত্তন করিতে তৎপর হয়, সে সমাজ শীঘ্র বিপ্লবগ্রস্ত হয়। তুমি ফরাসীদের ইতিহাস বেশ জান, একশত বৎসর হইল ফরাসীরা একেবারে সমস্ত কুরীতি ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল ; তাহার ফল, ভয়ঙ্কর রাজবিপ্লব, ধর্ম্মবিপ্লব, সমাজবিপ্লব ! শীঘ্র শীঘ্র সমাজের রীতি পরিবর্ত্তন করায় সমাজের লাভ নাই, বিশেষ ক্ষতি আছে।

নবীন। কিন্তু যে প্রথাগুলি এক্ষণে বিশেষ অনিষ্টজনক হইয়া উঠিয়াছে, সে গুলি কি ত্যাগ করা বিধেয় নহে ?

চন্দ্র। অনেক আলোচনা করিয়া, বুঝিয়া সুঝিয়াই সে গুলির সংস্কার করা কর্ত্তব্য। আলোচনায়ও বিশেষ উপকার হয় বোধ হয় না ; সমাজে জীবন থাকিলে লোকে আপনা আপনিই সুবিধা বুঝিয়া অনিষ্টকর নিয়মগুলি ত্যাগ করে। জীবিত সমাজের এই নিয়ম ;—তাহার ক্রমশঃ সংস্কার আপনা হইতেই সিদ্ধ হয়।

নবীন। আমিও সেই কথা বলিতেছিলাম, আমাদের সমাজেও সংস্কার হইতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের জীবন অতিশয় ক্ষীণ, সেই জন্য গতি অতিশয় অল্প। দেখুন বাণিজ্য সম্বন্ধে আমাদের কত অল্প উন্নতি হইতেছে। এ বিষয়ে উন্নতিতে নূতন আইনের আবশ্যক নাই, রাজার অনুজ্ঞার আবশ্যক নাই, সমাজের রীতি পরিবর্ত্তনের আবশ্যক নাই, একটু চেষ্টা হইলেই হয়। কিন্তু সে চেষ্টা কত বিরল। আপনাদিগের দেশের তুলা লইয়া আপনারা কাপড় নির্ম্মাণ করিতে পারিতেছি না, ইউরোপ হইতে আমাদের পরিধেয় বস্ত্র আসিতেছে তাঁতিদের দিন দিন দুরবস্থা হইতেছে।

হেম। কলে নির্ম্মিত কাপড়ের সহিত, তাঁতিরা হাতে কায করিয়া

কখনও যে পারিয়া উঠিবে এরূপ আমার বোধ হয় না। আমি পল্লিগ্রামে অনেক হাটে গিয়াছি, অনেক গরিব লোকের বাড়ী গিয়াছি। আমার মনে আছে পূর্ব্বে সকল ঘরেই চরকা চলিত, এক্ষণে গ্রামে একখানা চরকা দেখা যায় না। তাহার কারণ, উৎকৃষ্ট বিলাতি সুতা অতি অল্প মূল্যে বিক্রয় হয়। হাটে যে দেশী কাপড় ১৸০ টাকায় বিক্রয় হয় সেইরূপ বিলাতী কাপড় ৸৶০ আনায় বিক্রয় হয়। তাহাতে সাধারণ লোকের বিশেষ উপকার হইয়াছে, তাহারা অল্প মূল্যে ভাল কাপড় পরিতে পারে, কিন্তু তাঁতীরা হাতে কায করিয়া কখনও কলের কাযের সঙ্গে পারিবে তাহা বোধ হয় না।”

নবীন। “আমিও তাহাই বলিতেছি, সুসভ্য জগতে হাতের কায উটিয়া যাইতেছে, এক্ষণে কলে কায করা ভিন্ন উপায় নাই। তবে আমরা বঙ্গদেশ এইরূপ কলে আচ্ছন্ন করি না কেন? আমাদের কি সেটুকু উৎসাহ নাই, সেটুকু বিদ্যাবুদ্ধি নাই?”

চন্দ্র। “নবীন, সে বিদ্যাবুদ্ধির অভাব নহে, সে অর্থের অভাব, বহু অর্থ না হইলে একটী কল চলে না। আর একটী আমাদের শিক্ষার অভাব আছে, আমরা পাঁচজনে মিলিয়া এখনও কায করিতে শিখি নাই, এই শিক্ষাই সভ্যতার প্রধান সহায়। দেখ বিদ্যায় আমাদের দেশে অনেকে উন্নত হইয়াছেন, ধনে অনেকে উন্নত, ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে অনেকে উন্নত, রাজনীতিতে অনেকে উন্নত। বুদ্ধির অভাব নাই, কিন্তু পাঁচজনে মিলিয়া কায করা একটী স্বতন্ত্র শিক্ষা, সেটী আমরা এখনও শিখি নাই। পাঁচজন বিদ্বান একত্রে মিলিয়া একটী মহৎ চেষ্টা করিতেছেন এরূপ দেখা যায় না, পাচজন রাজনীতিজ্ঞ ঐক্য সাধন করিতে পারে না, পাঁচজন ধনী মিলিয়া বাণিজ্য করে এরূপ বিরল। সকলেই স্ব স্ব প্রধান। কিন্তু আমি ভরসা করি অন্য শিক্ষার সঙ্গে এ শিক্ষাও আমরা লাভ করিব, এ শিক্ষা লাভ না করিলে সভ্যতার আশা নাই।”

এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতে ভৃত্য আসিয়া বলিল আহার প্রস্তুত হইয়াছে, তখন সকলেই বাড়ীর ভিতর আহার করিতে গেলেন।

আহারাদি সমাপন হইলে পুনরায় সকলে বাহিরে আসিলেন। আর অনেক কথাবার্ত্তা কহিয়া হেম ও শরৎ বিদায় লইলেন।

শরৎ আপনার বাটীতে প্রবেশ করিলেন, হেম চন্দ্রনাথ বাবুর কথাগুলি অনেকক্ষণ চিন্তা করিতে করিতে অনেক দূর যাইয়া পড়িলেন। পথে সুন্দর চন্দ্রালোক পড়িয়াছে, নিশার বায়ু শীতল ও মনোহর, হেমচন্দ্র বেড়াইতে বেড়াইতে বালীগঞ্জের দিকে গিয়া পড়িলেন।

রাত্রি প্রায় ১১টার সময় তিনি ফিরিয়া আসিতে ছিলেন, পশ্চাৎ হইতে একটী শকটের শব্দ পাইলেন। ফিরিয়া দেখিলেন দুইটী উজ্জ্বল আলোকযুক্ত একটী বড় গাড়ী তীব্র বেগে আসিতেছে, বলবান্ শ্বেতবর্ণ অশ্বদ্বয় যেন পৃথিবী স্পর্শ না করিয়া উড়িয়া আসিতেছে, কেটন ঘর্ঘর শব্দে দরিদ্র হেমের পাশ দিয়া যাইয়া একটী বাগানের ফাটকের ভিতর প্রবেশ করিল। তাহার পর আবার আর একটী জুড়ী আসিল, দুইটী কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব এক বৃহৎ লেণ্ডলেট লইয়া বিদ্যুৎ-বেগে সেই ফাটকে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিবার সময় নারী কণ্ঠ সম্ভূত খল খল হাস্যধ্বনি হেমের শ্রুতি পথে পঁহুছিল।

হেম একটু উৎসুখ হইলেন, এবং সবিশেষ দেখিবার জন্য বাগানের ফাটকের কাছে আসিলেন। দেখিলেন ফাটকে রামসিং ফতেসিং বলবন্তসিং প্রভৃতি শ্মশ্রুধারী দ্বারবান্‌গণ সগর্ব্বে পদচারণ করিতেছে। বাগানের ভিতর অনেক প্রস্তর মূর্ত্তি, দুই একটী সুন্দর জলাশয়। তাহার পর একটী উন্নত অট্টালিকা। অট্টালিকা ইন্দ্রপুরীতুল্য, তাহার প্রতি গবাক্ষ হইতে উজ্জ্বল আলোকরাশি বহির্ভূত হইতেছে, এবং মধ্যে মধ্যে বাদ্যধ্বনি ও নারীকণ্ঠ সম্ভূত গীতধ্বনি গগনপথে উত্থিত হইতেছে।

হেম ধীরে ধীরে একজন দ্বারবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ বাগান কার বাপু?"

দ্বারবান্ দাড়ীতে একবার মোচড় দিয়া গোঁফে একবার তা দিয়া বলিল,

"এ বাগান তুমি জানে না, মুলুক কা সব বড়া বড়া লোক জানে, তুমি জানে না? তুমি কি নয়া আদমী আছে?"

হেম। "হাঁ বাপু, আমি নতুন মানুষ, এদিকে কখনও আসি নাই, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

দ্বার। "সোই হোবে। এখানে সব কোই এ বাগান জানে। কল-

কত্তাকা বেত্তা বড়া বড়া বাঙ্গালি আছে, জমীদার, উকিল, কৌসিলি, সব এ বাগানে আসে, সব কোই এ বাগান জানে।”

হেম। “তা হবে বাপ, আমি গরিব লোক আমি সে সব কথা কেমন কোরে জানব ?”

দ্বার। “হাঁ সো ঠিক, সো ঠিক, তোমারা লায়েক আদমি এ বাগান জানে না। আজ বড়া নাচ হোবে, বহুত বাবু লোক আসেছে, বড়া তামাসা।”

হেম। “তা নাচ দিচ্চে কে ? বাগানটা কার ?”

দ্বার। “ধনপুরকা জমিদার ধনঞ্জয় বাবু।”

হেমের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত পড়িল।

“হা হতভাগিনী উমাতারা! ধনে যদি সুখ থাকিত, মর্ম্মর শোভিত ইন্দ্রপুরীতুল্য প্রাসাদে যদি সুখ থাকিত, সাদা জুড়ি ও কাল জুড়িতে যদি সুখ থাকিত, তবে তুমি আজ হতভাগিনী কেন ?”

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ধনঞ্জয় বাবু।

যে দিন রাত্রিতে হেমবাবু ধনঞ্জয় বাবুর বাগান দেখিয়া আসিলেন সেই দিন অবধি তিনি বড়ই চিন্তিত ও বিষণ্ণ রহিলেন। সহসা সে কথা বিন্দুকে খুলিয়া বলিতে পারিলেন না, পাছে বিন্দু উমাতারার জন্য মনে ব্যথা পান; এবং বিন্দুর নিকট হইতে কথাটী গোপন রাখিতেও তাঁহার বড় কষ্ট বোধ হইল। কি করিবেন ? কি উপায় অবলম্বন করিবেন ? হতভাগিনী উমতারার সংবাদ কি রূপে লইবেন ? উমাতারার কোনও রূপ সহায়তা করা কি তাঁহার সাধ্য ?

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া একবার ধনঞ্জয় বাবুর বাড়ী যাবেন ঠিক করি-

লেন। ধনঞ্জয় বাবু বাল্যকালে যখন তালপুখুরে আসিতেন তখন হেমকে বড় মান্য করিতেন, সম্ভবতঃ এখনও হেমের দুই একটী পরামর্শ গ্রহণ করিতেও পারেন। আর যদি তাহাও না হয়, তথাপি একবার স্বচক্ষে উমাতারার অবস্থা দেখিয়া আসা হবে, তাহার পর যথোচিত উপায় বিধান করা যাইবে।

এইরূপ মনে মনে স্থির করিলেন, কিন্তু ধনঞ্জয় বাবুর সহিত সহসা দেখা হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। কলিকাতা মহানগরীতে ধনঞ্জয় বাবুর বড় মান, অনেক বন্ধু, অনেক কাযের ঝন্‌ঝট্, তাঁহার সহিত হেমের ন্যায় সামান্য লোকের দেখা হওয়া শীঘ্র ঘটিয়া উঠে না। হেমের গাড়ী নাই, তিনি এক দিন সকালে হাঁটিয়া ধনঞ্জয় বাবুর কলিকাতার প্রাসাদতুল্য বাটীতে গেলেন। দ্বারে দ্বারবানগণ একজন সামান্য পথশ্রান্ত বাবুর কথায় বড় গা করে না, কেহ কোনও উত্তর দেয় না, খাটিয়া রূপ সিংহাসন থেকে কেহ শীঘ্র উঠে না। কেহ গা ভাঙ্গিতেছে, কেহ হাই তুলিতেছে, কেহ দাল বাছিতেছে, কেহ বা বাড়ীর দাসীর সহিত দুই একটী মধুর মিষ্টালাপ করিতেছে। অনেকক্ষণ পরে একজন অনুগ্রহ করিয়া হেমের দিকে কৃপা কটাক্ষপাত করিয়া কহিল,

"কেয়া হয় বাবু? তুমি সকাল থেকে বসে আছে, কি চাই কি?"

হেম। "বলি একবার ধনঞ্জয় বাবুর সঙ্গে কি দেখা হতে পারে? অনেক দূর থেকে এসেছি, একবার খবর দাও না, বল তালপুখুর গ্রাম থেকে হেমবাবু দেখা করিতে এসেছেন?"

দ্বার। "গ্রামের লোক ঢের আসে, বাবু সকলের সঙ্গে দেখা করিতে পারে না, বাবুর অনেক কায।"

হেম। "তবু একবার খবর দাও না, বড় প্রয়োজনে আসিয়াছি, একবার দেখা হলে ভাল হয়।"

দ্বার। "প্রয়োজনে সকলে আসে, বাবুর কাছে এখন সকল গ্রামের লোকের প্রয়োজন আছে, সকলেই কিছু আশা করে। তোমার কি গ্রাম শালপুখুর, সে মুলুকে বড় শালবন আছে?"

হেম। "না হে দরওয়ানজী, শালপুখুর নয় তালপুখুর, তোমাদের বাবুর শশুর বাড়ী সেই গ্রামে।"

তখন একটী খাটিয়ায় অর্দ্ধশয়ান দ্বিতীয় এক মহাপুরুষ একবার হাই তুলিয়া অর্দ্ধেক গাত্রোত্থান করিয়া বলিল,

"হাঁ হাঁ আমি জানে, সে তালপুখুর গ্রামে বাবু সাদী করিয়াছেন। তুমি বাবুর শ্বশুর বাড়ীর লোক আছে?"

হেম। "সেই গ্রামের লোক বটে, বাবুর সঙ্গে সম্পর্কও আছে।"

তখন দুই তিনজন বিজ্ঞ শ্মশ্রুধারী অনেক পরামর্শ করিল। একজন কহিল, গ্রামে থেকে অনেক কাঙ্গালী আসে, তাড়াইয়া দাও। আর এক জন কহিল না শ্বশুর বাড়ীর লোক, সহসা তাড়াইয়া দেওয়া হয় না, মা শুনিলে রাগ করিবেন। তৃতীয় একজন নিষ্পত্তি করিল, আচ্ছা একটু বসিতে বল। হেমবাবু আবার অনেক বসিলেন। তিনি একটু চিন্তাশীল সমালোচনাপ্রিয় লোক ছিলেন, বড মানুষের দ্বারবানদিগের সামাজিক আচার ব্যবহার ও সভ্যতা বিশেষরূপে সমালোচনা করিবার অবকাশ পাইলেন, এবং তাহা হইতে পরম প্রীতি ও উপদেশ লাভ করিলেন।

দ্বারবানগণ দেখিল এ কাঙ্গালী যায় না। তখন একজন অগত্যা বহু সুখের আধার খাটিয়া অনেক কষ্টে ত্যাগ করিয়া একবার হাই তুলিয়া, একবার অসুরতুল্য বাহুদ্বয় আকাশের দিকে বিস্তার করিয়া আর একবার শ্মশ্রুকণ্ডূয়ন করিয়া ধীর গম্ভীর পদ বিক্ষেপে বাড়ীর ভিতর গেলেন।

হেম প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রায় একদণ্ড পর দ্বারবান ফিরিয়া আসিয়া সুখবর দিলেন "যাও বাবু এখন দেখা না হোবে।"

হেম "আমার নাম বলিয়াছিলে?"

দ্বারবান "নাম কি বলিবে? এত সকালে কি বাবুর সঙ্গে দেখা হোয়? বাবু এখনও উঠেন নাই, দশটার সময় উঠেন, তাহার পর আসিও।" হেম অগত্যা ফিরিয়া গেলেন।

একদিন দশটার পর গেলেন, তখন বাবু বাড়ী নাই। এক দিন অপরাহ্নে গেলেন, বাবু বাগানে বাহির হইয়াছেন। একদিন সন্ধ্যার সময় গেলেন, সেদিন বাবু কোথা নিমন্ত্রণে গিয়াছেন। চার পাঁচ দিন বৃথা হাঁটাহাঁটি করিয়া একদিন সন্ধ্যার সময় আবার গেলেন, ভাগ্যক্রমে ধনঞ্জয় বাবু বাড়ী আছেন।

দ্বারবান বলিল "কি নাম তোমার? গোবর্দ্ধন না গৌরচন্দ্র?"

হেম। "নাম হেমচন্দ্র, তালপুকুর গ্রাম হইতে আসিয়াছি"।

দ্বারবান উপরে যাইয়া খবর দিল। আসিয়া বলিল "উপরে যান।" হেমচন্দ্র উপরে গেলেন।

ধনপুরের ধনেশ্বর বংশের ধনবান্ উত্তরাধিকারী, গৌরবর্ণ, সুন্দর, যৌবনোপেত ধনঞ্জয় বাবু কয়েকজন পাত্র মিত্রের মধ্যে সেই সুন্দর সভাগৃহে বিরাজ করিতেছেন। তিনি শিষ্টাচার করিয়া আপন শ্যালীপতি ভ্রাতাকে মকমল মণ্ডিত সোফায় বসিতে আজ্ঞা দিলেন। হেমচন্দ্র যাহার পর নাই আপ্যায়িত হইলেন।

হেমবাবু সহসা কোনও কথা উত্থাপন করিতে পারিলেন না, সে সভাগৃহের শোভা দেখিয়া ক্ষণেক বিমোহিত হইয়া রহিলেন। তিনি চৌরঙ্গিতে প্রাসাদ তুল্য বাটী সমূহের বারাণ্ডায় টানাপাখা চলিতেছে, পথ হইতে দেখিয়াছেন; লাট সাহেবের বাড়ীর সিংহদ্বার পর্য্যন্ত দেখিয়াছেন; উঁকি ঝুঁকি মারিয়া দুই একটী ইংরাজি দোকানের অভ্যন্তর একটু একটু দেখিয়াছেন, কিন্তু এমন সুশোভিত সুন্দর সভাগৃহের ভিতর পদবিক্ষেপ করা তাঁহার কপালে এ পর্য্যন্ত ঘটে নাই! সভার মেজে সুন্দর কার্পেট মণ্ডিত, তাহাতে গোলাপ ফুটিয়া রহিয়াছে, লতায় লতায় ফুল ফুটিয়াছে, ডালে ডালে পাখী বসিয়াছে, সে কার্পেটের উপর হেমচন্দ্র ধুলিপূর্ণ তালি-দেওয়া জুতা স্থাপন করিতে একটু সঙ্কুচিত হইলেন। তাহার উপর আবলুশ কাষ্ঠের সোফা, অটোমান্ চৌকি, ইজিচেয়র, সাইডবোর্ড, ওয়াটনট; আবলুশ কাষ্ঠের উপর স্বর্ণের সূক্ষ্ম রেখাগুলি বড় শোভা পাইতেছে। সোফা ও চৌকি হরিৎবর্ণ মকমলে মণ্ডিত, হেমের ছেলে দুটী সেরূপ মকমলের জামা কখন পরিধান করে নাই। মার্বেলের টেবিল, মার্বেলের সাইডবোর্ড, মার্বেলের প্রতিমূর্ত্তিগুলি! উপর হইতে বেলওয়ারীর ঝাড়ের ভিতর গেসের আলোক দীপ্ত রহিয়াছে, সে আলোকে ঘর দিবার ন্যায় আলোকিত হইয়াছে, গবাক্ষ দিয়া সে আলোক বাহির হইয়া সে পাড়া সুদ্ধ আলোকিত করিয়াছে। একদিকে কোনে সেতার প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র রহিয়াছে, সাইডবোর্ডে, দুইটী ডিকেন্টর ও কয়েকটী গেলাস ঝক্ ঝক্ করিতেছে। দেয়ালে

অসংখ্য বড় বড় দর্পনে আলোক প্রতিফলিত হইতেছে, হেমের দরিদ্র চেহারাখানি চারিদিকের দর্পনে অঙ্কিত দেখিয়া সে দরিদ্র আরও লজ্জিত হইলেন। কয়েকখানি সুন্দর বহু মূল্য অয়েল পেণ্টিং; ইন্দ্রপুরী হইতে বিবস্ত্রা মেনকা রম্ভা যেন সেই অয়েল পেণ্টিং হইতে হাস্য করিতেছে!

সভাগৃহের বর্ণনা এক প্রকার হইল, সভ্য দিগের বর্ণনা করি কিরূপে? আজ অধিক লোক নাই তথাপি ধনঞ্জয় বাবুর অতি প্রিয় অতি গুণবান্ কয়েকজন বন্ধু সে সভাকে নবরত্ন সভা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের যথেষ্ট বর্ণনা করা অসম্ভব, দুই একটী কথায় পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

ধনঞ্জয়ের দক্ষিণ হস্তে সুমতি বাবু বসিয়াছিলেন, তিনি রূপবান্ যুবা পুরুষ, বয়স ঠিক জানি না, কিন্তু যৌবনের শোভা সে সুন্দর মুখে, সে কালাপেড়ে কাপড়ে ও ফিন্‌ফিনে একলাইয়ে লক্ষিত হইতেছে। তাঁহার ব্যবসায় জানি না, কিন্তু প্রায় বড় মানুষ দিগের দক্ষিণ হস্তে তাঁহার স্থান। তিনি গীতে অদ্বিতীয়, হাস্য রহস্যে অদ্বিতীয়, ধনী দিগের মনোরঞ্জনে অদ্বিতীয়, প্রবাদ আছে যে বিষয় বুদ্ধিতে ও অদ্বিতীয়.! মধু মক্ষিকার ন্যায় মধু আহরণ করিতে জানিতেন, অনেক মধুচক্র হইতে মধু আহরণে তাঁহার ধনাগার পূর্ণ হইয়াছিল, সুন্দর গাড়ীও জুড়িতে ছাপিয়া পড়িতেছিল। প্রবাদ আছে যে বণ্ড. হেণ্ডনোট প্রভৃতি গূঢ় মন্ত্রে তিনি বিশেষরূপে দীক্ষিত, নাবালক বা তরুণ ধনী দিগের প্রতি সেই সুন্দর মন্ত্র চালনায় তিনি অদ্বিতীয়। কিন্তু এ সকল জনপ্রবাদ গ্রাহ্য নহে, সুমতি বাবুর মিষ্ট হাস্য ও আলাপ-ক্ষমতা সন্দেহ বিবর্জিত।

সুমতি বাবুর পার্শ্বে যদুনাথ বসিয়াছিলেন,—গুণ বল, লেখাপড়া বল, কার্য্যদক্ষতা বল, হাস্যরহস্য ক্ষমতা বল,—যদুনাথের ন্যায় কলিকাতায় কে আছে? ব্যবসা ওকালতি, মুখে ইংরাজী বুলি যেন খই ফোটে, ইংরাজী চাল চোল, ইংরাজী খানায়, ইংরাজী ধরণে তাঁহার ন্যায় কে উপযুক্ত? সেম্পেন বা সোটরণ্ বা সাদ্‌লীস্ সম্বন্ধে তাঁহার ন্যায় কে বিচারক? আবার বক্তৃতা ক্ষমতাও তাঁহার অসাধারণ,—"ন্যাশনালিটী" রক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার তীব্র হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা শুনিয়া কলিকাতার কোন্ শিক্ষিত লোকের মন না দ্রবীভূত হইয়াছে? যদুনাথ বাবুর সমকক্ষ হওয়া বালকদিগের

উচ্চাভিলাষ, যদুনাথ বাবুর সহিত বন্ধুতা করা বিষয়ীদিগের উদ্দেশ্য, যদুনাথ বাবুর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা কন্যাকর্ত্তাদিগের সুখস্বপ্ন।

তাঁহার পশ্চাতে চাপকান পরিয়া সুবর্ণের চেন ঝুলাইয়া হরিশঙ্কর বাবু একটু একটু হাসিতেছেন। তিনি সেকেলে লোক, ইংরাজী বড় জানেন না, কিন্তু বাহাদুরি কেমন? কোন ইংরাজীওয়ালা তাঁহার ন্যায় চাকুরি পাইয়াছে? তিনি মাথায় সাদা ফেট্টা বাঁধিয়া আপিসে যান, পুরাণ ধাঁচে ইংরাজি কহেন, বড় বড় সাহেবের বড় প্রিয়পাত্র। প্রাচীন হিন্দুসমাজের এই স্তম্ভস্বরূপ হরিশঙ্কর বাবুকে সাহেবরা বড় স্নেহ করেন, হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে হরিশঙ্কর বাবুকে মূর্ত্তিমান্ বেদ মনে করেন, হিঁদুয়ানি ও সাবেক রকম রীতি নীতি বজায় রাখিবার একটী প্রধান কারণ মনে করেন, নব্য উদ্ধত যুবকদিগকে হরিশঙ্কর বাবুর উদাহরণ দেখান। হরিশঙ্কর বাবু লোকটী বিচক্ষণ, দেখিলেন এই চালে চলিলেই লাভ, সুতরাং সেই চালই আরও অনুবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার সুফল শীঘ্র ফলিল, ধর্ম্মপতি রাজপুরুষেরা এই প্রাচীন ধর্ম্মাবলম্বীকে অনেক শিক্ষিত কর্ম্মচারীর উপরে একটী বড় চাকুরি দিলেন। সাবেক রীতিনীতির স্তম্ভ মনে মনে একটু হাসিলেন, সন্ধ্যার সময় ইয়ারদিগের নিকট এই কথা গল্প করিয়া, আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির যথোচিত প্রশংসা লাভ করিলেন। সেই রাত্রি সুধার উৎস বহিল।

হরিশঙ্কর বাবুর এক পার্শ্বে পাশ্চাত্য সভ্যতার অবতার "মিষ্টর" কর্ম্মকার বসিয়াছেন, তাঁহার কোট পেণ্টলুন অনিন্দনীয়, চখের চসমা অনিন্দনীয়, কলার নেকটাই অনিন্দনীয়, হস্তে শেরির গেলাস অনিন্দনীয়। তাঁহার ইংরাজি বুলি বিস্ময়কর, ইংরাজী ধরণ বিস্ময়কর, ইংরাজী মেজাজ বিস্ময়কর। ইউরোপ হইতে পাশ্চাত্য সভ্যতার চরম ফল আহরণ করিয়া তিনি ধনঞ্জয় বাবুর সভা শোভিত করিতেছেন। সুমতি বাবু কখন কখন তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাঁহার অনিন্দনীয় পরিচ্ছেদ দেখিয়া ইয়ারদিগের নিকট বলিতেন, "এখন পাশ্চাত্য সভ্যতার অর্থ বুঝিলাম, মিষ্টর্ কর্ম্মকারের মুখের কান্তি অপেক্ষা পশ্চাতের শোভাটাই কিছু অধিক।"

হরিশঙ্কর বাবুর অপর পার্শ্বে বিশ্বম্ভর বাবু বসিয়াছেন, তিনি তাঁহার পাড়ার মধ্যে বড় মানুষ, দলের মধ্যে দলপতি,—বড় হাউসের বড় বেনিয়ান!

তাঁহার অর্থের ন্যায় কাহার অর্থ, তাঁহার নূতন বাড়ীর ন্যায় কাহার বাড়ী তাঁহার গাড়ী ঘোড়ার ন্যায় কাহার গাড়ী ঘোড়া? তাঁহার পার্শ্বে সিদ্ধেশ্বর বাবু গিদ্ধেশ্বর বাবু প্রভৃতি বনিয়াদী বড়মানুষগণ বসিয়া গিয়াছেন,— তাঁহাদের গৌরব বর্ণনীয় আমরা অক্ষম।

ধনস্বরূপ পদ্মবনের চারিদিকে মধুমক্ষিকাগণ গুণ গুণ করিতেছে; ধনস্বরূপ ময়ূরসিংহাসনে রত্নরাজি ঝক্ ঝক্ করিতেছে! হেমবাবু কয়েক মাস কলিকাতায় বাস করিয়া দেখিলেন, কেবল ধনঞ্জয় বাবুর বাড়ী নহে, চারিদিকেই সমাজ এ রত্নরাজিতে মণ্ডিত রহিয়াছে! এ মহা নগরী এই রত্নপ্রভায় ঝলসিত হইতেছে!

এ সভায় হেমচন্দ্র কি বলিবেন? হংস মধ্যে বকো যথা হইয়া তিনি ক্ষণেক সেইখানে সঙ্কুচিত হইয়া উপবেশন করিয়া রহিলেন। একবার কষ্ট করিয়া ধনঞ্জয় বাবুর বাগানের কথা উত্থাপন করিলেন, তখনই সভাসদ্ সহস্রমুখে সেই বাগানের সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন, ধনঞ্জয় বাবু হেমবাবুকে একদিন বাগানে লইয়া যাইবেন বলিয়া অনুগৃহীত করিলেন; হেম অপ্রতিভ হইয়া রহিলেন। একবার তালপুখুরের কথা উচ্চারণ করিলেন, ধনঞ্জয় বর্দ্ধমানের নাজীরের কথা উত্থাপনে একটু মুখ হেঁট করিলেন,—সে কথায় কেহ বড় গা করিলেন না। সভাসদ্গণ একটু অধীর হইতে লাগিলেন, কেহ সেতার লইয়া কান মোচড়াইতে আরম্ভ করিলেন, কেহ সাইডবোর্ডে ডিকেণ্টরের দিকে চাহিলেন, কেহ ঘড়ীর দিকে চাহিলেন। হেমচন্দ্র ভাব গতিক বুঝিয়া বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন।

বাড়ী-ভিতর একবার যাবেন কি? ধনঞ্জয় ত তাঁহাকে একবার বাড়ী-ভিতর যাইবার কথা বলিলেন না। তথাপি হতভাগিনী উমাতারাকে না দেখিয়া কি চলিয়া যাবেন?

প্রাঙ্গনে আসিয়া হেমচন্দ্র একটু ইতস্ততঃ করিলেন। এমন সময়ে বাহিরে ঘর্ঘর শব্দে আর দুই একখানি গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল! গাড়ী হইতে হাস্যরবে বাটী ধ্বনিত করিয়া কাহারা বাবুর বৈটকখানায় গেল। সভা জমিল, সেতারের বাদ্য শ্রুত হইল আবার মধুর হাস্যধ্বনি শ্রুত হইল,— অচিরে কলকণ্ঠজাত গীতধ্বনি গগনমার্গে উত্থিত হইতে লাগিল।

হেম এক পা দু পা করিয়া একটী প্রাচীর পার হইয়া বাড়ী-ভিতরের প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়াছেন! তথায় শব্দ নাই, আলোক নাই, মনুষ্য চিহ্ন নাই, মনুষ্য রব নাই। অন্ধকারে ক্ষনেক প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার হৃদয় সজোরে আঘাত করিতে লাগিল। কাহাকেও ডাকিবেন কি?

একটী উন্নত প্রকোষ্ঠের গবাক্ষের ভিতর দিয়া একটী দীপ দেখা যাই-তেছে, হেম অনেকক্ষণ সেই দীপের দিকে চাহিয়া রহিলেন, সাড়া দিবার সাহস হইয়া উঠিল না।

ক্ষণেক পর একটী ক্ষীণ বাহু সেই গবাক্ষ লক্ষিত হইল। ধীরে ধীরে সেই গবাক্ষ বন্ধ হইল, আলোক আর দৃষ্ট হইল না, সমস্ত অন্ধকার। হৃদয়ে দুই হস্ত স্থাপন করিয়া হেমচন্দ্র নিঃশব্দে সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

হতভাগিনী।

হেমচন্দ্র বাটি আসিয়া মনে মনে ভাবিলেন, "আমি নির্ব্বোধের ন্যায় কায করিয়াছি, নারীর যাতনার সময় নারীই শান্ত্বনা দিতে পারে। আমি সমস্ত কথা স্ত্রীর নিকট কহিব, তিনি যাহা পারেন করুন।"

গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র বিন্দু দেখিলেন হেমচন্দ্রের মুখমণ্ডল অতিশয় গম্ভীর অতিশয় ম্লান। ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন

"আজ কি হয়েছে গা? তোমার মুখখানি অমন হয়ে গিয়েছে কেন?"

হেম। "বলিতেছি, বস। সুধা শুইয়াছে?"

বিন্দু। "সুধা খাওয়া দাওয়া করিয়া শুয়েছে। কোনও মন্দ খবর পাও নাই?"

হেম। "শুন, বলিতেছি।" এই বলিয়া উভয়ে উপবেশন করিলে, হেমচন্দ্র আদ্যপান্ত যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন ও শুনিয়াছিলেন, বিন্দুর নিকট বলিলেন।

আঁচল দিয়া অশ্রুবিন্দু মোচন করিয়া বলিল, "এটী হবে তাহা আমি জানিতাম, অভাগিনী উমা তাহা জানিত।"

হেম "কেমন করিয়া?"

বিন্দু। "তা জানি না, বোধ হয় কলিকাতা হইতে পূর্ব্বেই কিছু কিছু সংবাদ পাইয়াছিল, সে চাপা মেয়ে, কোনও কথা শীঘ্র বলে না, কিন্তু তালপুখুর থেকে আসিবার সময় সে অভাগিনীর কান্না কাঁদিয়াছিল।"

হেম। "এখন উপায়? যেরূপ শুনিতেছি তাহাতে ধনেশ্বরের কুলের ধন দুই বৎসরে লোপ হইবে, ধনঞ্জয় রোগগ্রস্থ হইবে, উমা দুই বৎসরে পথের কাঙ্গালিনী হইবে।"

বিন্দু। "সে ত দুই বৎসরের পরের কথা, এখন উমা কেমন আছে? সে সভাবতঃ অভিমানিনী, স্বামীর আচরণ কেমন করিয়া সহ্য করিতেছে? তালপুকুর হইতে আসিয়া সেই বড় বাড়ীতে ছেলে মানুষ একা কেমন করিয়া আছে? তার ছেলে পুলে নেই, বন্ধু বান্ধব যে কেউ নেই, যার কাছে মনের কথা বলে। তুমি কেন একবার গিয়ে দুটো কথা কহিয়া আসিলে না?"

হেম। "আমার ভরসা হইল না।—তুমি একবার যাও,—তোমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা কর, তার পর ভগবান আছেন।"

তাহার পর দিন খাওয়া দাওয়ার পর, ছেলে দুটীকে সুধার কাছে রাখিয়া বিন্দু একটী পালকি করিয়া উমাকে দেখিতে গেলেন। সুধা ও উমাদিদির সঙ্গে দেখা করিতে যাইবে বলিয়া উৎসুক হইল, কিন্তু বিন্দু বলিলেন "আজ নয় বন, আর একদিন যদি পারি তোমাকে লইয়া যাইব।"

প্রশস্ত শয়ন কক্ষে গিয়া বিন্দু দেখিলেন উমা একা বসিয়া একটী চুলের দড়ি বিনাইতেছে, দাস দাসী সকলে নীচে আছে। উমাকে দেখিয়া বিন্দু শিহরিয়া উঠিলেন। এই কি সেই তালপুকুরের উমা যাহার সৌন্দর্য্য কথা দিক্ বিদিক্ প্রচার হইয়াছিল? মুখের রং কালো হইয়া গিয়াছে, চক্ষে কালী পড়িয়াছে, কণ্ঠা দুটা বেরিয়ে পড়েছে, বাহু অতিশয় শীর্ণ, শরীর খানি দড়ীর মত হয়ে গিয়াছে। চারিমাস

পূর্ব্বে বিন্দু যাহাকে প্রথম যৌবনের লাবণ্যে বিভূষিতা দেখিয়াছিলেন, আজ তাহাকে ত্রিংশৎ বৎসরের রোগক্লিষ্টা নারীর ন্যায় বোধ হইতেছে। কণ্ঠার হাড়ের উপর দিয়া তারা হার লম্বমান রহিয়াছে, বহু মূল্য বালা দুগাছী সে শীর্ণ হস্তে ঢল ঢল করিতেছে।

উমা পদশব্দ শুনিয়া সেই ম্লান চক্ষুর সহিত পেছনে ফিরিয়া দেখিলেন। বিন্দুকে দেখিয়াই চুলের দড়ী রাখিয়া উঠিলেন। ম্লান বদনে ধীরে ধীরে কহিলেন "আঃ বিন্দু দিদি, তুমি এসেছ, আমি কত দিন তোমার কথা মনে করেছি। তুমি ভাল আছ? ছেলেরা ভাল আছে?"

সে ধীর কথাগুলি শুনিয়াই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বিন্দু উমার হৃদয়ের অবস্থা ও তাঁহার চারি মাসের ইতিহাস অনুভব করিলেন। যত্নে হৃদয়ের উদ্বেগ সঙ্গোপন করিয়া উমার হাত দুটী ধরিয়া ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন,

"হেঁ বন্, আমরা সকলে ভাল আছি, সুধার বড জ্বর হয়েছিল, তা সে ও ভাল হয়েছে। তুমি কেমন আছ উমা? তোমাকে একটু কাহিল দেখচি কেন বন?"

উমা। "ও কিছু নয় বিন্দুদিদি,—আমার ও কলিকাতায় আসিয়া আমাসা হয়েছিল তা ভাল হয়েছে, এখন একটু কাশি আছে, বোধ হয় কলকেতার জল আমাদের সয় না, আমরা তালপুখুরেই ভাল থাকি।" সেই নীরস ওষ্ঠে একটু ক্ষীণ হাস্য লক্ষিত হইল।

বিন্দু। "তালপুখুরে আবার যেতে ইচ্ছা করে? আমরা এই পূজার পর যাব, তুমি যাবে কি?"

উমা। "তা সে ত আমার ইচ্ছে নয় বিন্দুদিদি, বাবু কি তাতে মত করবেন? বোধ হয় না"।

বিন্দু। "তবে তোমাকে এখানে দেখবে শুনবে কে? আমরা রইনুম অনেক দূরে, আর ছেলেদের ফেলেও ত সর্ব্বদা আসিতে পারিনি। তোমার ও কাশী করেছে, রোগা হয়ে গিয়েছ, তোমাকে দেখে কে?"

উমা। "কেন বিন্দুদিদি, রোজ ডাক্তর আসে, বাবু একজন ভাল ডাক্তর রাখিয়া দিয়েছেন সে ওষুধ দিচ্চে, আমি এখন ওষুধ খাই।"

বিন্দু। "তা যেন হোল, কিন্তু তবু আপনার লোক না হলে কি কেউ

দেখতে শুনতে পারে? আর তোমার অসুখ হলে সংসারই দেখে কে? তা জেঠাই মাকে কেন লেখ না, তিনি এসে কয়েক দিন থাকুন। আবার তুমি একটু সারলে তিনি চলে যাবেন, তুমিও না হয় দিনকতক গিয়ে তালপুখুরে থাকবে।”

উমা। “না মাকে আর কেন আনান, আমার ব্যারামের বেশ চিকিৎসা হইতেছে, আর সংসারে অনেক চাকর দাসী আছে, কিছু অসুবিধা হচ্চে না ত, মাকে কেন ডাকান?”

বিন্দু। “না তবু বোধ হয় তেমন যত্ন হয় না, মায়ে যেমন যত্ন করে, তেমন কি আর কেউ পারে, হাজার হোক মার প্রাণ। তা ধনঞ্জয় বাবু তোমাকে যত্নটত্ন করেন ত?”

অতি ক্ষীণস্বরে উমা উত্তর করিলেন, “হাঁ তা আমার যখন যা আবশ্যক, তখনই পাই,—কিছুর অভাব নেই। যত্ন করেন বৈ কি।”

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বিন্দু দেখিলেন, অভিমানিনী উমা আপনার প্রকৃত যাতনার কথা কহিতে চাহে না;—উমার ইহ জগতে সুখ ও সুখের আশা ভস্মসাৎ হইয়াছে। বিন্দুই বা সে কথা কিরূপে জিজ্ঞাসা করেন? ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন,

“না উমা, আমার বোধ হয় জেঠাইমা এখানে আসিয়া কয়েক দিন থাকিলে ভাল হয়। দেখ আমাদের সুখ দুঃখ, ব্যারাম সেযাম সকলেরই আছে, ব্যারামের সময় আপনার লোক যতটা করে, পরে কি ততটা করে? এই সুধার ব্যারাম হল, বাবু ছিলেন, শরৎ ছিল, কত যত্ন কত সুশ্রূষা করিল, তবে আরাম হল। তুমিও বন বড় কাহিল হয়ে গিয়েছ, সর্ব্বদা কাশ্‌ছ, এখন থেকে একটু যত্ন নেওয়া ভাল। তা আমার কথা রাখ বন্, জেঠাই মাকে আজই চিঠি লেখ, না হয় আমায় বল০ আমিই লিখচি। আহা উমা তুমি কি ছিলে বন আর কি হয়ে গিয়েছ।” এই বলিয়া বিন্দু সস্নেহে উমার কপালে হাত বুলাইয়া কপাল থেকে চুলগুলি সরাইয়া দিলেন।

এই টুকু স্নেহ উমা অনেক দিন পান নাই,—এই টুকুতে তাঁহার হৃদয় উথলিল, চক্ষু দুটী ছল্ ছল্ করিল, একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উমা ধীরে ধীরে বলিলেন “বিন্দুদিদি, তুমি আমাকে ছেলে বেলা থেকে বড় ভাল

বাস”—আর কথা বাহির হইল না,—উমা চক্ষুর জল অঞ্চল দিয়া মুছিলেন।

বিন্দু অতিশয় স্নেহের ভাষায় বলিলেন, “উমা তুমি কি আমাকে ভাল বাস না?”

উমা। “বাসি, যতদিন বাঁচিব, তোমাকে ভাল বাসিব।”

বিন্দু। “তবে বন্ আজ আমার কাছে এত গোপন চেষ্টা কেন? তোমার মনের দুঃখ কি আমি বুঝি নাই? জগতের তোমার সুখের আশা শেষ হইয়াছে তাহা কি আমি বুঝি নাই? বিবাহের পর যে প্রণয়ে তুমি ভাসিতে, আমার সহিত দেখা হইলেই যে কথা আমাকে বলিতে, সে প্রণয় সুখ শেষ হইয়াছে, তাহা কি আমি বুঝি নাই। উমা তুমি এ সব কথা আমার নিকট কেন লুকাইতেছ? আমি কি পর? প্রাণের উমা, তুমি আমি যদি পর হই তবে জগতে আপনার লোক কে আছে?”

এ স্নেহ বাক্য উমা সহ্য করিতে পারিল না, নয়ন দিয়া ঝর ঝর করিয়া বারি বহিতে লাগিল, প্রাণের বিন্দু দিদির হৃদয়ে মুখ খানি লুকাইয়া অভাগিনী একবার প্রাণ ভরে কাঁদিল।

অশ্রুসিক্ত মুখ খানি ধীরে ধীরে তুলিয়া উমা ক্ষীণ স্বরে বরিলেন “বিন্দু দিদি তোমার কাছে আমি কখন কিছু লুকাই নাই, কখন ও লুকাইব না। কিন্তু আজ ক্ষমা কর, এ সব কথা আর একদিন বলিব।”

বিন্দু। “উমা, আমি আজই শুনিব। মনের দুঃখ মনে রাখিলে অধিক ক্লেশ হয়, আপনার লোকের কাছে বলিলে একটু শান্তি বোধ হয়।”

উমা। “কি বলিব বল?”

বিন্দু। “আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ধনঞ্জয় বাবু কি এখন তেমন যত্ন টত্ন করেন?”

উমা। “বিন্দু দিদি, আমার যখন যা দরবার হয় সবই পাই, আমার রোগের চিকিৎসা করাইতেছেন, যত্ন নাই কেমন করে বলিব?”

বিন্দু। “উমা তুমি কি আমাকে পুরুষ মানুষ পাইয়াছ যে ঐ কথায় ভুলাইতেছ। ভাত কাপড় ও ঔষধে কি স্বামীর যত্ন? আমি সে যত্নের কথা বলি

নাই। ধনঞ্জয় বাবু কি পূর্ব্বের মত তোমাকে স্নেহ করেন, পূর্ব্বের মত কি খুলিয়া তোমাকে ভাল বাসেন, পূর্ব্বের মত কি তোমার ভাল বাসায় সুখী হয়েন। উমা মেয়েমানুষের কাছে মেয়ে মানুষের কি এ কথাগুলি খুলে জিজ্ঞাসা করিতে হয়? স্বামীর যে স্নেহ ধনবতী স্ত্রীর ধন, দরিদ্র নারীর সুখ, সকল মেয়েমানুষের জবীন, সে স্নেহটী কি তোমার আছে?''

হতভাগিনী উমা ''না'' কথাটী উচ্চারণ করিতে পারিলেন না, কেবল মাথা নাড়িয়া সেই কথার উত্তর কবিয়া মাথাটী আবার বিন্দুর বুকে লুকাইলেন।

বিন্দুর মুখ গম্ভীর হইল, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন "উমা, সে ধনটী হারাইলে ত চলিবে না, সে ধনটী রাখিবার জন্য কি তুমি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলে?"

উমা। "ভগবান জানেন আমার ভালবাসা কমে নাই, তাঁহাকে এখন ও চক্ষে দেখিলে আমার শরীর জুড়ায়।"

বিন্দু। "উমা, তোমার ভালবাসা আমি জানি, তুমি পতিব্রতা, এ জীবনে তোমার ভালবাসার হ্রাস হইবে না। কিন্তু দেখ বন, কেবল ভালবাসায় স্বামীর স্নেহ থাকে না, সংসার ও চলে না। মেয়েমানুষের আর ও কিছু কর্ত্তব্য আছে, আমাদের আর কিছু শিখিতে হয়।''

উমা। "বিন্দুদিদি, যিনি আমাদিগকে খেতে পরিতে দেন, যিনি আমাদিগের প্রথম গুরু, তাঁহাকে ভালবাসা ছাড়া আর কি দিতে পারি? ভালবাসা ভিন্ন নারীর আর কি দেয় আছে।"

বিন্দু। "উমা, ভালবাসাই আমাদের প্রথম ধর্ম্ম, কিছু তাহা ভিন্ন ও আমাদের কিছু শিখিতে হয়, তা না হইলে সংসার চলে না। যিনি আমাদের জন্য এত করেন তাঁহার মনটী সর্ব্বদা তুষ্ট রাখিবার জন্য, তাঁহার গৃহটী সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখিবার জন্য আমরা যেন একটু যত্ন করিতে শিখি। অনেক সময় একটী মিষ্ট কথায় ক্ষোভ নিবারণ হয়, একটী মিষ্ট কথায় ক্রোধ শান্তি হয়, আমাদেব একটু যত্ন ও প্রফুল্লতায় সংসারটী প্রফুল্ল থাকে। সংসারের জ্বালা যদি একটু সহ্য করিতে শিখি, ক্রোধ একটু সম্বরণ করিতে শিখি, অভিমান একটু ত্যাগ করিয়া ক্ষমা গুণ শিখি, তাহা হইলে সংসারটী বজায় থাকে, না হইলে জীবন তিক্ত হয়। উমা আমি অনেক নির্দোষ

চরিত্র পুরুষ ও নির্দোষ চরিত্রা নারী দেখিয়াছি, তাহাদিগের ভালবাসার ও অভাব নাই, তথাপি তাহাদিগের সংসার শ্মশান ভূমি, জিবন তিক্ত। একটু ধৈর্য্য, একটু ক্ষমা সংসারের পথকে মসৃণ করে, সে গুণ গুলির অভাবে উৎকৃষ্ট সংসার ও কণ্টকময় হয়। অনেক বিলম্বে লোকে ভ্রম বুঝিতে পারে, তখন মনে আক্ষেপ উদয় হয়, তখন তাঁহারা মনে করেন পূর্ব্ব হইতে একটু যত্ন করিলে এ জীবনে কত সুখ হইতে পারিত। কিন্তু তখন অবসর চলিয়া গিয়াছে, প্রণয় একবার ধ্বংশ হইলে আর আসে না. জীবনের খেলা একবার সঙ্গে হইলে আর সে খেলা আরম্ভ করিতে আমাদের অধিকার নাই।"

উমা। "বিন্দুদিদি, তোমারই কাছে বাল্যকালে এ কথাটী আমি শুনিয়াছিলাম, তালপুকুরে তোমার দরিদ্র সংসার দেখিয়া এ শিক্ষাটী আমি শিখিয়াছি, ভগবান জানেন ইহাতে আমারত্রুটী হয় নাই। লোকে আমাকে ধনাভিমানিনী বলিত, কিন্তু যিনি আমার গুরু তিনিই আমাকে সর্ব্বদা মুক্তাহার ও হিরকাভরণ পরিতে দেখিতে ভাল বাসিতেন, সেই জন্য আমি পরিতাম, এই মাত্র আমার অভিমান। লোকে আমাকে রূপাভিমানিনী বলিত, কিন্তু দিদি, তুমি জান, সেরূপে স্বামী একদিন তুষ্ট ছিলেন সেই জন্য আমার অভিমান;—তাঁহাকে তুষ্ট রাখা ভিন্ন আমার জীবনের অন্য ইচ্ছা ছিল না। যখন কলিকাতায় আসিলাম তখন আমি এই যত্ন দ্বিগুণ করিলাম কেন না আমি ভিন্ন এ বাড়ীতে আর মেয়েমানুষ নাই, আমি যদি একটু যত্ন না করি কে করিবে বল?"

বিন্দু। "উমা, তুমি যে এটুকু করিবে তাহা আমি জানিতাম, তোমাকে ছেলেবেলা থেকে আমি জানিতাম, অন্যে তোমাকে দোষ দিয়াছে, আমি দোষ দি নাই। ধৈর্য্য, ক্ষমা, একটু যত্ন স্নেহ ও প্রফুল্লতাই আমাদের কর্ত্তব্য, এ গুলি তুমি শিখিয়াছ, সকলে শিখে না। পূর্ব্বকালে আমরা বড় বড় সংসারে বৌ মানুষ হইয়া থাকিতাম, শাশুড়ীর ভয়ে, ননদের ভয়ে, জায়ের ভয়ে আমাদের স্বাভাবিক ঔদ্ধত্য অনেকটা চাপা পড়িত, আমারা মুখ বন্ধ করিয়া থাকিতাম, শাশুড়ীর আদেশে সংসার চলিত। এখন সবাই পৃথক পৃথক থাকিতে শিখিয়াছে, ছেলেরা ও যাহা ইচ্ছা করে,

বৌয়েরাও আপনাদের কর্ত্তব্য ভুলিয়া যায়, সংসার সুখ অনায়াসে বিনষ্ট হয়।"

উমা। বিন্দু দিদি, আমারও অনেক সময় মনে হয়, সকলেই একত্রে থাকিবার প্রথাই ভাল ছিল, ছেলেরা শীঘ্র কুপথে যাইতে পারিত না, মেয়েরাও নম্রতা শিখিত।"

বিন্দু। "উমা. সুখ দুঃখ সকল প্রথাতেই আছে। কালীতারা বৃহৎ পরিবারে আছে, আহা! কালী কি সুখে আছে? একত্র বাস করিবার কি এই সুখ?"

উমা। "কালীদিদির দুঃখের অন্য কারণ। বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে, সে চিরজীবনের প্রণয়সুখে বঞ্চিত।"

বিন্দু। "আমি প্রণয়সুখের কথা বলিতেছি না। কিন্তু প্রত্যহ পথের মুটের চেয়েও যে সকাল থেকে দুপুররাত্রি পর্য্যন্ত খাটিয়া খাটিয়া যে, সে রোগগ্রস্ত হইয়াছে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যে নির্দ্দোষে পথের কাঙ্গালী অপেক্ষাও গঞ্জনা ও গালী খায় তাহার কারণ কি?"

উমা। "বিন্দু দিদি, সে কালীদিদির খুড়শাশুড়ীরা মন্দ লোক এই জন্য।"

বিন্দু। "তা বড় সংসারে সকলেই যে ভাল লোক হইবে, তাহারই সম্ভাবনা কি? একজন মন্দ হইলেই সংসার তিক্ত হয়, সমস্ত দিন খিটি নাটি ও কোন্দল; যে কালীতারার মত ভাল মানুষ তাহারই অধিক যাতনা। এই সব দেখিয়াই যাদের একটু টাকা হয় তারা ভিন্ন থাকিতে চায় না হইলে আপনার লোক কে ইচ্ছা করে ত্যাগ করে বসে। তা ভিন্ন থাকিয়াও যদি আমাদের যার যেটুকু করা আবশ্যক তাহাই করি, শাশুড়ীর ভয়ে যেটুকু শিখিতাম, সেইটুকু যদি নিজ বুদ্ধিতে শিখি, তাহা হইলেও সংসারে অনেকটা সুখ থাকে। এখনকার মেয়েরা এটী বড় শিখে না, কালে বোধ হয় শিখিবে।"

এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতে রাস্তায় জুড়ীর শব্দ হইল, একখানি গাড়ী আসিয়া ফাটকে দাঁড়াইল। উমা তাহার অর্থ বুঝিলেন, সুতরাং দেখিতে উঠিলেন না, বিন্দু গবাক্ষের নিকট যাইয়া দেখিতে লাগিলেন।

যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার নয়ন হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। ধনঞ্জয় বাবু বাগান হইতে আসিলেন। তাঁহার বেশভুষা বিশৃঙ্খল,

তিনি নিজে অচেতন, দুইজন ভৃত্য তাঁহাকে গাড়ী হইতে উপরে উঠাইয়া লইয়া গেল।

ঝর ঝর করিয়া চক্ষুর জল ফেলিতে ফেলিতে বিন্দু উমাকে দুই হস্তে আপনার বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলেন,

"উমা, ভগবান্ জানেন নারীর যতদূর কষ্ট হয়, তুমি তাহা সহ্য করিতেছ, সেই কষ্টে উমা আর উমা নাই. বোধ হয় রাত জাগিয়া, না খাইয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তোমার এই দশা হইয়াছে, রোগও হইয়াছে। কি করিবে বন, যেটি সইতে হয় সহিয়া থাক। যত্নের ত্রুটী করিও না, অভিমান দেখাইও না, একটী উচ্চ কথা কহিও না, তাহা হইলে আরও মন্দ হইবে, এ রোগের সে ঔষধি নহে। নীরবে এ যাতনা সহ্য কর, যখন অবকাশ পাইবে মিষ্ট কথায় ধনঞ্জয় বাবুকে তুষ্ট করিও, কথায় বা ইঙ্গিতে তিরস্কার করিও না, কাঁদিতে হয় গোপনে কাঁদিও। যাহাদের লইয়া ধনঞ্জয় বাবু এখন এত সুখ অনুভব করেন, হয়ত কাল তাহাদিগের উপর বিরক্ত হইবেন। পরম অসদা-চারী ও অসদাচার পরিত্যাগ করিয়া আবার পবিত্র স্নিগ্ধ সংসার সুখ খুঁজি-য়াছে এমনও আমি দেখিয়াছি। তোমার মাকে আমি অদ্যই চিঠি লিখিব, ধৈর্য্য ধারণ করিয়া, আশায় ভর করিয়া থাক,—প্রাণের উমা, ভগবান্ এখনও তোমার কষ্ট মোচন করিতে পারেন, তোমাকে সুখ দিতে পারেন।"

দুই ভগিনীতে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া অনেকক্ষণ রোদন করিলেন। উমা বিন্দুর কথার কোনও উত্তর দিলেন না, মনে মনে ভাবিলেন, ভগবান একটী সুখ আমাকে দিতে পারেন,—মৃত্যু।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

আর একজন হতভাগিনী।

বিন্দু বাটী আসিয়া পালকী হইতে না নামিতে নামিতে সুধা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিয়া বলিল,

"অ দিদি, দিদি, কে এসেছে দেখবে এস।"

বিন্দু। "কে গো ?"

সুধা। "এই দেখবে এস না, এই শোবার ঘরে বসে আছে।"

বিন্দু। "কে শরৎ বাবু ?"

সুধা। "না শরৎ বাবু নয়। দিদি, শরৎ বাবু এখন আর আসেন না কেন ?"

বিন্দু। "শরৎ বাবুর কি পড়া শুনা নেই, তার একজামিন কাছে, সে কি রোজ আসতে পারে ?"

সুধা। "একজামিন কবে দিদি ?"

বিন্দু। "এই শীতকালে।"

সুধা। "তার পর আসবেন ?"

বিন্দু। "আসবে বৈকি বন, এখন ও আসবে, তা রোজ রোজ কি আসতে পারে, যে দিন অবকাশ পাইবে আসবে। উপরে কে বসিয়া আছে ?"

সুধা। "কে বল না ?"

বিন্দু। "চন্দ্রনাথ বাবুর স্ত্রী আসিয়াছেন নাকি ? তিনি ত মধ্যে মধ্যে আসেন, আর কে আসবে ?"

সুধা। "না তিনি নয়।"

বিন্দু। "তবে বুঝি দেবী বাবুর স্ত্রী, এত দিন পর বুঝি একবার অনুগ্রহ করে পদধূলি দিলেন ?"

সুধা। "না তিনিও নয়,—কালীদিদি আসিয়াছে।"

বিন্দু। "কালীতারা! তারা কলকেতায় এসেছে কৈ কিছুই ত জানিনি।"

এই বলিতে বলিতে উপরে আসিয়া বিন্দু কালীতারাকে দেখিলেন; অনেক দিন পর তাহাকে দেখিয়া বড় প্রীত হইলেন। বলিলেন,

"এ কি, কালীতারা! কলকেতায় কবে এলে ? তোমরা সকলে ভাল আছ ?"

কালী। "এই পাঁচ সাত দিন হোল এসেছি, এতদিন কাযের ঝন্‌ঝটে আসতে পারিনি, আজ একবার মেজখুড়ীকে অনেক করিয়া বলিয়া কহিয়া আসিলাম। ভাল নেই।"

বিন্দু। "কেন কাহার ব্যারাম সেয়রাম হয়েছে নাকি ?"

কালী। "'বাবুর বড় বেরাম' তাঁরই চিকিৎসার জন্য আমরা কলকেতায় এসেছি। বর্দ্ধমানে এত চিকিৎসা করাইলেন কিছুই হোল না, এখন কলকেতায় ইংরেজ ডাক্তার দেখ্‌চেন, ভগবানের যাহা ইচ্ছা।" এই বলিয়া কালীতারা রোদন করিতে লাগিলেন।

বিন্দু। "সে কি ? কি ব্যারাম ?"

কালী। "জ্বর আর আমাসা। সে জ্বর ও ছাড়ে না, সে আমাসা ও বন্ধ হয় না, আহা তাঁর শরীরখানি যে কাঠিপানা হয়ে গিয়েছে" আবার চক্ষে বস্ত্র দিয়া কালীতারা ফোঁপাইতে লাগিলেন।

বিন্দু। "তা কাঁদ কেন বন, কাঁদলে আর কি হবে বল। এখন ভাল করে চিকিৎসা করাও ব্যারাম হয়েছে, ভাল হয়ে যাবে। তা কবিরাজ দেখাচ্ছ না কেন ? পুরাণ জ্বর আর আমাশায় কবিরাজ যেমন চিকিৎসা করে, ইংরাজ ডাক্তারে তেমন কি পারে ?"

কালী। "কবরেজ দেখাতে কি বাকি রেখেছে বিন্দু দিদি, কবরেজে হার মেনেছে তবে ইংরেজ ডাক্তার ডেকেছে। বর্দ্ধমানে তিন মাস থেকে ভাল ভাল কবরেজ দেখিয়াছে, কলকেতা থেকে ভাল ভাল কবরেজ গিয়াছিল, কিছু করতে পারিল না।"

বিন্দু। "তবে দেখ বন, ইংরাজী চিকিৎসায় কি হয়। তোমরা আছ কোথায় ?"

কালী। "কালীঘাটে একটী বাড়ী নিয়েছি, ঠিক আদিগঙ্গার কিনারায়।"

বিন্দু। "কালীঘাটে কেন ? এই বর্ষাকালে কালীঘাটে শুনেছি অনেক ব্যারাম সেয়ারাম হচ্চে, সেখানে না থেকে একটু ফাঁকা জায়গায় রইলে না কেন ?"

কালী। "তাও কি হয় দিদি ? ওরা কলকেতায় আসতে চান না, বলেন এখানে বাচ বিচার নেই, এখানে জাত থাকে না। শেষে কত করে কালীঘাটের একজন পাণ্ডাকে দিয়ে একটী বাড়ি ঠিক করিয়া তবে আমরা আসিলাম। রোজ আমাদের আদিগঙ্গায় স্নান হয়, রোজ পূজা দেওয়া হয়। কত ক্রিয়া কর্ম্ম, ঠাকুরকে কত মানত করা হয়েছে, আমার

শাশুড়ীরা জোড়া মোষ মেনেছেন,—আমার কি আছে বিন্দু দিদি, আমার রূপার গোটটী বেচিয়া জোড়া পাঁঠা দিব মেনেছি। আহা ঠাকুর যদি রক্ষা করেন, বাবুকে যদি এ যাত্রা বাঁচান তবেই আমরা বাঁচলুম, নৈলে আমাদের এত বড় সংসার ছারখার হয়ে যাবে। আমাদের মান বল, ধন বল, বিষয় বল, খ্যাতি বল, কুলের গৌরব বল, বাবুর হাতেই সব; তিনিই সকলের মাথা, তিনি একাই সব কচ্চেন কর্ম্মাচ্চেন, তিনিই সব চালিয়ে নিচ্চেন। তিনি না থাকিলে আমাদের কে আছে বল, ভগবান! এ কাঙ্গালিকে চির-হতভাগিনী করিও না।"

আজীবন যে স্বামীর প্রণয়সুখ কখনও ভোগ করে নাই, প্রণয়সুখ কাহাকে বলে জানিত না,—আজি সে স্বামী বিয়োগ চিন্তার যাতনায় ধুলায় লুণ্ঠিত হইল।

বিন্দু কালীকে অনেক করিয়া সান্ত্বনা করিলেন। বলিলেন "ভয় কি বন, চিকিৎসা হইতেছে তবে আর ভয় কি? আমাদের বাবু আছেন, তোমার ভাই শরৎ বাবু আছেন, সকলে দেখিবে শুনিবে, পীড়া শীঘ্র আরাম হইবে। এই সুধার এমন ব্যারাম হয়েছিল, শরৎ বাবু কত যত্ন করলেন, দিন রত্রি খাওয়া ঘুম ছেড়ে সেবা করলেন, তাই বাঁচন, না হলে কি সুধা বাঁচত।"

কালী। বিন্দু দিদি, শরৎ রোজ এখানে আসে?"

বিন্দু। আগে আসত বন, এখন তার একজামিন কাছে, তাই আসতে পারে না; বাবুই বুঝি তাঁকে একটু ভাল করে লেখাপড়া করতে বলেছেন; প্রায় এক মাস অবধি আসেন নাই।"

কালী। "বিন্দুদিদি মধ্যে মধ্যে তাকে আসতে বলিও, এখানে মধ্যে মধ্যে এসে গল্প সল্প করেলে থাকবে ভাল, আহা দিন রাত পড়ে পড়ে শরতের চেহারা কালী হয়ে গেছে, চক্ষু বসে গিয়েছে। কাল সে এসে ছিল, হঠাৎ চেনা যায় না।"

বিন্দু। সে কি কালী, কৈ তা ত আমরা কিছু জানি নি। এখানে যখন আসত তখন বেশ চেহারা ছিল, এর মধ্যে এমন হয়ে গেছে? এমন করেও পড়ে? না হয় একজামিন নাই হোল, তা বলে কি পোড়ে পোড়ে

ব্যারাম করবে? আমি বাবুকে বলব এখন, শরৎ বাবুকে একদিন ডেকে আনবেন, মধ্যে মধ্যে শনিবার কি রবিবার এখানেই না হয় থাকলেন”

তাহার পর উমাতারার কথা হইল; বিন্দু যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন, অনেক আক্ষেপ করিয়া কালীকে তাহা শুনাইলেন, কালীও খানিক কাঁদিলেন। বিন্দু শেষে বলিলেন,

“আমি আজই জেঠাইমাকে চিঠি লিখিব, জেঠাইমা আসুন যাহা করিবার করুন, আমি আর এ কষ্ট দেখিতে পারি না। কলিকাতা ছাড়িতে পারিলে বাঁচি, আবার তালপুখুরে যাইতে পারিলে বাঁচি।”

কালী। “তোমাদের এই ভাদ্র মাসে যাবার কথা ছিল না? ভাদ্র মাস ত প্রায় শেষ হোল।”

বিন্দু। “কথা ত ছিল, কিন্তু হয়ে উঠলো কই? আবার উমাতারার এই রোগ, তোমাদের বাড়ীতে রোগ, এ সব রেখে ত যেতে পারি নি। পূজার পর না হলে আমাদের যাওয়া হচ্ছে না, পূজারও বড় দেরি নাই, মাস খানেক ও নাই।”

কালী। “তবে তোমাদের ধান টান দেখবে কে?”

বিন্দু। “বাবু সনাতনকে জমী ভাগে দিয়ে এসেছেন। সোনাতন আমাদের পুরাতন লোক, আমাদের অংশ গোলায় বন্ধ করিয়া রাখবে, তার কোনও ভাবনা নেই।”

আর কতক্ষণ কথাবার্ত্তার পর কালীতারা চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময় হেমচন্দ্র বাটী আসিলেন। উমাতারা কিছু জল খাবার আনিয়া দিলেন, এবং উভয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

হেম। “এদিকে উমাতারার রোগ ও দুর্দ্দশা, ওদিকে কালীতারার স্বামীর উৎকট পীড়া, আবার তুমি বল্‌চ শরৎও নাকি ছেলে মানুষের মত শরীরের যত্ন না নিয়া পড়াশুনা করিতেছে। এখন কোন দিক সামলাই? উপায় কি? বিপদে তুমিই মন্ত্রী, ইহার উপায় কি ঠিক করিয়াছ?”

বিন্দু। “ললাটের লিখন রাজার সৈন্যেও ফিরায় না, মন্ত্রীর মন্ত্রণায়ও ফিরায় না। তবে আমাদের যাহা সাধ্য তাহা করিব।”

হেম। “তবু কি ঠিক করিলে? উমাকে কি বলিয়া আসিলে?”

বিন্দু। "কি আর বলিব? আমার ঘটে যেটুকু বুদ্ধি আছে তাই দিয়া আসিলাম, এখনকার চঞ্চলমতি স্বামীকে বশ করিবার যে মন্ত্রটী জানি, তাহাই শিখাইয়া আসিলাম।"

হেম। "সে ভীষণ মন্ত্রটী কি, আমি জানিতে পারি কি?"

বিন্দু। "জানবে না কেন? উমার বাড়ীতে বড় একটী আঁবগাছ আছে; তাহারই ডাল লইয়া প্রকাণ্ড একটী মুগুর প্রস্তুত করিয়া বিপথগামী স্বামীকে তদ্দারা বিশেষরূপে শিক্ষা দেওয়া। এই মহা মন্ত্র।"

হেম। "না বৃহস্পতির এরূপ মন্ত্র নহে।"

বিন্দু। "তবে কিরূপ?"

হেম। "কচি আঁবের অম্বল রাঁধিয়া দেওয়া, পাকা আঁবের সুমিষ্ট রস করিয়া দেওয়াই বৃহস্পতির মন্ত্রের কয়েকটী সাধন দেখিয়াছি, আর বেশি বড় জানি না।"

বিন্দু। "তবে তাহাই শিখাইয়া আসিয়াছি। আর জেঠাইমাকে পত্র লিখিব, তিনি আসিলে বোধ হয়, উমার মনও একটু ভাল হইবে, ধনঞ্জয় বাবুও লজ্জার খাতিরে কয়েক মাস একটু সাবধানে থাকিবেন।"

হেম। "জেঠাইমা জামাইয়ের বাড়ীতে আসিবেন কেন?"

বিন্দু। "আমি সব কথা লিখিলে আসিবেন। হাজার হোক মার মন।"

হেম। "আর কালীতারার কি উপায় করিলে?"

বিন্দু। "সেটী তোমাকে দেখিতে হবে। তোমার চাকুরি টাকুরি ত বিলক্ষণ হল, এখন প্রত্যহ একবার করে কালীঘাটে গিয়া রোগীর যত্ন করিতে হবে। সে বাড়ীতে মানুষের মত মানুষ একজনও নেই, হয় ত ঠাকুরবাড়ীর প্রসাদগুলা খাওয়াইয়া রোগীর রোগ আরও উৎকট করিবে। চিকিৎসাটি যাতে ভাল করিয়া হয়, তুমি দেখিও।"

হেম। "তা আমার যাহা সাধ্য করিব। কাল প্রত্যূষেই সেখানে যাইব। আর শরতের কি বন্দোবস্ত করিলে? তুমি রহিলে একদিকে আমি রইলাম আর একদিকে, শরৎ বাবুকে একটু দেখে শুনে কে?"

বিন্দু। "তাই ত, সে পাগলা ছেলেটার কথা কৈ আমি ভাবিনি। ওলো

সুধা, তুই একটু শরৎবাবুর যত্ন টত্ন কর্‌তে পারবি? নৈলে ত সে পড়ে পড়ে সারা হোলো।”

সুধা দূরে খেলা করিতেছিল, দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল “দিদি ডাকছিলে?”

বিন্দু হাসিতে হাসিতে বলিলেন “হেঁ ব’ন ডাক্‌ছিলুম। বলি তুই একটু শরৎবাবুর যত্ন করিতে পারবি?”

বালিকার কণ্ঠ হইতে ললাট প্রদেশ পর্য্যন্ত রঞ্জিত হইল। সে দৌড়াইয়া পলাইয়া গেল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

শারদীয় পূজা।

আশ্বিনে অম্বিকাপূজার সময় আগত হইতে লাগিল। ছেলেগুলের বড় আমোদ। নূতন কাপড় হবে, নূতন জুতা হবে, নূতন পোষাক বা টুপি হবে, ইস্কুলের ছুটি হবে, পূজার সময় যাত্রা হবে, ভাসানের দিন গাড়ী করিয়া ভাসান দেখিতে যাবে। বালকবৃন্দ আহ্লাদে আটখানা।

গৃহস্তগৃহিণীদিগের ত আনন্দের সীমা নাই। কেহ বড় তত্ত্বের আয়োজন করিতেছেন, নূতন জামাইকে ভাল রকম তত্ত্ব করিয়া বেয়ানের মন রাখিবেন। কেহ বড় তত্ত্ব প্রত্যাশা করিতেছেন, পাসকরা ছেলের বিবাহ দিয়া অনেক অর্থ লাভ করিয়াছেন, ঘড়ী, ঘড়ীর চেন খারাব হইয়াছিল, বলিয়া তাহা টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া, বেয়ানের গোট বেচাইয়া ভাল ঘড়ি আদায় করিয়াছেন, আবার অপরাহ্নে ছাদে পা মেলাইয়া বসিয়া বুদ্ধিমতী পড়সী-গৃহিণীদিগের সহিত পরামর্শ করিতেছেন “এবার দেখিব, বেয়ান কেমন তত্ত্ব করে, যদি তত্ত্বের মত তত্ত্ব না করে, লাথি মেরে ফেলে দিব। বের সময় বড় ফাকি দিয়েছে, এবার দেখব কে ফাঁকি দেয়। আমার ছেলে কি বানের জলে ভেসে এসেছে, এমন ছেলে কলকেতায় কটা

আছে ? মিন্‌সের যেমন বাওত্তুরে ধরেছে এমন ছেলেরও এমন ঘরে বে দেয়! তা দেখ্‌বো দেখ্‌বো, তত্ত্বের সময় কড়াগণ্ডা বুঝিয়া লইব, নৈলে আমি কায়েতের মেয়ে নই।” রোরুদ্যমানা বালবধূ বাপের বাড়ী যাইবার জন্য তিন মাস হইতে বৃথা ক্রন্দন করিতেছে, গৃহিণী তত্বটী না দেখিয়া মেয়ে পাঠাবেন না।

সামান্য ঘরের যুবতীগণও দিন গুনিতেছে, স্বামী বিদেশে চাকুরি করেন, পূজার সময় অনেক কষ্টে ছুটী পাইয়া একবার ভার্য্যার মুখ দর্শন করেন। “এবার কি তিনি আসিবেন ? সাহেবে কি এবার ছুটী দিবেন ? হেগা সাহেবদের কি একটু দয়া মমতা নেই, তাঁদেরও কি স্ত্রী পরিবারের জন্য একটু মন কেমন করে না ?

বাবু মহলেও আনন্দের সীমা নাই। কাহারও বজরা ভাড়া হই-তেছে, নাচ গানের ভাল রকম আয়োজন হইতেছে, আর কত কি আয়ো-জন হইতেছে, আমরা তাহা কিরূপে জানিব ? আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কায কি ?

পল্লিগ্রামেও আনন্দের সীমা নাই। মাতা বসুমতীর অনুগ্রহ অপার, কৃষকগণ ভাদ্র মাসে শস্য কাটিয়া জমীদারের খাজনা দিতেছে, মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিতেছে, বৎসরের মধ্যে এক মাস বা দুই মাসের জন্য গৃহে একটু ধান জমাইতেছে। কৃষক বধুগণ লুকিয়া চুরিয়া সেই ধান একটু সরাইয়া হাতের দুগাছি সাঁকা করিতেছে, বা হাটে একখানি নূতন কাপড় কিনিতেছে। বর্ষার পর সুন্দর বঙ্গদেশ যেন স্নাত হইয়া সুন্দর হরিৎবর্ণ বেশ ধারণ করিলেন; আকাশ মেঘরূপ কলঙ্ক ত্যাগ করিয়া শরতের আহ্লাদকর জ্যোৎস্না বর্ষণ করিতে লাগিলেন বায়ু নির্ম্মল হইল, বড় গরম নহে, বড় শীতল নহে, মনুষ্য শরীরের সুখ বর্দ্ধন করিয়া মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল। গৃহস্থের ঘর ও ধন ধান্যে পূর্ণ হইল, গৃহস্থের মন একটু আনন্দে পূর্ণ হইল, চালে নূতন খড় দিয়া ছাউনি বাঁধা হইল। বঙ্গদেশে শারদীয় পূজার যে এত ধূমধাম, তাহার এই কারণ,—অন্য কারণ আমরা জানি না।

কিন্তু আনন্দময়ী শরৎকাল সকলের পক্ষে সুখের সময় নয়। দরিদ্রের দুঃখ অপনীত হয় কিন্তু শোকার্ত্তের শোক অপনীত হয় না। উমাতারার

মাতা কলিকাতায় আসিলেন, বিন্দু বার বার উমাকে দেখিতে যাইতেন কিন্তু উমার রোগের শান্তি হইল না। ধনঞ্জয় বাবু দিন কতক একটু অপ্র-তিভের ন্যায় বোধ করিলেন, কিন্তু অনেকদিনের অভ্যাস তাঁহার চরিত্রে গম্ভীররূপে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা অপনীত হইল না, তিনি বাড়ী-ভিতর আসা বন্ধ করিলেন, বাহিরেই আহারাদি করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। উমার মাতা পুনরায় পল্লিগ্রামে যাইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন, কিন্তু দিন দিন কন্যার অবস্থা দেখিতে দেখিতে সহসা কলিকাতা ত্যাগ করিতেও পারিলেন না। হতভাগিনী উমা আরও ক্ষীণ হইতে লাগিল, বর্ষাশেষে তাহার কাশি ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; মুখ খানি অতিশয় রুক্ষ, চক্ষু দুটী কোটর প্রবিষ্ট। কাহাকেও তিরস্কার না করিয়া আপনার মন্দ ভাগ্যের কথা না কহিয়া দিনে দিনে ধীরে ধীরে আপনার গৃহকার্য্য করিত, বিন্দুর সঙ্গে আলাপ করিত, মাতার সেবা সুশ্রুষা করিত, স্বামীর জন্য নানারূপ ব্যঞ্জনাদি স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া বাহিরে পাঠাইয়া দিত।

হেমের যত্নে কালীতারার স্বামীর পীড়ার কিঞ্চিৎ উপশম হইল, কিন্তু আরোগ্য হইল না, সে বয়সে পুরাতন রোগ শীঘ্র যায় না, তাহার উপর বৃহৎ সংসারের নানারূপ উপদ্রব, কালীঘাটের পাণ্ডাদিগের নানারূপ উপদ্রব। অনেক যত্নে যে টুকু ভাল হয় একদিন অনিয়মে সে টুকু আবার মন্দ হয়, হেমচন্দ্র পীড়ার আরোগ্যের বড় আশা করিতে পারিলেন না।

বিন্দু মধ্যে মধ্যে শরৎকে ডাকিয়া পাঠাইতেন, শরৎ আসিয়া উঠিতে পারিতেন না, তাহার পড়াশুনার বড় ধুম, এখন ভাল করিয়া না পড়িলে পরীক্ষা দিবেন কিরূপে? বিন্দুও বড় জেদ করিতেন না কেবল প্রত্যহ কোনও নূতন ব্যঞ্জন রাধিয়া কি ফল ছাড়াইয়া পাঠাইয়া দিতেন। সুধা যত্ন সহকারে মিস্রির পানা প্রস্তুত করিত, আক পেঁপে ছাড়াইয়া দিত, মুগের ডাল ভিজাইয়া দিত, প্রত্যহ অপরাহ্নে নিজ হস্তে রেকাবি সাজাইয়া ঝিয়ের দ্বারা শরতের বাটীতে পাঠাইয়া দিত। শরৎ অনেক মানা করিয়া পাঠাইত, কিন্তু ছেলেটী কিছু পেটুক, সেই মুগের ডালগুলির নিদর্শন রেকাবিতে অধিকক্ষণ থাকিত না, একবার চুমুক দিতে আরম্ভ হইলে সে মিস্রির পানা নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হইত। ঝিকে বলিতেন "ঝি, কাল থেকে আর

এনো না, তাঁরা কেন রোজ রোজ কষ্ট করিয়া প্রস্তুত করেন, আমি সত্য বলিতেছি, আমার এসব দরকার নেই।" ঝি খালি পাত্রগুলি হাতে লইয়া "তা দেখিতেই পাইতেছি" বলিয়া প্রস্থান করিত। বলা বাহুল্য যে পেটুক বালকের কথায় মানা করা না শুনিয়া সুধা প্রত্যহ মিস্রির পানা প্রস্তুত করিয়া পাঠাইত।

এইরূপে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়া গেল, শেষে পূজা আসিয়া পড়িল। দেবী বাবুর বাড়ীতে বড় ধুম ধাম, দেবীর বৃহৎ মূর্ত্তি, অনেক গাওনা বাজনা, তিন রাত্রি যাত্রা। দেবী বাবুর গৃহিণীর বুকের বেদনা টা সেই সময় বোধ হয় একটু কমিয়াছিল, কেন না তিনি তিন রাত্রি ধরিয়া সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্য্যন্ত বারাণ্ডায় চিক ফেলিয়া ঠায় বসিয়া যাত্রা শুনিলেন। কবিরাজ গৃহিণীর মৎলব বুঝিয়া একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "হেঁ তাহাতে হানি কি? যে তেলটা দিয়েছি সেটা যেন ভাল করিয়া মালিস করা হয়।"

দেবী বাবুর গৃহিণীর উপরোধে চন্দ্রনাথ বাবুর স্ত্রী ও অন্যান্য ভদ্র-গৃহিণীও আসিয়া যাত্রা শুনিল। নিতান্ত অনভিলাষও নাই। বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা. রাধিকার মান ভঞ্জন, গান গুলি বাছা বাছা, ভাবই কত, অর্থই কত প্রকার; গৃহিনীগণ রোরুদ্যমান গণ্ডা গণ্ডা ছেলেগুলোকে থাবড়া মারিয়া ঘুম পাড়াইয়া একাগ্রচিত্তে সেই গীতরস গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বিদেশিনীর প্রতি রাধিকার স্তুতি শুনিয়া বৃদ্ধাগণ ভাবে গদগদ চিত্তে ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

বিন্দুও কি করেন, একদিন ছেলে দুটীকে সুধার কাছে রাখিয়া গিয়া যাত্রা শুনে এলেন। সকালে এসে হেমকে বলিলেন,

"মান ভঞ্জন বড় মন্দ হয়নি, তুমি একদিন গিয়ে শুনে এস না।

হেম "না মান ভঞ্জন প্রথা তোমার কাছেই ছেলেবেলা অনেক শিখেছি, আর যাত্রায় কি দেখিব?

বিন্দু স্বামীর মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন,

"মিথ্যা কথাগুলো আর বোলো না, পাপ হবে।"

বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিজয়া দশমী।

আজি মহা কোলাহলে ভাসান হইয়া গিয়াছে; মহানগরীর পথে ঘাটে বাটীতে বাটীতে আনন্দধ্বনি ধ্বনিত হইয়াছে, বাদ্য ও গীতধ্বনি শব্দিত হইয়াছে। রাজপথে আবাল বৃদ্ধ বনিতা, কি ইতর কি ভদ্র, কি শিশু কি যুবা, সকলেই নদীর স্রোতের ন্যায় গমনাগমন করিয়াছে; নিতান্ত দরিদ্রও একখানি নূতন বস্ত্র পরিয়া বড় আনন্দ লাভ করিয়াছে। দেবীর উৎসবধ্বনি অদ্য এই মহানগরীকে পুলকিত ও কম্পিত করিয়া ক্রমে নিস্তব্ধ হইল।

তাহার পর ভ্রাতা ভ্রাতার সহিত, বন্ধু বন্ধুর সহিত, পুত্র মাতার নিকট, সকলে প্রণাম বা নমস্কার, আশীর্ব্বাদ বা আলিঙ্গন দ্বারা সকলকে তৃপ্ত করিল। বোধ হইল যেন জগতে আজি বৈরভাব তিরোহিত হইয়াছে, যেন শত্রু শত্রুকে ক্ষমা করিল, অপরাধগ্রস্ত অপরাধীকে ক্ষমা করিল। মনুষ্য হৃদয়ের সুকুমার মনোবৃত্তিগুলি স্ফূর্ত্তি পাইল, দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা ও বাৎসল্য অদ্য বাঙ্গালির হৃদয়ে উথলিতে লাগিল। শরতের সুন্দর জ্যোৎস্নাতে রাজপথে আনন্দের লহরী, সৌজন্যের লহরী, ভালবাসার লহরী বহিতে লাগিল। সংসারের লীলাখেলা দেখিতে দেখিতে আমরা অনেক শোকের বিষয়, অনেক দুঃখের বিষয়, অনেক পাপ ও প্রবঞ্চনার বিষয় দেখিয়াছি,—নিষ্ঠুর লেখনীতে সেগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছি। অদ্য এই পুণ্য রজনীতে ক্ষণেক দাঁড়াইয়া এই সুখ লহরী দেখিলাম, হৃদয় তুষ্ট হইল, শরীর পুলকিত হইল। এ রজনীতে যদি কোন অপবিত্রতা থাকে, কোনও পাপাচরণ অনুষ্ঠিত হয়,—তাহার উপর যবনিকা পাতিত কর,—সেগুলি আজ দেখিতে চাহি না।

রাত্রি দেড় প্রহরের সময় বিন্দু রান্নাঘরে ভাত খাইয়া উঠিলেন। ছেলে দুটী ঘুমাইয়াছে, সুধা ঘুমাইয়াছে, হেমবাবুও শুইয়াছেন, ঝিও বাড়ী গিয়াছে, বিন্দু সদর দরজায় খিল দিয়া নীচে একাকী ভাত খাইলেন, ও উঠিয়া আচমন করিলেন। এমন সময় কবাটে একটী শব্দ শুনিলেন, কে যেন আস্তে আস্তে ঘা মারিল।

এত রাত্রিতে কে আসিয়াছে? বিন্দু একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, আবার শব্দ হইল।

"কে গা? দরজায় কে দাঁড়িয়ে গা?" কোনও উত্তর আসিল না, আবার শব্দ হইল।

বিন্দু কি উপরে গিয়া হেমকে উঠাইবেন? হেম আজ অনেক হাঁটিয়াছেন, অতিশয় শ্রান্ত হইয়া নিদ্রিত হইয়াছেন। বিন্দু সাহসে ভর করিয়া আপনি গিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। লোকটীকে দেখিয়া প্রথমে চিনিতে পারিলেন না, পর মুহূর্ত্তেই চিনিলেন, শরচ্চন্দ্র!

কিন্তু এই কি শরচ্চন্দ্রের রূপ? বড় বড় লম্বা লম্বা রুক্ষ চুল আসিয়া কপালে ও চক্ষুতে পড়িয়াছে, চক্ষু দুটী কোটর প্রবিষ্ট, কিন্তু ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে, মুখ অতিশয় শুষ্ক ও অতিশয় গম্ভীর, শরীরখানি শীর্ণ হইয়াছে, একখানি ময়লা একলাই মাত্র উত্তরীয়!

উভয়ে ভিতরে আসিলেন,—শরৎ বলিলেন,

বিন্দুদিদি অনেক দিন আসিতে পারি নাই, কিছু মনে করিও না, আজ বিজয়ার দিন প্রণাম করিতে আসিলাম।

বিন্দু। শরৎ বাবু বেঁচে থাক, দীর্ঘজীবী হও, তোমার যে থা হউক, সুখে সংসার কর, এইটী যেন চক্ষে দেখিয়া যাই। ভাইকে আর কি আশীর্ব্বাদ করিব।

বিন্দুর স্নেহ-গর্ভ বচনে শরতের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল, শরৎ কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না, বিন্দুর পা দুটী ধরিয়া প্রণাম করিলেন। বিন্দু অনেক আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহাকে হাত ধরিয়া তুলিলেন। পরে বলিলেন,

শরৎবাবু, তুমি অনেক দিন এখানে আইস নাই, তাহাতে এসে যায় না, প্রত্যহ তোমার খবর পাইতাম, জানিতাম আমাদের কোনও বিপদ আপদ হইলে তুমি আসিবে। কিন্তু এমন করে কি লেখাপড়া করে? লেখাপড়া আগে না শরীর আগে? আহা তোমার চক্ষু দুটী বসিয়া গিয়াছে, মুখখানি শুখাইয়া গিয়াছে, শরীর জীর্ণ হইয়াছে, এমন করে কি দিন রাত জেগে পড়ে? শরৎবাবু তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, তোমাকে কি বুঝাইতে হয়, তোমার

বিন্দুদিদির কথাটী রাখিও, রাত্রিতে ভাল করে ঘুমিও, দিনে সময়ে আহার করিও, তোমার মত ছেলে পরীক্ষায় অবশ্য উত্তীর্ণ হইবে।”

শরতের শুষ্ক ওষ্ঠে একটু হাসি দেখা গেল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, “বিন্দুদিদি, পরীক্ষা দিতে পারিলে কি জীবনের সুখবৃদ্ধি হয়? হেমবাবু পরীক্ষা বড় দেন নাই, হেমবাবুর মত সুখী লোক জগতে কয়জন আছে?”

বিন্দু। তবে পরীক্ষার জন্য এত চিন্তা কেন? শরীর মাটি করিতেছ কেন?

শরৎ। পরীক্ষার জন্য এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করি না।

বিন্দু। তবে কিসের চিন্তা?

শরৎ উত্তর দিলেন না, বিন্দুকে রকের উপরে বসাইলেন, আপনি নিকটে বসিলেন, বিন্দুর দুইহাত আপন হস্তে ধারণ করিয়া মাথা হেট করিয়া রহিলেন, ধীরে ধীরে বড় বড় অশ্রুবিন্দু সেই শীর্ণ গণ্ডস্থল বহিয়া বিন্দুর হাতে পড়িতে লাগিল।

বিন্দু। এ কি শরৎ বাবু! কাঁদ্‌চ কেন? ছি তোমার কোনও কষ্ট হয়েছে? মনে কোন যাতনা হয়েছে? তা আমাকে বলচো না কেন? শরৎ বাবু, ছেলেবেলা থেকে তোমার মনের কোন্ কথাটি আমাকে বল নাই, আমি কোন কথাটী তোমার কাছে লুকাইয়াছি। এত দিনের স্নেহ কি আজ ভুলিলে, তোমার বিন্দুদিদিকে কি পর মনে করিলে?

শরৎ। বিন্দুদিদি, যে দিন তোমাকে পর মনে করিব সে দিন এ জগতে আমার আপনার কেহ থাকিবে না। আমার মনের যাতনা তোমার নিকটে লুকাইব না, আমি হতভাগা, আমি পাপিষ্ঠ।

বিন্দু দেখিলেন, শরতের দেহ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, নয়ন অগ্নির ন্যায় জলিতেছে, বিন্দু একটু উদ্বিগ্ন হইলেন ধীরে ধীরে বলিলেন, “শরৎ বাবু, তোমার মনের কথা আমাকে বল, সংকোচ করিও না।”

শরৎ। আমার মনের কথা জিজ্ঞাসা করিও না, বিন্দুদিদি, আমি ঘোর পাপিষ্ঠ, আমার মন পাপ চিন্তায় কৃষ্ণবর্ণ। বন্ধুর গৃহে আসিয়া আমি অসদাচরণ করিয়াছি, ভগিনীর প্রণয়ের বিষময় প্রতিদান করিয়াছি। বিন্দুদিদি আমার হৃদয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিও না, আমার হৃদয় ঘোর কলঙ্কে কলঙ্কিত।

শরৎ বিন্দুর হাত দুটী ছাড়িয়া দিয়া দুই হস্তে বিন্দুর দুই বাহুদেশ ধরিলেন, এত বলের সহিত ধরিলেন যে বিন্দুর সেই দুর্ব্বল কোমল বাহু রক্তবর্ণ হইয়া গেল। শরতের সমস্ত শরীর কাঁপিতেছে, নয়ন হইতে অগ্নি কণা বহির্গত হইতেছে।

বিন্দু শরৎকে এরূপ কখনও দেখেন নাই, তাঁহার মনে সন্দেহ হইল, ভয় হইল। সেই আদর্শ চরিত্র ভ্রাতৃসম শরৎ কি মনে কোনও পাপ চিন্তা ধারণ করে? তাহা বিন্দুর স্বপ্নেরও অগোচর। কিন্তু অদ্য এই নিস্তব্ধ রাত্রিতে সেই ক্ষিপ্তপ্রায় যুবককে দেখিয়া সেই নিরাশ্রয় রমণীর মনে একটু ভয় হইল। প্রত্যুৎপন্নমতি বিন্দু সে ভয় গোপন করিয়া স্পষ্টস্বরে বলিলেন,

শরৎ বাবু, তোমাকে বাল্যকাল হইতে আমি ভাই বলিয়া জানি, তুমি আমাকে দিদি বলিয়া ডাকিতে; দিদির কাছে ভ্রাতা যাহা বলিতে পারে নিঃসঙ্কুচিত চিত্তে তাহা বল।

শরৎ। আমি যে অসদাচরণ করিয়াছি, যে পাপ চিন্তা মনে ধারণ করিয়াছি, তাহা ভগিনীর কাছে বলা যায় না, আমি মহাপাপী।

বিন্দু সরোষে বলিলেন, তবে আমার কাছে সে কথা বলিবার আবশ্যক নাই, আমাকে ছাড়িয়া দাও, ভগিনীকে সম্মান করিও।

শরৎ বিন্দুর বাহুদয় ছাড়িয়াদিলেন, আপন মুখখানি বিন্দুর কোলে লুকাইলেন, বালকের ন্যায় অজস্র রোদন করিতে লাগিলেন।

বিন্দু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। শিশুর ন্যায় যাহার নির্ম্মল আচরণ, শিশুর ন্যায় যে পদতলে পড়িয়া কাঁদিতেছে, সে কি পাপ চিন্তা ধারণ করিতে পারে? ধীরে ধীরে শরতের মুখখানি তুলিলেন, ধীরে ধীরে আপন অঞ্চল দিয়া তাঁহার নয়নবারি মুছিয়া দিলেন, পর আস্তে আস্তে বলিলেন,

শরৎ; তোমার হৃদয়ে এমন চিন্তা উঠিতে পারে না, যাহা আমার শুনিবার অযোগ্য। তোমার যাহা বলিবার বল, আমি শুনিতেছি।"

শরৎ, জগদীশ্বর তোমার এই দয়ার জন্য তোমাকে সুখী করুন। বিন্দু দিদি, আর একটী অভয়দান কর, যদি আমার প্রার্থনা বিফল হয়, প্রতিজ্ঞা কর তুমি এ কথাটী কাহাকেও বলিবে না। আমার পাপ চিন্তা, আমার

জীবনের সহিত শীঘ্র লীন হইবে, জগতে যেন সে কথা প্রকাশ না হয়।

বিন্দু। তাহাই অঙ্গীকার করিলাম।

শরৎ তখন মুহূর্তের জন্য চিন্তা করিলেন, দুই হস্ত দ্বারা হৃদয়ের উদ্বেগ যেন স্থগিত করিবার চেষ্টা করিলেন, তাহার পর আবার বিন্দুর হাত দুটী ধরিয়া, তাঁহার চরণ পর্য্যন্ত মাথা নামাইয়া, অস্ফুট স্বরে কহিলেন, "পুণ্য-হৃদয়া, সরলা বিধবা সুধার সহিত আমার বিবাহ দাও।" বিন্দু তখন এক মুহূর্তের মধ্যে ছয় মাসের সমস্ত ঘটনা বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

শরৎ তখন ক্লিষ্ট স্বরে বলিতে লাগিল, "বিন্দু দিদি, আমি মহাপাপী। ছয়মাস হইল, যে দিন সুধাকে তালপুখুরে দেখিলাম সেই দিন আমার মন বিচলিত হইল। পুস্তক পাঠ ভিন্ন অন্য ব্যবসা আমি জানিতাম না, পুস্তকে ভিন্ন প্রণয় আমি জানিতাম না, সে দিন সেই সরলহৃদয়া স্বর্গের লাবণ্যে বিভূষিতা, ত্রয়োদশ বৎসরের বালিকাকে দেখিয়া আমি হৃদয়ে অননুভূত ভাব অনুভব করিলাম। কালে সেটী তিরোহিত হইবে আশা করিয়াছিলাম কিন্তু দিন দিন কলিকাতায় অধিক বিষ পান করিতে লাগিলাম, আমার শরীর, মন, আত্মা, জর্জরিত হইল। বিন্দুদিদি তুমি সরল হৃদয়ে আমাকে প্রত্যহ তোমার বাটীতে আসিতে দিতে, হেমবাবু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিয়া আমাকে আসিতে দিতেন, আমি হৃদয়ে কালকূট ধারণ করিয়া, পাপ চিন্তা ধারণ করিয়া, দিনে দিনে এই পবিত্র সংসারে আসিতাম। জগদীশ্বর এ মহা পাপ, এ মহা প্রতারণা কি ক্ষমা করিবেন? বিন্দুদিদি তুমি কি ক্ষমা করিবে? সুধার পীড়ার পর যখন প্রত্যহ তাহাকে সান্ত্বনা করিতে আসিতাম, অনেকক্ষণ বসিয়া দুই জনে গল্প করিতাম, অথবা আকাশের তারা গণিতাম, তখন আমি জ্ঞানশূন্য হইয়া যে কি পাপ চিন্তা করিতাম বিন্দুদিদি তোমাকে কি বলিব। আমার বিবাহ হইবে, একটী সংসার হইবে লাবণ্যময়ী সুধা সে সংসারে রাজ্ঞী হইবে, আমার জীবন সুধাময় করিবে, এই চিন্তা আমাকে পূর্ণ করিত, এই চিন্তা আকাশের নক্ষত্রে পাঠ করিতাম, এই চিন্তা বায়ুর শব্দে শ্রবণ করিতাম। প্রত্যহ আসিতে আসিতে আমি প্রায় জ্ঞানশূন্য

হইলাম, তখন হেম বাবু আমার পাঠের ব্যাঘাত হইতেছে বলিয়া একদিন কয়েকটী উপদেশ দিলেন। তখন আমার জ্ঞান আসিল, পাঠ, পুস্তক, পরীক্ষা চিতার আগুনে দগ্ধ হউক,—কিন্তু যে উৎকট বিপদে আমি পড়িয়াছি, পাছে সরলচিত্তা সুধা সেই বিপদে পড়ে, এই ভয় সহসা আমার হৃদয়ে জাগরিত হইল, আমি সেই অবধি এ পুণ্য-সংসার ত্যাগ করিলাম। সুধাকে না দেখিয়া আমিও তাহার চিন্তা ভুলিব মনে করিয়াছিলাম,—কিন্তু সে বৃথা আশা! বিন্দুদিদি সে পাপচিন্তা ভুলিবার জন্য আমি দুই মাস অবধি প্রাণপনে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু সে বৃথা চেষ্টা, নদীর স্রোত হস্ত দ্বারা রোধ করিবার চেষ্টার ন্যায়! আমি পাঠে মন রত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, নাট্যশালায় যাইয়া সে চিন্তা ভুলিতে চেষ্টা করিয়াছি, আমার সহপাঠীদিগের সহিত মিশিয়াছি, গীত বাদ্য শুনিতে গিয়াছি, কিন্তু সে কাল চিন্তা ভুলিতে পারি নাই। ঘরের দেয়ালে, নৈশ আকাশে আমার পুস্তকের পংক্তিতে পংক্তিতে, নাট্যশালার নাট্যাভিনয়ে সেই আনন্দনীয় মুখমণ্ডল দেখিতাম,—রাত্রিতে সেই আনন্দময়ী মূর্ত্তির স্বপ্ন দেখিতাম। বিন্দুদিদি এ দুই মাসের কথা আর বলিব না, পথের কাঙ্গালীও আমা অপেক্ষা সুখী।

"বিন্দুদিদি, আমার মনের কথা তোমাকে বলিলাম, আমাকে ঘৃণা করিও না, আমাকে মহাপাপী বলিয়া দূর করিয়া দিও না। আমি পাপিষ্ঠ, কিন্তু তুমি ঘৃণা করিলে এ জগতে কে আমাকে একটু স্নেহ করিবে, কে আমাকে স্থান দিবে?" আবার শরতের শীর্ণ গণ্ডস্থল দিয়া নয়নবারি বহিতে লাগিল।

বিন্দু স্থির হইয়া এই কথা গুলি শুনিলেন, কি উত্তর দিবেন? শরতের প্রস্তাব পাগলের প্রস্তাব, কিন্তু সে কথা বলিলে হয় ত এই ক্ষিপ্তপ্রায় যুবক আজই আত্মঘাতী হইবে। বিন্দু ধীরে ধীরে শরতের চক্ষুর জল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন,

ছি শরৎ বাবু, আপনাকে এমন করে ক্লেশ দিও না, আপনাকে ধিক্কার করিও না। তোমাকে ছেলে বেলা থেকে আমি ভাইয়ের মত মনে করি, তোমাকে কি আমি ঘৃণা করিতে পারি? এতে ঘৃণার কথা ত কিছুই নাই, কেন আপনাকে মহাপাপী বলিয়া ধিক্কার করিতেছ। তবে বিধবার বিবাহ

আমাদের সমাজে চলন নেই, তা এখন বিবাহ হয় কি না, বাবুকে জিজ্ঞাসা করিব, যাহা হয় তিনি ব্যবস্থা করিবেন। তা তুমি আপনাকে এরূপে ক্লেশ দিও না, তোমার এ কথায় বাবুর যাহাই মত হউক না কেন, তোমার প্রতি আমাদের স্নেহ এ জীবনে তিরোহিত হইবে না।

শরৎ। বিন্দুদিদি, তোমার মুখে পুষ্পচন্দন পড়ুক, তুমি আমাকে যে এই দয়া করিলে, আমাকে যে আজ ঘৃণা করিয়া তাড়াইয়া দিলে না, এ দয়া আমি জীবন থাকিতে বিস্মৃত হইব না।

বিন্দু। "শরৎ বাবু, তোমার বোধ হয়, আজ রাত্রিকে এখনও খাওয়া দাওয়া হয় নাই, কিছু খাবে? একটু মুখটুক ধোও না, বাবুর জন্য আজ লুচি করেছিলুম। তার খানকত আছে।. একটী সন্দেশ দিয়ে খাবে"?

শরৎ। "না দিদি আজ কিছু খাইব না, খাদ্যে আমার রুচি নাই।"

বিন্দু। "তবে কাল সকালে একবার এস, বাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করিও।"

শরৎ। "ক্ষমাকর, এ বিষয়ে হেম বাবু যাহা বলেন, আমাকে বলিও, তাহার পূর্ব্বে আমি হেম বাবুর কাছে মুখ দেখাইতে পারিব না"।

বিন্দু। "তা কাল না আসিলে নেই, কিন্তু মধ্যে মধ্যে এস, এমন করে আপনাকে কষ্ট দিলে অসুখ করিবে যে।"

শরৎ। "দিদি ক্ষমা কর, এ বিষয় নিষ্পত্তি না হইলে আমি সুধার কাছে মুখ দেখাইব না। দেখিও বিন্দু দিদি, এ কথা যেন সুধার কাণে না উঠে, তাহার মন যেন বিচলিত না হয়। আমার আশা যদি পূর্ণ না হয়, জগতে এক জন হতভাগা থাকিবে, আর একজনকে হতভাগিনী করিবার আবশ্যক নাই।"

বিন্দু। "তা তবে এ বিষয়ে বাবুর যা মত হয় তাহা তোমাকে লিখিয়া পাঠাইব।"

শরৎ। "না দিদি, পত্রে এ কথা লিখিও না, আমি আপনি আসিয়া তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া যাইব। কবে আসিব বল, আমার জীবনে বিধাতা সুখ লিখিয়াছেন কি দুঃখ লিখিয়াছেন কবে জানিব বল।"

বিন্দু। "শরৎ বাবু, এ কথা ত দুই একদিনে নিষ্পত্তি হয় না, অনেক দিক

দেখিতে হবে, অনেক পরামর্শ করিতে হবে। তা তুমি দিন ১৫। ২০ পরে এস।"

শরৎ। "তাহাই হউক। আমি কালীপূজার রাত্রিতে আবার আসিব, এ কয়েক দিন জীবন্মৃত হইয়া থাকিব।"

কৃষ্ণচরিত্র।

এক্ষণে উদ্যোগ পর্ব্বের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক—

সমাজে অপরাধী আছে। মনুষ্যগণ পরস্পরের প্রতি অপরাধ সর্ব্বদাই করিতেছে। সেই অপরাধের দমন সমাজের একটী মুখ্য কার্য্য। রাজনীতি রাজদণ্ড ব্যবস্থাশাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্র আইন আদালত সকলেরই একটি মুখ্য উদ্দেশ্য তাই।

অপরাধীর পক্ষে কি রূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে দুইটী মত আছে। এক মত এই:—যে দণ্ডের দ্বারা অর্থাৎ বলপ্রয়োগের দ্বারা দোষের দমন করিতে হইবে—আর একটী মত এই যে অপরাধ ক্ষমা করিবে। বল এবং ক্ষমা দুইটী পরস্পর বিরোধী—কাজেই দুইটী মতই যথার্থ হইতে পারে না। অথচ দুইটীর মধ্যে একটী যে একেবারে পরিহার্য্য এমন হইতে পারে না। সকল অপরাধ ক্ষমা করিলে সমাজের ধ্বংস হয়, সকল অপরাধ দণ্ডিত করিলে মনুষ্য পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব বল ও ক্ষমার সামঞ্জস্য নীতিশাস্ত্রের মধ্যে একটী অতিকঠিন তত্ত্ব। আধুনিক সুসভ্য ইউরোপ ইহার সামঞ্জস্যে অদ্যাপি পৌঁছিতে পারিলেন না। ইউরোপীয়দিগের খৃষ্টধর্ম্ম বলে সকল অপরাধ ক্ষমা কর; তাঁহাদিগের রাজনীতি বলে সকল অপরাধ দণ্ডিত কর। ইউরোপে ধর্ম্ম অপেক্ষা রাজনীতি প্রবল, এ জন্য ক্ষমা ইউরোপে লুপ্তপ্রায়, এবং বলের প্রবল প্রতাপ।

বল ও ক্ষমার যথার্থ সামঞ্জস্য এই উদ্যোগ পর্ব্ব মধ্যে প্রধান তত্ত্ব।

শ্রীকৃষ্ণই তাহার মীমাংসক, প্রধানতঃ শ্রীকৃষ্ণই উদ্যোগ পর্ব্বের নায়ক। বল ও ক্ষমা উভয়ের প্রয়োগ সম্বন্ধে তিনি যে রূপ আদর্শ কার্য্যতঃ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। যে তাঁহার নিজের অনিষ্ট করে, তিনি তাহাকে ক্ষমা করেন; এবং যে লোকের অনিষ্ট করে তিনি বলপ্রয়োগ পূর্ব্বক তাহার প্রতি দণ্ডবিধান করেন। কিন্তু এমন অনেক সময় ঘটে যেখানে ঠিক এই বিধান অনুসারে কার্য্য চলে না অথবা এই বিধানানুসারে বল কি ক্ষমা প্রযুক্ত তাহার বিচার কঠিন হইয়া পড়ে। মনে কর, কেহ আমার সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছে। আপনার সম্পত্তি উদ্ধার সামাজিক ধর্ম্ম। যদি সকলেই আপনার সম্পত্তি উদ্ধারে পরাঙ্মুখ হয়, তবে সমাজ অচিরে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। অতএব অপহৃত সম্পত্তির উদ্ধার করিতে হইবে। এখনকার দিনে সভ্যসমাজ সকলে, আইন আদালতের সাহায্যে, আমরা আপন আপন সম্পত্তির উদ্ধার করিতে পারি। কিন্তু যদি এমন ঘটে, যে আইন আদালতের সাহায্য প্রাপ্য নহে, সেখানে বলপ্রয়োগ ধর্ম্মসঙ্গত কি না? বল ও ক্ষমার সামঞ্জস্য সম্বন্ধে এই সকল কূটতর্ক উঠিয়া থাকে। কার্য্যতঃ প্রায় এই দেখিতে পাই, যে যে বলবান, সে বলপ্রয়োগের দিকেই যায়; যে দুর্ব্বল সে ক্ষমার দিকেই যায়। কিন্তু যে বলবান অথচ ক্ষমাবান, তাহার কি করা কর্ত্তব্য? অর্থাৎ আদর্শ পুরুষের এরূপ স্থলে কি কর্ত্তব্য? তাহার মীমাংসা উদ্যোগ পর্ব্বের আরম্ভেই আমরা কৃষ্ণবাক্যে পাইতেছি।

ভরসা করি পাঠকেরা সকলেই জানেন, যে পাণ্ডবেরা দ্যূতক্রীড়ায় শকুনির নিকট হারিয়া এই পণে বাধ্য হইয়াছিলেন, যে আপনাদিগের রাজ্য দুর্য্যোধনকে সম্প্রদান করিয়া দ্বাদশ বর্ষ বনবাস করিবেন; তৎপরে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবেন; যদি অজ্ঞাতবাসের ঐ এক বৎসরের মধ্যে কেহ তাহাদিগের পরিচয় পান, তবে তাহারা রাজ্য পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইবেন না, পুনর্ব্বার দ্বাদশ বর্ষ জন্য বনগমন করিবেন। কিন্তু যদি কেহ পরিচয় না পায়, তবে তাঁহারা দুর্য্যোধনের নিকট আপনাদিগের রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। এক্ষণে তাঁহারা দ্বাদশ বর্ষ বনবাস সম্পূর্ণ করিয়া বিরাট রাজের পুরী মধ্যে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস সম্পন্ন করিয়াছেন; ঐ বৎসরের মধ্যে কেহ তাঁহাদিগের পরিচয় পায় নাই। অতএব তাঁহারা দুর্য্যোধনের

নিকট আপনাদিগের রাজ্য পাইবার ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ অধিকারী। কিন্তু দুর্য্যোধন রাজ্য ফিরাইয়া দিবে কি? না দিবারই সম্ভাবনা। যদি না দেয় তবে কি করা কর্ত্তব্য? যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বধ করিয়া রাজ্যের পুনরুদ্ধার করা কর্ত্তব্য কি না?

অজ্ঞাতবাসের বৎসর অতীত হইলে পাণ্ডবেরা বিরাট রাজের নিকট পরিচিত হইলেন। বিরাটরাজ তাঁহাদিগের পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া আপনার কন্যা উত্তরাকে অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যুকে সম্প্রদান করিলেন। সেই বিবাহ দিতে অভিমন্যুর মাতুল কৃষ্ণ ও বলদেব ও অন্যান্য যাদবেরা আসিয়াছিলেন। এবং পাণ্ডবদিগের শ্বশুর দ্রুপদ এবং অন্যান্য কুটুম্বগণও আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে বিরাট রাজের সভায় আসীন হইলে পাণ্ডব রাজ্যের পুনরুদ্ধার প্রসঙ্গটা উত্থাপিত হইল। নৃপতিগণ "শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।" তখন শ্রীকৃষ্ণ রাজাদিগকে সম্বোধন করিয়া অবস্থা সকল বুঝাইয়া বলিলেন। যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহা বুঝাইয়া তারপর বলিলেন, "এক্ষণে কৌরব ও পাণ্ডবগণের পক্ষে যাহা হিতকর, ধর্ম্ম্য, যশস্করও উপযুক্ত, আপনারা তাহাই চিন্তা করুন।"

কৃষ্ণ এমন কথা বলিলেন না, যে যাহাতে রাজ্যের পুনরুদ্ধার হয়, তাহারই চেষ্টা করুন। কেননা হিত, ধর্ম্ম, যশ হইতে বিচ্ছিন্ন যে রাজ্য তাহা তিনি কাহারও প্রার্থনীয় বিবেচনা করেন না। তাই পুনর্ব্বার বুঝাইয়া বলিতেছেন, "ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অধর্ম্মাগত সুরসাম্রাজ্য ও কামনা করেন না, কিন্তু ধর্ম্মার্থ সংযুক্ত একটী গ্রামের আধিপত্যেও অধিকতর অভিলাষী হইয়া থাকেন।" আমরা পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি, যে আদর্শ মনুষ্য সন্ন্যাসী হইলে চলিবে না—বিষয়ী হইতে হইবে। বিষয়ীর এই প্রকৃত আদর্শ। অধর্ম্মাগত সুরসাম্রাজ্য ও কামনা করিব না, কিন্তু ধর্ম্মতঃ আমি যাহার অধিকারী, তাহার এক তিলও বঞ্চককে ছাড়িয়া দিব না; ছাড়িলে কেবল আমি একা দুঃখী হইব, এমন নহে, আমি দুঃখী না হইতেও পারি, কিন্তু সমাজ বিধ্বংশের পথাবলম্বনরূপ পাপ আমাকে স্পর্শ করিবে।

তার পর কৃষ্ণ কৌরবদিগের লোভ ও শঠতা, যুধিষ্ঠিরের ধার্ম্মিকতা এবং ইহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ বিবেচনা করত ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণ করিতে

রাজগণকে অনুরোধ করিলেন। নিজের অভিপ্রায়ও কিছু ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন, যাহাতে দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করেন—এইরূপ সন্ধির নিমিত্ত কোন ধার্ম্মিক পুরুষ দূত হইয়া তাহার নিকট গমন করুন। কৃষ্ণের অভিপ্রায় যুদ্ধ নহে, সন্ধি। তিনি এতদূর যুদ্ধের বিরুদ্ধ যে অর্দ্ধরাজ্য মাত্র প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট থাকিয়া সন্ধিস্থাপন করিতে পরামর্শ দিলেন, এবং শেষ যখন যুদ্ধ অলঙ্ঘনীয় হইয়া উঠিল, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি সে যুদ্ধে স্বয়ং অস্ত্রধারণ করিয়া নরশোণিতস্রোত বৃদ্ধি করিবেন না।

কৃষ্ণের বাক্যাবসানে বলদেব তাঁহার বাক্যের অনুমোদন করিলেন, যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ার জন্য কিছু নিন্দা করিলেন, এবং শেষে বলিলেন, যে সন্ধিদ্বারা সম্পাদিত অর্থই অর্থকর হইয়া থাকে, কিন্তু যে অর্থ সংগ্রাম দ্বারা উপার্জ্জিত তাহা অর্থই নহে। সুরাপায়ী বলদেবের এই কথাগুলি সোণার অক্ষরে লিখিয়া ইউরোপের ঘরে ঘরে রাখিলে মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল হইতে পারে।

বলদেবের কথা সমাপ্ত হইলে সাত্যকি গাত্রোত্থান করিয়া (পাঠক দেখিবেন, সে কালেও "parliamentary procedure" ছিল) প্রতিবক্তৃতা করিলেন। সাত্যকি নিজে মহা বলবান বীরপুরুষ, তিনি কৃষ্ণের শিষ্য এবং মহাভারতের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষীয় বীরদিগের মধ্যে অর্জ্জুন ও অভিমন্যুর পরেই তাঁহার প্রশংসা দেখা যায়। কৃষ্ণ সন্ধির প্রস্তাব করায় সাত্যকি কিছু বলিতে সাহস করেন নাই, বলদেবের মুখে ঐ কথা শুনিয়া সাত্যকি ক্রুদ্ধ হইয়া বলদেবকে ক্লীব ও কাপুরুষ ইত্যাদি বাক্যে অপমানিত করিলেন। দ্যূতক্রীড়ার জন্য বলদেব যুধিষ্ঠিরকে যে টুকু দোষ দিয়াছিলেন, সাত্যকি তাহার প্রতিবাদ করিলেন, এবং আপনার অভিপ্রায় এই প্রকাশ করিলেন যে যদি কৌরবেরা পাণ্ডবদিগকে তাহাদের পৈত্রিক রাজ্য সমস্ত প্রত্যর্পণ না করেন, তবে কৌরবদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করাই কর্ত্তব্য।

তার পর বৃদ্ধ দ্রুপদের বক্তৃতা। দ্রুপদ ও সাত্যকির মতাবলম্বী। তিনি যুদ্ধার্থ উদ্যোগ করিতে, সৈন্য সংগ্রহ করিতে, এবং মিত্ররাজগণের নিকট দূত প্রেরণ করিতে পাণ্ডবগণকে পরামর্শ দিলেন। তবে তিনি এমনও বলিলেন, যে দুর্য্যোধনের নিকটেও দূত প্রেরণ করা হউক।

পরিশেষে কৃষ্ণ পুনর্ব্বার বক্তৃতা করিলেন। দ্রুপদ প্রাচীন এবং সম্বন্ধে গুরুতর, এই জন্য কৃষ্ণ স্পষ্টতঃ তাঁহার কথায় বিরোধ করিলেন না। কিন্তু এমন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, যে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তিনি স্বয়ং সে যুদ্ধে নির্লিপ্ত থাকিতে ইচ্ছা করেন। তিনি বলিলেন, "কুরু ও পাণ্ডবদিগের সহিত আমাদিগের তুল্য সম্বন্ধ, তাঁহারা কখন মর্য্যাদালঙ্ঘন পূর্ব্বক আমাদিগের সহিত অশিষ্ট ব্যবহার করেন নাই। আমরা বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া এ স্থানে আগমন করিয়াছি, এবং আপনিও সেই নিমিত্ত আসিয়াছেন। এক্ষণে বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে, আমরা পরমাহ্লাদে নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন করিব।" গুরুজনকে ইহার পর আর কি ভর্ৎসনা করা যাইতে পারে? কৃষ্ণ আরও বলিলেন, যে যদি দুর্য্যোধন সন্ধি না করে, "তাহা হইলে অগ্রে অন্যান্য ব্যক্তিদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া পশ্চাৎ আমাদিগকে আহ্বান করিবেন," অর্থাৎ "এ যুদ্ধে আসিতে আমাদিগের বড় ইচ্ছা নাই।" এই কথা বলিয়া কৃষ্ণ দ্বারকা চলিয়া গেলেন।

আমরা দেখিলাম যে কৃষ্ণ যুদ্ধের নিতান্ত বিপক্ষ, এমন কি তজ্জন্য অর্দ্ধরাজ্য পরিত্যাগেও পাণ্ডবদিগকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। আরও দেখিলাম, যে তিনি কৌরবপাণ্ডবদিগের মধ্যে পক্ষপাত শূন্য উভয়ের সহিত তাহার তুল্য সম্বন্ধ স্বীকার করেন। পরে যাহা ঘটিল তাহাতে এই দুই কথারই আরও বলবৎ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

এদিকে উভয় পক্ষে যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে লাগিল। সেনা সংগৃহীত হইতে লাগিল, এবং রাজগণের নিকট দূত গমন করিতে লাগিল। কৃষ্ণকে যুদ্ধে বরণ করিবার জন্য অর্জ্জুন স্বয়ং দ্বারকায় গেলেন। দুর্য্যোধনও তাই করিলেন। দুইজনে একদিনে এক সময়ে কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহার পর যাহা ঘটিল মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"বাসুদেব তৎকালে শয়ান ও নিদ্রাভিভূত ছিলেন। প্রথমে রাজা দুর্য্যোধন তাঁহার শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার মস্তক সমীপন্যস্ত প্রশস্ত আসনে উপবেশন করিলেন। ইন্দ্রনন্দন পশ্চাৎ প্রবেশ পূর্ব্বক বিনীত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া যাদবপতির পদতলসমীপে সমাসীন হইলেন। অনন্তর বৃষ্ণিনন্দন জাগরিত হইয়া অগ্রে ধনঞ্জয় পরে দুর্য্যোধনকে নয়নগোচর করিয়া-

মাত্র স্বাগত প্রশ্ন সহকারে সৎকারপূর্ব্বক আগমন হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন।

দুর্য্যোধন সহাস্য বদনে কহিলেন, "হে যাদব! এই উপস্থিত যুদ্ধে আপনাকে সাহায্য দান করিতে হইবে। যদিও আপনার সহিত আমাদের উভয়েরই সমান সম্বন্ধ ও তুল্য সৌহৃদ্য; তথাপি আমি অগ্রে আগমন করিয়াছি। সাধুগণ প্রথমাগত ব্যক্তির পক্ষই অবলম্বন করিয়া থাকেন; আপনি সাধুগণের শ্রেষ্ঠ ও মাননীয়; অতএব অদ্য সেই সদাচার প্রতিপালন করুন।"

কৃষ্ণ কহিলেন, হে কুরুবীর! আপনি যে অগ্রে আগমন করিয়াছেন, এ বিষয়ে আমার কিছু মাত্র সংশয় নাই; কিন্তু আমি কুন্তীকুমারকে অগ্রে নয়নগোচর করিয়াছি, এই নিমিত্ত আমি আপনাদের উভয়কেই সাহায্য করিব। কিন্তু ইহা প্রসিদ্ধ আছে, অগ্রে বালকেরই বরণ করিবে, অতএব অগ্রে কুন্তীকুমারের বরণ করাই উচিত। এই বলিয়া ভগবান যদুনন্দন ধনঞ্জয়কে কহিলেন। হে কৌন্তেয়! অগ্রে তোমারই বরণ গ্রহণ করিব। আমার সমযোদ্ধা নারায়ণ নামে এক অর্ব্বুদ গোপ, এক পক্ষের সৈনিক পদ গ্রহণ করুক। আর অন্য পক্ষে আমি সমর পরাঙ্মুখ ও নিরস্ত্র হইয়া অবস্থান করি, ইহার মধ্যে যে পক্ষ তোমার হৃদ্যতর, তাঁহাই অবলম্বন কর।

ধনঞ্জয় অরাতিমর্দ্দন জনার্দ্দন সমর পরাঙমুখ হইবেন, শ্রবণ করিয়াও তাঁহাকে বরণ করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন অর্ব্বুদ নারায়ণী সেনা প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণকে সমরে পরাঙমুখ বিবেচনা করতঃ প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন।"

উদ্যোগ পর্ব্বে এই অংশ সমালোচন করিয়া আমরা এই কয়টী কথা বুঝিতে পারি।

প্রথম যদিও কৃষ্ণের অভিপ্রায় যে কাহারও আপনার ধর্ম্মার্থ সংযুক্ত অধিকার পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে, তথাপি বলের অপেক্ষা ক্ষমা তাঁহার বিবেচনায় এত দূর উৎকৃষ্ট যে বল প্রয়োগ করার অপেক্ষা অর্দ্ধেক অধিকার পরিত্যাগ করাও ভাল।

দ্বিতীয়—কৃষ্ণ সর্ব্বত্র সমদর্শী। সাধারণ বিশ্বাস এই যে, তিনি পাণ্ডবদিগের পক্ষ, এবং কৌরবদিগের বিপক্ষ। উপরে দেখা গেল যে, তিনি উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে পক্ষপাতশূন্য।

তৃতীয়—তিনি স্বয়ং অদ্বিতীয় বীর হইয়াও যুদ্ধের প্রতি বিশেষ প্রকারে বিরাগযুক্ত। প্রথমে যাহাতে যুদ্ধ না হয়, এইরূপ পরামর্শ দিলেন, তার পর যখন যুদ্ধ নিতান্তই উপস্থিত হইল, এবং অগত্যা তাঁহাকে একপক্ষে বরণ হইতে হইল, তখন তিনি অস্ত্র ত্যাগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বরণ হইলেন। এরূপ মাহাত্ম্য আর কোন ক্ষত্রিয়েরই দেখা যায় না, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্ব্বত্যাগী ভীষ্মেরও নহে।

আমরা দেখিব, যে যাহাতে যুদ্ধ না হয়, তজ্জন্য কৃষ্ণ ইহার পরেও অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যিনি সকল ক্ষত্রিয়ের মধ্যে যুদ্ধের প্রধান শত্রু, এবং যিনি একাই সর্ব্বত্র সমদর্শী, লোকে তাঁহাকেই এই যুদ্ধের প্রধান পরামর্শদাতা অনুষ্ঠাতা এবং পাণ্ডব পক্ষের প্রধান কুচক্রী বলিয়া স্থির করিয়াছে। কাজেই এত সবিস্তারে কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনার প্রয়োজন হইয়াছে।

তার পর, নিরস্ত্র কৃষ্ণকে লইয়া অর্জ্জুন যুদ্ধের কোন্ কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন, ইহা চিন্তা করিয়া, কৃষ্ণকে তাঁহার সারথ্য করিতে অনুরোধ করিলেন। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সারথ্য অতি হেয় কার্য্য। যখন মদ্ররাজ শল্য কর্ণের সারথ্য করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন তিনি বড় রাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু আদর্শপুরুষ অহঙ্কারশূন্য। অতএব কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথ্য তখনই স্বীকার করিলেন। তিনি সর্ব্বদোষশূন্য এবং সর্ব্বগুণান্বিত।

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা।

মহাভারতের উপর নির্ভর করিয়া কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনা করিবার সময়ে—একটা তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করা চাই—মহাভারতের ঐতিহাসিকতা কিছু আছে কি? মহাভারতকে ইতিহাস বলে, কিন্তু ইতিহাস বলিয়াই কি Historyই বুঝাইল? ইতিহাস কাহাকে বলে? এখনকার দিনে শৃগাল

কুকুরের গল্প লিখিয়াও লোকে তাহাকে "ইতিহাস" নাম দিয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ যাহাতে পুরাবৃত্ত, অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছে তাহারই আবৃত্তি আছে, তাহা ভিন্ন আর কিছুকেই ইতিহাস বলা যাইতে পারে না—

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্।
পূর্ব্ববৃত্ত কথাযুক্তমিতিহাস প্রচক্ষতে॥

এখন, ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থ সকলের মধ্যে কেবল মহাভারতই ইতিহাস নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। (রামায়ণকে আখ্যান বলিয়া থাকে।) যেখানে মহাভারত একাই ইতিহাস পদে বাচ্য, যখন অন্ততঃ রামায়ণ ভিন্ন আর কোন গ্রন্থই এই নাম প্রাপ্ত হয় নাই; তখন বিবেচনা করিতে হইবে যে ইহার বিশেষ ঐতিহাসিকতা আছে বলিয়াই এরূপ হইয়াছে।

সত্য বটে যে, মহাভারতে এমন বিস্তর কথা আছে যে তাহা স্পষ্টতঃ অলীক, অসম্ভব, অনৈতিহাসিক। সেই সকল কথা গুলি অলীক ও অনৈতিহাসিক বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারি। কিন্তু যে অংশে এমন কিছুই নাই, যে তাহা হইতে ঐ অংশ অলীক বা অনৈতিহাসিক বিবেচনা করা যায় সে অংশগুলি অনৈতিহাসিক বলিয়া কেন পরিত্যাগ করিব? সকল জাতির মধ্যে, প্রাচীন ইতিহাসে এইরূপ ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক, সত্যে ও মিথ্যায় মিশিয়া গিয়াছে। রোমক ইতিহাসবেত্তা লিবি প্রভৃতি, যবন ইতিহাসবেত্তা হেরোডোটস্ প্রভৃতি, মুসলমান ইতিহাসবেত্তা ফেরেশ্তা প্রভৃতি এইরূপ ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের সঙ্গে অনৈসর্গিক এবং অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত মিশাইয়াছেন। তাঁহাদিগের গ্রন্থ সকল ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে—মহাভারতই অনৈতিহাসিক বলিয়া একেবারে পরিত্যক্ত হইবে কেন?

এখনও ইহা স্বীকার করা যাউক, যে ঐ সকল ভিন্ন দেশীয় ইতিহাস গ্রন্থের অপেক্ষা মহাভারতে অনৈসর্গিক ঘটনার বাহুল্য অধিক। তাহাতেও, যে টুকু নৈসর্গিক ও সম্ভব ব্যাপারের ইতিবৃত্ত সে টুকু গ্রহণ করিবার কোন আপত্তি দেখা যায় না। মহাভারতে যে অন্য দেশের প্রাচীন ইতিহাসের অপেক্ষা কিছু বেশী কাল্পনিক ব্যাপারের বাহুল্য আছে, তাহার বিশেষ কারণও আছে। ইতিহাস গ্রন্থে দুই কারণে অনৈসর্গিক বা মিথ্যা ঘটনা সকল স্থান পায়। প্রথম, লেখক জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া, সেই

সকলকে সত্য বিবেচনা করিয়া তাহা গ্রন্থে ভুক্ত করেন। দ্বিতীয়, তাঁহার গ্রন্থ প্রচারের পর, পরবর্ত্তী লেখকেরা আপনাদিগের রচনা পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকের রচনা মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করে। প্রথম কারণে সকল দেশের প্রাচীন ইতিহাস কাল্পনিক ব্যাপারের সংস্পর্শে দূষিত হইয়াছে—মহাভারতেও সেরূপ ঘটিয়া থাকিবে। কিন্তু দ্বিতীয় কারণটি অন্য দেশের ইতিহাস গ্রন্থে সেরূপ প্রবলতা প্রাপ্ত হয় নাই—মহাভারতকেই বিশেষ প্রকারে অধিকার করিয়াছে। তাহার তিনটি কারণ আছে।

প্রথম কারণ এই অন্যান্য দেশে যখন ঐ সকল প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণীত হয়, তখন প্রায়ই সে সকল দেশে গ্রন্থ সকল লিখিত করিবার প্রথা চলিয়াছে। গ্রন্থ লিখিত হইলে তাহাতে পরবর্ত্তী লেখকেরা স্বীয় রচনা প্রক্ষিপ্ত করিবার বড় সুবিধা পান না—প্রক্ষিপ্ত রচনা শীঘ্র ধরা পড়ে। কিন্তু ভারতবর্ষে গ্রন্থ সকল প্রণীত হইয়া মুখে মুখে প্রচারিত হইত, লিপি বিদ্যা প্রচলিত হইলে পরেও গ্রন্থ সকল পূর্ব্ব প্রথানুসারে গুরু শিষ্য পরম্পরা মুখে মুখেই প্রচারিত হইত। তাহাতে তন্মধ্যে প্রক্ষিপ্ত রচনা প্রবেশ করিবার বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছিল।

দ্বিতীয় কারণ এই, যে রোম গ্রীশ বা অন্য কোন দেশে কোন ইতিহাস গ্রন্থ, মহাভারতের ন্যায় জনসমাজে আদর বা গৌরব প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং ভারতবর্ষীয় লেখকদিগের পক্ষে, মহাভারতে স্বীয় রচনা প্রক্ষিপ্ত করিবার যে লোভ ছিল, অন্য কোন দেশীয় লেখকদিগের সেরূপ ঘটে নাই।

তৃতীয় কারণ এই যে, অন্য দেশের লেখকেরা আপনার যশ, বা তাদৃশ অন্য কোন কামনার বশীভূত হইয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেন। কাজেই আপনার নামে আপনার রচনাপ্রচার করাই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল, পরের রচনার মধ্যে আপনার রচনা ডুবাইয়া দিয়া আপনার নাম লোপ করিবার অভিপ্রায় তাঁহাদের কখন ঘটিত না। কিন্তু ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণেরা নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম হইয়া রচনা করিতেন। লোকহিত ভিন্ন আপনাদিগের যশ তাঁহাদিগের অভিপ্রেত ছিল না। যাহাতে মহাভারতের ন্যায় লোকায়ত্ত গ্রন্থের সাহায্যে তাঁহাদিগের রচনা লোক মধ্যে বিশেষ প্রকারে প্রচারিত হইয়া লোক হিত

সাধন করে, তাঁহারা সেই চেষ্টার আপনার রচনা সকল তাদৃশ গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত করিতেন।

এই সকল কারণে মহাভারতে কাল্পনিক বৃত্তান্তের বিশেষ বাহুল্য ঘটিয়াছে। কিন্তু কাল্পনিক বৃত্তান্তের বাহুল্য আছে বলিয়া এই প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থে যে কিছুই ঐতিহাসিক কথা নাই, ইহা বলা নিতান্ত অসঙ্গত। তবে, অবশ্য এমন কথা জিজ্ঞাসা হইতে পারে, যে যে গ্রন্থে কিছু সত্য আর অনেক মিথ্যা আছে, তাহার কোন্ অংশ সত্য ও কোন্ অংশ মিথ্যা তাহা কি প্রকারে নিরূপণ করা যাইবে। সে বিচার পশ্চাৎ করা যাইতেছে।

ইউরোপিয়েরা মহাভারতকে "Epic Poem" বলিয়া থাকেন, দেখাদেখি এখনকার নব্য দেশীয়েরাও সেইরূপ বলিয়া থাকেন। এই কথা বলিলেই মহাভারতের ঐতিহাসিকতা সব উড়িয়া গেল। মহাভারত তাহা হইলে কেবল কাব্যগ্রন্থ; উহাতে আর কোন ঐতিহাসিকতা থাকিল না। এ কথারও বিচার করা যাউক।

কেন, মহাভারতকে সাহেবেরা কাব্যগ্রন্থ বলেন, তাহা আমরা ঠিক জানি না। উহা পদ্যে রচিত বলিয়া এরূপ বলা হয়, এমন হইতে পারে না, কেন না সর্ব্ব প্রকার সংস্কৃত গ্রন্থই পদ্যে রচিত;—বিজ্ঞান, দর্শন, অভিধান, জ্যোতিষ, চিকিৎসা শাস্ত্র, সকলই পদ্যে প্রণীত হইয়াছে। তবে এমন হইতে পারে, মহাভারতে কাব্যাংশ বড় সুন্দর;—ইউরোপীয় যে প্রকার সৌন্দর্য্য এপিক কাব্যের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই জাতীয় সৌন্দর্য্য উহাতে বহুল পরিমাণে আছে বলিয়া, উহাকে এপিক বলেন। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ জাতীয় সৌন্দর্য্য অনেক ইউরোপীয় মৌলিক ইতিহাসেও আছে। ইংরেজের মধ্যে মেকলে, কার্লাইল ও ফ্রুদের গ্রন্থে, ফরাসীদিগের মধ্যে লামার্তীন ও মিশালার গ্রন্থে, গ্রীকদিগের মধ্যে থুকিদিদিসের গ্রন্থে, এবং অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থে আছে। মানবচরিত্রই কাব্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান; ইতিহাসবেত্তাও মনুষ্য চরিত্রের বর্ণন করেন; ভাল করিয়া তিনি যদি আপনার কার্য্য সাধন করিতে পারেন, তবে কাজেই তাঁহার ইতিহাসে কাব্যের সৌন্দর্য্য আসিয়া উপস্থিত হইবে। সৌন্দর্য্য হেতু ঐ সকল গ্রন্থ অনৈতিহাসিক বলিয়া পরিত্যক্ত হয় নাই;

মহাভারতত্ত্বও হইতে পারে না। মহাভারতে যে সে সৌন্দর্য্য অধিক পরিমাণে ঘটিয়াছে, তাহার বিশেষ কারণও আছে। তাহা স্থানান্তরে বুঝান গিয়াছে।

স্থূলকথা, এই প্রসিদ্ধ ইতিহাস মূলতঃ যে ঐতিহাসিক নহে, এমন বিবেচনা করিবার কোন উপযুক্ত কারণ কেহ নির্দ্দেশ করেন নাই; এবং নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে এমনও বিবেচনা হয় না।

যদি মহাভারতের কোন অংশের ঐতিহাসিকতা থাকে তবে কৃষ্ণেরও ঐতিহাসিকতা আছে।

মহাভারতের কোন অংশ অনৈতিহাসিক, বা প্রক্ষিপ্ত, তাহা নিরূপণ করিবার কি কি উপায় আছে? তাহা আমরা সময়ে সময়ে বুঝাইয়াছি। এক্ষণে পাঠকের বিচার সাহায্যের জন্য একত্রিত করিয়া দিতেছি।

(১) যাহা অনৈতিহাসিক, স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধ, তাহা প্রক্ষিপ্ত হউক বা না হউক, তাহা অনৈতিহাসিক বলিয়া ত্যাগ করাই উচিত।

(২) যদি দেখি যে কোন ঘটনা দুইবার বা ততোধিক বার বিবৃত হইয়াছে, অথচ দুটি বিবরণই পরস্পর বিরোধী, তবে তাহার মধ্যে একটি প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করা উচিত। কোন লেখকই অনর্থক পুনরুক্তি, এবং অনর্থক পুনরুক্তির দ্বারা আত্মবিরোধ উপস্থিত করেন না। অনবধানতা বা অক্ষমতা বশতঃ যে পুনরুক্তি বা আত্মবিরোধ উপস্থিত হয়, সে স্বতন্ত্র কথা। তাহাও অনায়াসে নির্ব্বাচন করা যায়।

৩। সুকবিদিগের রচনাপ্রণালীতে প্রায়ই কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ থাকে। মহাভারতের কতকগুলি এমন অংশ আছে যে তাহার মৌলিকতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইতে পারে না—কেন না তাহার অভাবে মহাভারতের মহাভারতত্ব থাকে না। দেখা যায়, যে সে গুলির রচনাপ্রণালী সর্ব্বত্র এক প্রকার লক্ষণ বিশিষ্ট। যদি আর কোন অংশের রচনা এরূপ দেখা যায়, যে সেই সেই লক্ষণ তাহাতে নাই, এবং এমন সকল লক্ষণ আছে যে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সকলের সঙ্গে অসঙ্গত, তবে সেই অসঙ্গতলক্ষণযুক্ত রচনাকে প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার কারণ উপস্থিত হয়।

(৪) মহাভারতের কবি একজন শ্রেষ্ঠ কবি, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। শ্রেষ্ঠ কবিদিগের বর্ণিত চরিত্র গুলির সর্ব্বাংশ পরস্পর সুসঙ্গত হয়। যদি

কোথাও তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, তবে সে অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারে। যদি মনে কর কোন হস্তলিখিত মহাভারতের কাপিতে দেখি যে স্থান বিশেষে ভীষ্মের পরদারপরায়ণতা বা ভীমের ভীরুতা বর্ণিত হইতেছে, তবে জানিব যে ঐ অংশ প্রক্ষিপ্ত।

(৫) যাহা অপ্রাসঙ্গিক, তাহা প্রক্ষিপ্ত হইলেও হইতে পারে, না হইলেও হইতে পারে। কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে যদি পূর্ব্বোক্ত চারিটি লক্ষণের মধ্যে কোন লক্ষণ দেখিতে পাই, তবে তাহা প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার কারণ আছে।

এখন এই পর্য্যন্ত বুঝান গেল। নির্ব্বাচন বিচার প্রণালী ক্রমশঃ স্পষ্টতর করা যাইবে।

কো তুঁহু!

কো তুঁহু বোলবি মোয়!
হৃদয় মাহ মঝু জাগসি অনুখণ,
আঁখ উপর তুঁহু রচলহিঁ আসন,
অরুণ-নয়ন তব মরম-সঙে মম
নিমিখ ন অন্তর হোয়,
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

হৃদয় কমল, তব চরণে টলমল,
নয়ন যুগল মম উছলে ছলছল,
প্রেমপূর্ণ তনু পুলকে ঢলঢল,
চাহে মিলাইতে তোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

বাঁশরি-ধ্বনি তুহ অমিয়-গরল রে
হৃদয় বিদারয়ি হৃদয় হরল রে,
আকুল কাকলি ভুবন ভরল রে,
উতল প্রাণ উতরোয়—
কো তুঁহু বোলবি মোয় !

হেরি হাসি তব মধুঋতু ধাওল,
শুনয়ি বাঁশি তব পিককুল গাওল,
বিকল ভ্রমর সম ত্রিভুবন আওল
চরণ কমলযুগ ছোঁয়—
কো তুঁহু বোলবি মোয় !

গোপবধূজন বিকশিত-যৌবন,
পুলকিত যমুনা, মুকুলিত উপবন,
নীল নীর পর ধীর সমীরণ
পলকে প্রাণ মন খোয়—
কো তুঁহু বোলবি মোয় !

তৃষিত আঁখি, তব মুখ পর বিহরই,
মধুর পরশ তব, রাধা শিহরই,
প্রেমরতন ভরি হৃদয় প্রাণ লই,
পদতলে আপনা থোয়—
কো তুঁহু বোলবি মোয় !

কো তুঁহু কো তুঁহু সব জন পুছই,
অনুখণ সঘন নয়ন জল মুছই,
যাচে ভানু, সব সংশয় ঘুচয়ি
জনম চরণ পর গোয়—
কো তুঁহু বোলবি মোয় !

আর আধখানা কোথায় ?

এই পৃথিবীতে আসিয়া যেন কি হারাইয়াছি, সদাই যেন সেই হারাণ ধনের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে, সদাই যেন কাহাকে খুঁজিতেছি কিন্তু কি যে হারাইয়াছি আর কাহাকেই বা খুঁজিতেছি তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। মনের এই ব্যকুলতা ঘুচাইবার জন্য—অন্তরের শান্তি লাভের জন্য সংসার সাগরে কতই ডুব দিতেছি কিন্তু অন্তরের সেই জ্বালা কিছুতেই থামে না। এক একবার কাতরভাবে রোদন করি কিন্তু যাহাকে ডাকিতেছি আমার কান্না তাহার কাছে পৌঁছে না। আমি কাহার জন্য বা কিসের জন্য এত ব্যাকুল তোমরা কেহ বুঝাইয়া দিতে পার ?

কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী একদিন বলিয়াছেন যে এ জগতে তিনি একা, জগতের কোন পদার্থে তিনি তাঁহার মন বাঁধেন নাই—তাই তাঁহার মন সদাই উড়িয়া যায়, তাই তিনি কখন সুখী হন নাই ; তাঁর কথা শুনিয়া মনে করিয়াছিলাম এক জায়গায় মন বাঁধিয়া রাখিব, তাহা হইলেই যাহা খুঁজি পাইব, কিন্তু মন আমার কিছুতেই বাঁধা থাকিতে চায় না ; আমিও জোর করে মনের স্বাধীনতা হরণ করতে বড় রাজি নহি। মন যখন পার্থিব কোন পদার্থেই বাঁধা থাকিতে চায় না, তবে আমার মন কাহাকে খুঁজিয়া বেড়ায় এই একটি আমার প্রধান ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে।

কমলাকান্ত বলিয়াছেন যে তিনি একা, আমি ভাবি আমি একা নই। আমি আধখানা। আমার একটা আদৎ দেহ আছে বটে, কিন্তু মনটা আমার আধখানা। এই জগতে আমার মনের অপরার্দ্ধ কোথাও না কোথাও আছে ; আমার এই আধখানা মন অপর আধখানা মনের সহিত মিশিতে চায়, যত দিন না এই দুই আধখানায় মিশিয়া পূরা হইবে ততদিন অন্তরের ব্যাকুলতা কিছুতেই ঘুচিবে না। আমার অসম্পূর্ণ মন পূর্ণ হইবার জন্য ব্যাকুল রহিয়াছে, সুতরাং আমি যদি উহাকে রূপরসাদি পার্থিব বিষয়ে উহাকে বাঁধিয়া রাখিতে চাই তবে সে বাঁধনে মন ত কখনই সন্তুষ্ট হইবে না ; আমি

আর আমার মনকে কোথাও বাঁধিয়া রাখিতে চাই না। যাও মন তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম, যেখানে তোমার অভিমত পদার্থ আছে তুমি সেইখানে চলিয়া যাও, একবার খুঁজিয়া বলিয়া দাও দেখি, সেই অপরার্দ্ধ কোথায় এবং কি ভাবে থাকে—একবার তাহাকে চিনাইয়া দাও; আর আমি তোমার নিকট হইতে কিছুই চাহিব না। আমার মন, মন চায়; অন্য পদার্থে বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেও, বাঁধা থাকিতে চায় না। মনের স্রোত মনের সমুদ্রে মিশিতে চায়, আমার ভিতরকার মন, বাহিরে মনের সহিত মিশিতে চায়। কিন্তু আমার ইন্দ্রিয়গুলি উহাকে তাহাদের ভিতর বদ্ধ করিয়া রাখিতে চায়, তাই আমার ভিতরে এত গোলমাল, এত কলকল নাদ। আমি এত দিন না বুঝিয়া ইন্দ্রিয় সকলের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলাম এইবার হইতে মনের পক্ষ অবলম্বন করিব মনস্থ করিলাম।

আমার ভিতরকার মন আধখানা, বাহিরে উহার অপরার্দ্ধ রহিয়াছে, তাই তাহার সহিত মিশিবার জন্য সদাই বাহিরে আসিতে চায়। কিন্তু একটি বড় গোল উপস্থিত হইয়াছে। যাহা অসম্পূর্ণ তাহাই কুৎসিৎ; যাহা কুৎসিৎ তাহাকে আমার বলিয়া বাহিরে প্রকাশ করিতে বড়ই সংকোচ হয়। সেই জন্য যদি বা কখন মনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া মনকে বাহিরে ছাড়িয়া দিতে চাই, তখন উহাতে এমনি একটি আবরণ দিয়া বাহির করিতে যাই যে লোকে উহাকে কুৎসিৎ বলিয়া আমাকে ঘৃণা না করে। এই লোকলজ্জার খাতিরে পড়িয়া, পরনিন্দার ভয়ে ভীত হইয়া, আমার আধখানা মনকে যথাবৎ প্রকাশ করিতে পারিলাম না। আমার বাহিরের মন, ভিতরকার মনের ঐ আবরণে ঠেকিয়া ভিতরকার মনের সহিত মিশিতে পারিল না, আমিও অন্তরের শান্তি কখন পাইলাম না।

তোমাদের পৃথিবীতে সত্যের আদর নাই, তাই তোমাদের পৃথিবীর সঙ্গে আমার বড় বনে না। আমি যদি আমার ভিতরকার মনকে উলঙ্গ অবস্থায় বাহিরে প্রকাশ করিতে যাই তবেই আমি তোমাদের কাছে হাস্যাস্পদ হইব; তোমরা আমাকে হয়ত মনুষ্যসমাজ হইতে দূর করিয়া দিবে—তোমরা সত্যের আদর জান না, তাই আমি সত্যাচারী হইতে পারি নাই। তোমরা সকলেই কপটাচারী হইয়া আমাকেও কপটাচারী করিয়াছ। সেই

জন্যই আমার ভিতরকার মন আমার বাহিরের মনের সহিত মিশিতে পারিতেছে না—তাই আমার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা কখন পূর্ণ হইতেছে না। হৃদয়ের দ্বার একেবারে উন্মোচন করিয়া অন্তরের ভাব যথাবৎ বাহিরে প্রকাশ করিয়া সত্যের সহায় লইয়া পূর্ণ হইবে, এই অভিলাষটি বড়ই প্রবল হইয়াছে—কিন্তু আমার এ অভিলাষ কি পূর্ণ হইবে? সত্যের আদর জানে এমন লোক কি তোমাদের পৃথিবীতে কেহই নাই? অন্তর্জগৎ আর বহির্জগৎ, এর মধ্যে যতদিন আবরণ রাখিবে ততদিন শান্তি মিলিবে না। যাঁহার প্রেমে মত্ত হইলে এই আবরণটি ঘুচিয়া যায় তাঁহাকেই আমি শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বুঝি। যিনি সত্যের উপাসক তাঁহাকেই আমি কৃষ্ণোপাসক বলিয়া বুঝি। গোপীগণের বস্ত্র হরণে যিনি মন্দরুচি দেখেন দেখুন, কিন্তু আমি উহার ভিতর একটি বড় সুন্দর ভাব দেখিতে পাই। অন্তরকে আবরণ শূন্য না করিলে কৃষ্ণের সহিত মিশা যায় না।

যতদিন আমার ভিতরের এই আধখানা মন বাহিরের অপরার্দ্ধের সহিত না মিশিবে তত দিন আমি অসম্পূর্ণ, তত দিন আমি কুৎসিৎ, তত দিন আমি সকাম; আমার এই সকাম মনকে যিনি নিষ্কাম করিতে সক্ষম তিনিই আমার হৃদয়ের সখা—তিনিই আমার শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণ কথায় তোমরা কি অর্থ বুঝ আমি জানি না, কিন্তু আমি এই মাত্র বুঝি যে যিনি নিষ্কাম ধর্ম্মের গুরু তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণ; যিনি সত্যের পক্ষপাতী, সত্যব্রতাবলম্বী ঘোর পাপীও যাঁহার ভালবাসার পাত্র, যাঁহার কাছে সত্যই ধর্ম্ম, লোকনিন্দা লোক লজ্জায় যিনি কখন ব্যথিত নহেন, আমার মন হাজার কুৎসিৎ হইলেও যিনি আমার উন্মুক্ত হৃদয়ে প্রবেশ করিতে কুণ্ঠিত নহেন, যাঁহাকে আমি অকাতরে আমার উলঙ্গ মন সমর্পণ করিতে পারি এবং যিনি আমার সেই মন লইয়া তাহার অভাব পূরণ করিয়া দিয়া কুৎসিৎকে সুন্দর করিতে পারেন তিনিই আমার হৃদয়-বন্ধু। কোথায়—আমার সেই হৃদয়-বন্ধু কোথায়!

দেশীয়

নব্য সমাজের স্থিতি ও গতি।

আজিকার দিনে, এ দেশে যত কথার আন্দোলন হইতে পারে, তন্মধ্যে সামাজিক স্থিতি ও গতিই সকলের অপেক্ষা গুরুতর। আর সকল তত্ত্বই ইহার অন্তর্গত। বড় আহ্লাদের বিষয়, যে এই সম্বন্ধে দুই জন মহাত্মা প্রণীত দুইটি প্রবন্ধ, এই সময়ে কিঞ্চিৎ পৌর্ব্বপর্য্যের সহিত প্রচারিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটি প্রবন্ধ বাঙ্গালায়, আর একটি ইংরেজিতে। একটির প্রণেতা, ব্রাহ্মধর্ম্মের একজন অধিনায়ক, দ্বিতীয় লেখক এদেশে পজিটিবিজ্‌মের নেতা। উভয়েই উদার, মহদাশয়, পণ্ডিত, চিন্তাশীল, এবং ভারতবৎসল। আমরা বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত "নব্যবঙ্গের উৎপত্তি, গতি ও স্থিতি" বিষয়ক প্রবন্ধ,* ও কটন সাহেব প্রণীত "New India," নামক নব প্রচারিত পুস্তকের কথা বলিতেছি।

নব্য বঙ্গ সমাজের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার আমাদের ইচ্ছা নাই। কেন না প্রয়োজন নাই। যাহা হইয়া গিয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। স্থিতি ও গতিটা † সকলেরই বুঝিবার প্রয়োজন আছে।

স্থিতি ও গতির পরস্পর যে সম্বন্ধ, তাহা দ্বিজেন্দ্র বাবু নিম্নলিখিত কয়টি কথায় অতি বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন।

"গতি কিনা পরিবর্ত্তন। যখন গ্রীষ্ম ঋতু আইসে তখন মনে হয় যে, ইহার আর অন্ত নাই; প্রত্যহই লোকেরা তাপে জর্জ্জরিত হইয়া কায়-ক্লেশে কোন রূপে দিবা অবসান করে, কাহারো শরীরে অধিক বস্ত্র সহে না। তাহার পর যখন শীত ঋতু আইসে তখনি সমস্তই উল্‌টিয়া যায়; পূর্ব্বে লোকেরা অর্দ্ধ উলঙ্গ থাকিত, এখন বস্ত্রের বোঝা বহন করে; পূর্ব্বে জল সেবন করিত এখন অগ্নি সেবন করে; একলালে আর এককালের সকলই উল্‌টিয়া যায়। শীতকাল চলিয়া গেলেও যে ব্যক্তি অভ্যাস-গুণে শীত-বস্ত্র

---

* তত্ত্ববোধিনী, চৈত্র। † Order and Progress.

পরিধান করে সে ব্যক্তির স্বাস্থ্য অচিরে বিপদ্‌গ্রস্ত হয়। এত কাল গ্রীষ্ম চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া চিরকালই যে গ্রীষ্ম অবাধে চলিতে থাকিবে, তাহার কোন অর্থ নাই। বৎসরের যেমন কালোচিত পরিবর্ত্তন আবশ্যক, সমাজের ও সেইরূপ কালোচিত পরিবর্ত্তন আবশ্যক; এই কালোচিত পরিবর্ত্তনকেই এখানে আমরা "গতি" এই ক্ষুদ্র একরত্তি নামে নির্দ্দেশ করিতেছি। কিন্তু আর এক দিকে দেখা যায় যে, যদিও শীত কালোচিত বস্ত্র পরিধানের নিয়ম গ্রীষ্ম কালে পরিবর্ত্তন করিতে হয়, ও গ্রীষ্ম কালোচিত বস্ত্র পরিধানের নিয়ম শীত কালে পরিবর্ত্তন করিতে হয়, কিন্তু বস্ত্র পরিধানের একটি নিয়ম কোন কালেই পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায় না—সে নিয়ম এই যে, স্বাস্থ্যোপযোগী বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে। যদি বলি যে উষ্ণ বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে, তবে এ কথা গ্রীষ্মকালে খাটে না, যদি বলি যে সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে তবে এ কথা শীতকালে খাটে না; কিন্তু যদি বলি যে স্বাস্থ্যোপযোগী বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে, তবে এ কথা শীতকালে যেমন খাটে, গ্রীষ্মকালেও তেমনি খাটে, বর্ষাকালে তেমনি খাটে, কোন কালে এ কথা উল্‌টাইতে পারে না। এখানে দুইরূপ নিয়ম দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—প্রথম, কালোচিত নিয়ম কিম্বা যাথাকালিক নিয়ম। শীত বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে ইহা একটী যাথাকালিক নিয়ম, কেননা এ নিয়ম যথাকালেই খাটে, অযথা-কালে খাটে না; দ্বিতীয়, সার্ব্বকালিক নিয়ম,—স্বাস্থ্যের উপযোগী বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে—এ নিয়ম সকল কালেই খাটে। এখন আমরা এইটি বলিতে চাই যে, সমাজে যত প্রকার সামাজিক নিয়ম আছে তাহার মধ্যে যে গুলি সার্ব্বকালিক তাহার স্থায়িত্ব সমাজের স্থিতির ভিত্তি-মূল, এবং যে গুলি যাথাকালিক তাহার কালোচিত পরিবর্ত্তন সমাজের গতির ভিত্তি-মূল।"

দ্বিজেন্দ্র বাবু বুঝাইয়াছেন, যে সমাজের স্থিতি ও গতি উভয় ব্যতীত মঙ্গল নাই। স্থিতির দৃঢ়ভিত্তি-ভিন্ন সমাজের ধ্বংস হইবে; পক্ষান্তরে গতি ভিন্ন সমাজ নির্জীব হইয়া পচিয়া গলিয়া যাইবে। ইহা প্রসিদ্ধ কথা এবং দ্বিজেন্দ্র বাবু এবং কটন সাহেব উভয়েই বুঝাইয়াছেন যে আমাদের হিন্দু-সমাজের স্থিতির মূল বড় দৃঢ়, চারি হাজার বৎসরের ঝড় বাতাসে ইহার

একটি ডাল পালাও আর নাই। তবে এ সমাজের গতি ছিল না। অবরুদ্ধ-স্রোতঃ জলাশয়ের মত, ইহা পঙ্কিল, শৈবালসঙ্কুল, মলিন এবং অপুণ্য হইয়া উঠিয়াছিল ময়লা মাটি জমিয়া ভরাট হইবার মত হইয়াছিল। তার পর উপরোক্ত দুই জন লেখকই বলিতেছেন, যে এখন সমাজে আবার গতি সঞ্চার হইয়াছে। আর উভয় লেখকের মত, যে সমাজের সেই গতি, ইংরেজি শিক্ষা হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত উভয় লেখকের মতভেদ নাই। এবং এ সকল মতের যাথার্থ্য সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু তার পর একটা বড় গুরুতর কথা আছে।

গতি যেমন সমাজের মঙ্গলকর, ইহার অবিহিত বেগ তেমনি অনিষ্টকর। গতির বেগ অধিক হইলে স্থিতির ধ্বংস হয়; বিপ্লব উপস্থিত হয়। এ বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রবাবুর সারগর্ভ কথাগুলি উদ্ধৃত করিতেছি।

"কিন্তু আর এক দিকে দেখা যায় যে, গতিরোধক স্থিতি সমাজের পক্ষে যতই কেন ভয়াবহ হউক না, স্থিতি-ভঞ্জক গতি তাহা অপেক্ষা আরও অধিক ভয়াবহ। ঐকান্তিক স্থিতির গুরুভার যখন সমাজের অসহ্য হইয়া উঠে, তখন সমাজ পরিবর্ত্তনের দিকে স্বভাবতই উন্মুখ হইয়া থাকে। সমাজের ঐ রূপ তপ্ত অবস্থায় বাহির হইতে পরিবর্ত্তনের উদ্দীপক কোন নূতন উপকরণ তাহার উপরে আসিয়া পড়িলে পুরাতনের সঙ্গে নূতনের সঙ্গে কিছু কাল ধরিয়া বোঝাপড়া চলিতে থাকে; প্রথম প্রথম নূতন কিছুতেই পরিপাক পায় না, ক্রমে যখন নূতনের নূতনত্ব থিতাইয়া মন্দা পড়িয়া আসে, তখন পুরাতনের সহিত তাহার কতকটা মিশ খায়; প্রথম প্রথম নূতনকে অদ্ভুত নূতন মনে হয়, পরে চলন-সই নূতন মনে হয়, তাহার পর পুরাতনের সহিত নূতনের রীতিমত লয় বাঁধিয়া গিয়া নূতন পুরাতনের অঙ্গের সামিল হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু পুরাতনের সহিত নূতনের সদ্ভাব বসিতে না বসিতে যদি আর এক নূতন আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে, এবং তাহাও স্থির হইতে না হইতে আর এক নূতন আসিয়া তাহার উপর চড়াও করে, মুহুর্মুহু নূতনের পর নূতন আসিয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে, তবে সমাজ নিতান্তই অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। ফরাসিস্ বিপ্লবের সময় কত যে নূতন নূতন অদ্ভুত ব্যাপার আসিয়া কত যে দুই দিনের পুরাতন নাবালক স্থিতিকে

বৎসর কয়েকের মধ্যে গ্রাস করিয়া ফেলিল তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঋতু পরিবর্ত্তন হইলে বৎসরের ফল যেমন ভয়ানক হয়, ক্রমাগত নূতন নূতন নূতনের স্রোত বহিতে থাকিলে সমাজেরও সেইরূপ দুর্দ্দশা হয়।

"নব্য বঙ্গের বিষম সমস্যা এই যে, গতি স্থিতিকে ভঙ্গ করিবে না, স্থিতি গতিকে রোধ করিবেন, উভয়ের মধ্য পথ দিয়া বঙ্গ সমাজকে উন্নতি মঞ্চে লইয়া যাইতে হইবে।"

কটন সাহেবেরও ঐ কথা। তিনিও বলেন "Better is Order without Progress, if that were possible, than Progress with Disorder."

এখন এই বিষম সমস্যার উত্তর কি? গতির বিষয়ে, কি দ্বিজেন্দ্র বাবু, কি কটন সাহেবের কোন সন্দেহ নাই। আমাদেরও কাহারও কোন সন্দেহ নাই—হইবারও কোন সন্দেহ নাই। তবে কটন সাহেব এমন কতক-গুলি লক্ষণ দেখাইয়াছেন, তাহাতে বুঝিতে হয়, যে এই গতি বিলক্ষণ বেগবতী। অতএব স্থিতির দিগে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। কি উপায়ে সেই স্থিতির বল অবিচলিত থাকে উভয় লেখকই তাহার এক একটা উত্তর দিয়াছেন। এইখানে দুইজন লেখকের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়।

দ্বিজেন্দ্র বাবু আদি ব্রহ্মসমাজের নেতা; তাঁহার ভরসা ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর। তাঁহার মতে এই ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতেই স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্য সাধিত হইতেছে ও হইবে। কটন সাহেবের ভরসা হিন্দুধর্ম্মে। কিন্তু এই মত ভেদটা আপাততঃ যতটা গুরুতর বোধ হয়, বস্তুতঃ তত গুরুতর নহে। কেন না আদি ব্রহ্ম সমাজের ব্রাহ্ম ধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্ম-মূলক; তাঁহারা হিন্দু সমাজ হইতে ব্রাহ্ম সমাজের বিচ্ছেদ স্বীকার করেন না; অন্ততঃ "Historical continuity," রক্ষা করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য। এক্ষণে আমরা এ বিষয়ে কটন সাহেবের বাক্যের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"The old Hindoo polytheism is a present basis of moral order and rests upon foundations so plastic that it can be moulded into the most diverse forms adapting itself equally to the intellect of the subtle metaphysicican and to the emotions of the unlettered peasant. It combines in itself all the elements

of intensity, regularity and permanence. Its chief attribute is stability. The system of caste, far from being the source of all the troubles which can be traced in Hindoo society, has rendered the most important services in the past and still continues to sustain order and solidarity. The admirable order of Hinduism is too valuable to be rashly sacrificed before any Moloch of progress. Better is order without progress, if that were possible, than progress with disorder. Hindooism is still vigorous and the strength of its metaphysical subtlety and wide range of influence are yet instinct with life. In the future its distinctive conceptions will be preserved and incorporated into a higher faith, but at present we are utterly incapable of replacing it by a religion which shall at once reflect the national life and be competent to form a nucleus round which the love and reverence of its votaries may cluster."

কটন সাহেবের বিশেষ ভরসা "নব্য হিন্দু" সম্প্রদায়ের উপর। তাঁহার বাক্য পুনশ্চ উদ্ধৃত করিতেছি।

"The vast majority of Hindoo thinkers have formed themselves into a party of reaction against the voice of a crude and empirical rationalism which seeks only to decry the social monuments raised in ancient times by Brahmin theocrats and legislators, to vilify the past inorder to glorify the present, and to sing the shallow glories of an immature civilisation with praises never accorded to the greatest triumphs of Humanity in the past. The innate conservatism of the nation is beyond the power of any foreign civilisation to shatter. The stability of the Hindoo character could have shown itself in no way more conspicuously than by the wisdom with which it has bent itself before the irresistible rush of Western thought and has still preserved amidst all the havoc of destruction an underlying current of religious sentiment and a firm conviction that social and moral order can only rest upon a religious basis."

নব্য হিন্দু ধর্ম্মের তিনি যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা ভ্রমশূন্য নহে। কিন্তু কিয়ৎ পরিমাণে তাহার ভিতর সত্য আছে। সে বর্ণনা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"The Hindu mind naturally runs in a religious groove of thought and recoils from any solution of its present difficulties which does not arise from the past religious history of the nation. And, therefore the vast majority of Hindoo thinkers do not venture to reject the supernatural from their belief. They adopt Theism in some form or other and endeavour in this way to give permanence and vitality to what they conceive to be the religion of their ancient scriptures. At the same time they manage to reconcile with this teaching the ceremonial observances of a strictly orthodox Polytheism. They argue that these rights are embedded in the traditions and customs of the people, that they are harmless in themselves and that their observance tends to bridge over the chasm which otherwise separates the educated classes from the bulk of the population. Their action is thus animated by a spirit of large-hearted tolerance."

দ্বিজেন্দ্র বাবু এবং কটন সাহেবের এই সকল কথা সমালোচনা করিয়া যে কয়টি কথা পাওয়া গেল, তাহা পাঠকের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, এজন্য তাহা পুনরুক্ত করিতেছি।

স্থিতি এবং গতি এই দুই ভিন্ন সমাজের মঙ্গল নাই। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে পরস্পর বিরোধ ঘটিতে পারে। স্থিতি গতি-রোধকারিণী হইতে পারে; গতি স্থিতি-ধ্বংসিনী হইতে পারে। যাহাতে তাহা না হইয়া, পরস্পরের সামঞ্জস্য হয়, সমাজের নায়কদিগের তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ চাই। উভয় লেখকের মতে, আমাদের সমাজের স্থিতিবল প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মে, গতিবল আধুনিক ইংরেজি শিক্ষায়। ইতিপূর্ব্বে প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের অবনতি ঘটিয়া স্থিতি দুর্জ্জয়া হইয়া গতি রোধ করিয়াছিল, এক্ষণে ইংরেজি শিক্ষা বলবতী হইয়া স্থিতি ধ্বংস করিবার সম্ভাবনা ঘটিতে পারে। তাহা না হইয়া সামঞ্জস্য বজায় রাখিতে হইবে। ভরসা ধর্ম্মের উপর। এ পর্য্যন্ত দেশী ও বিদেশী লেখকে, ব্রাহ্মবাদী এবং পজিটিবিষ্টে, এক মত। প্রভেদ এই যে, দ্বিজেন্দ্র বাবুর ভরসা ব্রাহ্মধর্ম্মে, কটন সাহেবের ভরসা নব্য হিন্দু ধর্ম্মে।

বলা বাহুল্য, প্রচার-লেখকেরা এ বিষয়ে দ্বিজেন্দ্র বাবুর মতাবলম্বী না হইয়া কটন সাহেবের মতাবলম্বী হইবেন। তবে একটা কথা সম্বন্ধে উভয় লেখক হইতে আমার একটু মতভেদ আছে। তাঁহারা ধর্ম্মকে কেবল স্থিতিরই ভিত্তি বিবেচনা করেন। আমার বিবেচনায় বিশুদ্ধ যে ধর্ম্ম, তাহা সমাজের স্থিতি গতি উভয়েরই মূল। এখনকার নব্য ভারত-সমাজের গতি ইংরেজি শিক্ষার বল, ইহা যথার্থ বটে। কিন্তু শিক্ষাও আমার বিবেচনায় ধর্ম্মের অন্তর্গত। বৃত্তি গুলির অনুশীলনের নামই শিক্ষা। আর নবজীবনে দেখাইয়াছি যে সেই অনুশীলন হইতেই ধর্ম্ম। যাহাকে আমরা ইংরেজি শিক্ষা বলি, তাহা বস্তুতঃ জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি গুলির পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অনুশীলন পদ্ধতি। অতএব ধর্ম্মের এই আংশিক সংস্কার হইতেই সমাজের আধুনিক গতির উৎপত্তি। হিন্দু ধর্ম্মেরও তাৎপর্য্য এই যে, শিক্ষা ধর্ম্মের অংশ। আদিম কালে যাহা অধ্যয়নীয় শাস্ত্র ছিল, তাৎকালিক হিন্দু ধর্ম্মে সেই সকলের অধ্যয়নই আদিষ্ট হইয়াছিল। এক্ষণে শাস্ত্রান্তর যদি লোক-শিক্ষার অধিকতর উপযোগী দেখা যায়, তাহারই অধ্যয়নই প্রচলিত হওয়া উচিত, এ কথা হিন্দুধর্ম্মের ব্যবস্থাপক ঋষিগণ উপস্থিত থাকিলে অবশ্য স্বীকার করিতেন। তাঁহাদিগের আদিষ্ট ধর্ম্মের এই স্থূল মর্ম্ম বিবেচনা করিয়া, ইংরেজি শিক্ষাও নব্য হিন্দুধর্ম্মের অংশ বলিয়া আমি স্বীকার করি। অতএব স্থিতি গতি উভয়েই ধর্ম্মের বলে। উভয়েরই বল যখন এক মূলোদ্ভূত বলিয়া সমাজের হৃদয়ঙ্গম হইবে, এবং তদনুসারে কার্য্য হইতে থাকিবে, তখন আর স্থিতিতে গতিতে বিরোধ থাকিবে না। তখন "Order" ও "Progress" এক হইয়া দাঁড়াইবে। সমাজের স্থিতি ও গতির মধ্যে বিরোধের ধ্বংস করিয়া, স্থিতির বল, ও গতির বল, উভয়কেই এক বলে বর্দ্ধিত করিয়া, সমাজকে প্রকৃত উন্নতির পথে লইয়া যাওয়াই নব্য হিন্দু ধর্ম্মের উদ্দেশ্য।

পাখীটি কোথায় গেল ?

দ্বারে একটি পাখী। বন্ধু নয়, ভিখারী নয়, অতিথি নয়, একটি পাখী। আমি কখনও পাখী পুষি নাই—তবে আমার দ্বারে পাখী কেন ? মানুষটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'এখানে পাখী আনিলে কেন ?' মানুষটি বলিল—'পাখী পুষিবেন কি ?' আমি কখনও পাখী পুষি নাই। পাখী পুষিতে কখনও সাধও হয় নাই। যদি বা কখনও পাখী পুষিবার কথা মনে করিয়াছি বা কাহাকেও পাখী পুষিতে দেখিয়াছি তখনই ভাবিয়াছি—বনের পাখী বনে থাকিলেই ভাল থাকে—যে অনন্ত আকাশে উড়িয়া বেড়ায় তাহাকে ক্ষুদ্র খাঁচায় পুরিলে সে বড়ই ক্লেশ পায়। এই ভাবিয়া কখনও পাখী পুষি নাই এবং কাহাকেও পাখী পুষিতে দেখিলে দুঃখ বৈ সুখ পাই নাই। কিন্তু মানুষটি যখন আবার বলিল—'পাখী পুষিবেন কি?'—কি জানি কেন, মনটা কেমন হইয়া গেল, মনে হইল বুঝি আমি পাখীটিকে না লইলে মানুষটি তাহাকে কতই কষ্ট দিবে—পাখীটিকে ধরিয়া কত কষ্টই দিয়াছে—অনায়াসে অবলীলাক্রমে অপূর্ব্ব আনন্দভরে পাখীটিকে ধরিয়া কত কষ্টই দিয়াছে—আবার অনায়াসে অবলীলাক্রমে অপূর্ব্ব আনন্দভরে তাহাকে কতই কষ্ট দিবে। এই ভাবিয়া মনটা কেমন হইয়া গেল। তায় আবার দেখিলাম যে পাখীটি যেন নির্জীব হইয়াছে, ভাল করিয়া ধুঁকিতেও পারিতেছে না—ভয়ে জড়সড় হইয়াছে, বুঝিবা কতই আকুল হইয়াছে, বুঝিবা তাহার ক্ষুদ্র কণ্ঠ কতই শুকাইয়া উঠিয়াছে! বড়ই দুঃখ হইল। আমি বলিলাম—পুষিব। মানুষটি বলিল, আটটি পয়সা পাইলেই পাখীটি দি। পাখীটি যেন ধুঁকিতেও পারিতেছে না—দর দাম করিতে গেলে বা মারা যায়। তৎক্ষণাৎ আটটি পয়সা দিয়া পাখীটি লইলাম এবং এক প্রতিবাসীর নিকট হইতে একটা খাঁচা লইয়া পাখীটিকে তাহাতে রাখিয়া তাহাকে দুধ ছাতু ও জল খাইতে দিলাম। দিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। তবু পাখীটি খাইল না। অর্দ্ধ

মুদিত নেত্রে আস্তে আস্তে ধুঁকিতে লাগিল। মনে হইল বুঝি আমাকে দুষ্‌মন ভাবিয়া ভয়ে খাইতেছে না। একটু সরিয়া গেলাম। পাখীটি আমাকে আর দেখিতে পাইল না। খানিক পরেই একটু ছাতু ও জল খাইল। আমি বুঝিলাম—আমাকে দুষ্‌মন ভাবিয়াই এতক্ষণ খায় নাই। কিন্তু দুষ্‌মনের ঘরে দুষ্‌মনের সামগ্রী খাইল ত। আমি তাহার এত সুখ এত সামগ্রী হরণ করিয়াছি—কিন্তু আমার ঘরে আমার জিনিস খাইল ত। পেটের দায় এমনি দায়। পেটের মতন যন্ত্রণা জগতে আর নাই—পেটই ত জগতে এত কলঙ্কের মূল। আমার পাখী পেটের যন্ত্রণা তুচ্ছ করিতে পারিল না—পেটের জন্য দুষ্‌মনের জিনিস খাইয়া কলঙ্কে ডুবিল। বুঝিলাম আমাদের ন্যায় পাখীও ক্ষুদ্র, পাখীও দুর্ব্বল। পাখীর উপর মায়া হইল। সে দিন আর পাখীর কাছে গেলাম না। প্রাতে উঠিয়া দেখি পাখী দিব্য খাওয়া দাওয়া করিয়াছে। ছাতুর বাটিতে ছাতু প্রায় নাই, জলের বাটিতে জলও কিছু কম এবং খাঁচার নীচে মেজের উপর কিছু ছাতুর গুড়া এবং দুই চারি ফোঁটা জল পড়িয়া আছে। বড় আহ্লাদ হইল। পাখীর কাছে গেলাম। পাখী সরিয়া খাঁচার এক কোনে গিয়া বসিল। প্রায় এক ঘণ্টা কাল সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। পাখীও সেই এক ঘণ্টা কাল সেই কোনে বসিয়া রহিল কিছু খাইল না। আমি সরিয়া আসিলাম—পাখীও খাইতে লাগিল। তখন আবার ভাবিলাম—পাখী আমাকে এখনও দুষ্‌মন ভাবিয়া খাইতেছে না। ভাল, এমন করিয়া খাওয়াইতেছি তবুও পাখী আমাকে দুষ্‌মন ভাবিতেছে? ভাবিবে না ত কি? সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া কেবল পেটে খাইতে দিতেছি বলিয়া কি সে আমাকে পুষ্পচন্দন দিয়া পূজা করিবে? পেটটা কি এতই বড়? তবে কেন পাখী আমাকে দুষ্‌মন ভাবিবে না? কিন্তু দুষ্‌মন হই আর যাই হই, আমি পাখীকে পয়সা দিয়া কিনিয়াছি ত বটে; তবে কেন পাখী আমার হয় না? মানুষকে পয়সা দিলে মানুষ ত মানুষের হয়; মানুষকে পয়সা দিলে মানুষ ত মানুষের মন যোগায়, গোলামি করে, গুণগান করে, সবই করে; মানুষকে পয়সা দিলে মানুষ ত মানুষকে গতর দেয়, মানমর্য্যাদা দেয়, পুণ্যধর্ম্ম দেয়, সব দেয়। পাখীকে পয়সা

দিয়া কিনিলাম তবে কেন পাখী আমার হয় না, আমাকে কিছু দেয় না? কিছুই মীমাংসা করিতে পারিলাম না। বোধ হইল বুঝি পাখী নীচ জন্তু, পয়সার মাহাত্ম্য জানে না, পয়সার জন্য সব কথা যায় সব দেওয়া যায়, এ উচ্চ মানব-নীতি বুঝিতে পারে না। আরো দুই চারি দিন গেল। আবার একবার পাখীর কাছে গেলাম। দেখি সেখানে আমার একটি ছোট ছেলে বসিয়া আছে। পাখী আমাকে দেখিয়া আর তেমন করিয়া সরিয়া গেল না। ছেলেটিকে কোলে করিয়া আমি তাহার সহিত পাখীর কথা কহিতে লাগিলাম। পাখী খাইতে লাগিল। বুঝিলাম পাখী খাঁচা চিনিয়াছে। মনে দুঃখ উথলিয়া উঠিল। অনন্ত আকাশে উড়িয়া উড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠিয়া উঠিয়া নামিয়া নামিয়া যার আশ্ মিটে না, কেন তাহাকে, হায়! হায়! কেন তাহাকে ক্ষুদ্র খাঁচায় পুরিলাম। কেন তাহাকে ক্ষুদ্র খাঁচা চিনাইলাম! কেন তাহাকে অনন্ত ভুলাইলাম! এ মহাপাতক কেন করিলাম! দুই এক দিন বড়ই কষ্টে গেল। এক একবার মনে হইতে লাগিল পাখীকে উড়াইয়া দি। একবার খাঁচার দ্বার খুলিয়া দিলাম। পাখী উড়িয়া গিয়া একটা জানালার উপর বসিল। আবার মনটা কেমন করিতে লাগিল—পাখী পালায় ভাবিয়া প্রাণটা কেমন হইয়া গেল—অমনি পাখীকে ধরিয়া আবার খাঁচায় পুরিলাম। আপনার কাছে আপনি হারিলাম। কেন হারিলাম বুঝিতে পারিলাম না। সত্য সত্যই কি মহাপাতক করিলাম?

এক দিন ছেলেগুলিকে লইয়া পাখীর কাছে বসিলাম। পাখী যেন কতই আহ্লাদিত হইয়া খাঁচার ভিতর লাফালাফি করিতে লাগিল, এবং একবার এ ছেলেটির দিকে একবার ও ছেলেটির দিকে যাইতে লাগিল। আমরা সকলে আহ্লাদে হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলাম এবং করতালি দিতে লাগিলাম। পাখী ভয় পাইল না—তেমনি লাফালাফি করিতে লাগিল। আমি একটু ছাতু লইয়া পাখীকে খাইতে দিলাম—পাখী খাইল না। আমার একটি ছেলে একটু ছাতু লইয়া খাইতে দিল, পাখী টুপ্ করিয়া খাইয়া ফেলিল। মনে হইল আমার ছেলেগুলির সহিত পাখীর ভ্রাতৃভাব হইয়াছে—ছেলেগুলিকে বলিলাম, উটি তোমাদের ভাই। সেই দিন হইতে পাখীটিও আমার ছেলে হইল। পাখীটিকে আমার হৃদয়ের

খাঁচায় পুরিলাম। সে খাঁচার সীমা নাই, অর্গলযুক্ত দ্বার নাই, আশে পাশে মাথায় পায় ঠেকে এমন কাটির কাঠাম নাই। পাখীকে সেই অসীম অনন্ত অতলস্পর্শ খাঁচায় পুরিলাম। মৎপাতকের ভয় কোথায় চলিয়া গেল। মন আনন্দে মজিয়া উঠিল। পাখী ও আর তাহার বাঁশের খাঁচায় এখানে ওখানে ঠোঁট গলাইয়া পালাইবার চেষ্টা করে না। এখন বাঁশের খাঁচার দ্বার খুলিয়া রাখি, পাখী উড়িয়া যায় না। খাঁচার দ্বার খুলিয়া রাখিলে পাখী এক আধবার আমার কাছে আসে, এক আধবার আমার ছেলেদের কাছে আসে, আবার নাচিতে নাচিতে খাঁচার ভিতর গিয়া বসে। খাঁচা এখন পাখীকে বড় মিষ্ট লাগে। খাঁচার এখন আর সীমা নাই, খাঁচা এখন অসীম অনন্ত অতলস্পর্শ। খাঁচার এখন আর কাটির কাঠাম নাই—আশে পাশে মাথায় পায় লাগে এমন কাটির বেড়া নাই। খাঁচা এখন পাখীর বড়ই সখের বড়ই সাধের ঘর। পাখী এখন খাঁচার নেশায় ভোর। আমি এখন পাখীর সহিত কত কথা কই, পাখীও কত কথা কয়—যেন কত আদরের, কত আব্‌দারের কথা কয়, কত চেনা দেশের কথা কয়, কত অচেনা দেশের কথা কয়, কত হাসে, কত কাঁদে, কত গান গায়, কত বকে, কত ঝকড়া করে, কত অভিমান করে, কত ভাব করে, কত ভ্রুকুটি করে, কত ভণ্ডামি করে। পাখীকে আমি কত রকম করিয়া দেখি, পাখীও আমাকে কত রকম করিয়া দেখে। পাখীর খাঁচা খুলিয়া দি। পাখী আসিয়া আমার কাঁধের উপর বসে, আমার হাতের উপর বসিয়া ছাতু খায়। আমি এখন আর পাখীর সে দুষ্‌মন নই। আমি এখন পাখীতে মজিয়াছি, পাখীও এখন আমাতে মজিয়াছে। এখন অনন্ত আকাশ হৃদয়ের অনন্তত্বে ডুবিয়া গিয়াছে—পাখী এখন আর অনন্ত আকাশ খোঁজে না, তাহার অনন্ত আকাশের তৃষ্ণা আর নাই। সে এখন আকাশের অনন্তত্ব ভুলিয়া হৃদয়ের অনন্তত্বে মিলাইয়া গিয়াছে। অনন্ত বিশ্ব হৃদয়ের ভিতর বিন্দু অপেক্ষাও বিন্দু। বিশ্ববিন্দু হৃদয়ের কাছে কোন্ ছার? কিন্তু হৃদয়ের ভিতর অনন্ত বিশ্ব ও অনন্ত হৃদয়। হৃদয় বিশ্ব-দ্রাবক, বিশ্বের বিশ্ব। আমার পাখী সেই বিশ্বের বিশ্বে পশিয়াছে। তাহার কি আর সেই তুচ্ছ অনন্ত-আকাশের কথা মনে থাকে?

আহা! আমার সে পাখী আর নাই! আজ চারি দিন হইল আমার সে

পাখী মরিয়া গিয়াছে। মরিয়া কোথায় গিয়াছে? কে বলিবে কোথায় গিয়াছে? কিন্তু আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছি যে সে মরিয়া অনন্ত হইয়াছে। আজ আমি যেখানে যে রঙ দেখি সেখানে সেই রঙে আমার সেই পাখী দেখিতে পাই। যেখানে যে চোক্ দেখি সেখানে সেই চোকে আমার সেই পাখী দেখিতে পাই। যেখানে যে ঠোঁট দেখি সেখানে সেই ঠোঁটে আমার সেই পাখী দেখিতে পাই। আজ আমি চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র অগ্নি বায়ু জল হীম তাপ পাহাড় পর্ব্বত ধূলা বালি বৃক্ষ লতা ফল ফুল পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ নরনারী সকলেতেই আমার সেই পাখী দেখিতেছি, হাড় হাড়ে আমার সেই পাখী অনুভব করিতেছি। আজ অনন্ত বিশ্বে আমার সেই পাখী ছাড়া আর কিছুই নাই। আজ আমিও আমার সেই পাখী-ময়, এই অনন্ত বিশ্বও পাখী-ময়। তাই আমিও আজ কি মধুময়, আমার অনন্ত বিশ্ব ও কি মধুময়। আমার ক্ষুদ্র পাখী আজ অনন্ত কায়া ধারণ করিয়া অনন্তব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে। আমার এক ফোঁটা পাখী আজ অপূর্ব্ব শ্রী এবং অনুপম সৌন্দর্য্য লাভ করিয়া অনন্ত বিশ্ব ভরিয়া রহিয়াছে। তাইতে অনন্ত বিশ্ব ও অপূর্ব্ব শ্রী এবং অনুপম সৌন্দর্য্যে শোভিত হইয়া উঠিয়াছে। ভাগ্যে সেই এক ফোঁটা পাখীতে মজিয়াছিলাম, তাইত আজ অনন্ত বিশ্ব দেখিলাম, অনন্ত বিশ্বে মজিলাম এবং অনন্ত বিশ্ব আমাতে মজিল। তাইত আজ অনন্ত হইলাম। তাইত আজ বুঝিলাম যে ফোঁটার ভিতরেই বিশ্ব ফোটে, ফোঁটা অনন্তেরও অনন্ত।

আমার পাখী আছে বৈ কি। কিন্তু আমার ছোট ছেলেগুলি আমাকে এক একবার জিজ্ঞাসা করে—পাখীটি কোথায় গেল?

৫ই চৈত্র ১২৯২। শ্রীচঃ—

সান্ত্বনা।

কে তোমরা কাঁদ মোর তরে—
কে তোমরা সংসারের জীব,
আমি ত গো তোমাদের নই;
এক দিন ছিনু তোমাদের,
কেঁদেছিনু তোমাদের মত
সংসারের দুঃখ বুকে সই!

মায়ার স্বপনে আত্ম ভুলে,
যত দিন ছিনু আমি হোথা,
দেখে শুনে তোমাদের মুখ;
তোমাদের আনন্দ উল্লাসে,
তোমাদের রোগ শোক দুঃখে,
পেয়েছি গো বহু দুঃখ সুখ।

হোথা যে রবনা চিরদিন
জানিতাম এ কথা তখনো,
এক দিনও কিন্তু ভাবি নাই;
প্রবাসে হইয়ে আত্মহারা
ভুলিলাম নিজের সম্বল,
আজও তাই কত ব্যথা পাই।

আপনার কাজ ভুলে গিয়ে
অসার ভাবনা ভেবে ভেবে
তোমরাও কেঁদোনা গো আর;
মোর মত বড় ব্যথা পাবে,
কাতর হইবে বড় প্রাণে,
এই বেলা কর প্রতীকার।

প্রচার।

তোমাদের স্নেহের পুত্তলী
তোমাদের স্নেহ-হারা হয়ে
এসেছি বলে কি পাও ব্যথা ?—
হেথা কি গো স্নেহের অভাব—
অবারিত অনন্ত স্নেহের
কোলে আমি শুয়ে আছি হেথা।

মায়ার শিকল কেটে দিয়ে,
অসার বাসনা ছুড়ে ফেলে,
এসেছি গো আপনার দেশ ;
তোমাদের অনিত্য ভাবনা
এখানে আমার কিছু নাই,
নাই কিছু সাংসারিক ক্লেশ।

খুলে ফেল মায়ার শৃঙ্খল,
ছেড়ে দাও অসার ভাবনা,
তোমরাও মোরে ভুলে যাও ;
জগতের গতি এইরূপ
চিরদিন এইরূপ হবে,
তবে কেন কেঁদে কষ্ট পাও !

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

কালে বুদ্ধি ফিরিয়া আসিলে চন্দ্রচূড় ভাবিতে লাগিলেন, "ইহার বিহিত কি কর্ত্তব্য? এখন গঙ্গারামকে পদচ্যুত করিয়া আবদ্ধ করা ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু তাহাকে পদচ্যুত বা কারাবদ্ধ করিব কি প্রকারে? সে যদি না মানে? নগর সিপাহী সবইত তার হাতে। সে আমারে উলটিয়া কারাবদ্ধ করিতে পারে। মৃণ্ময়ের সাহায্য ভিন্ন তাহাকে আবদ্ধ করিতে পারিব না—কিন্তু যদি গঙ্গারাম অবিশ্বাসী, তবে মৃণ্ময়কেই বা বিশ্বাস কি? তবে সাবধানের মার নাই—সতর্ক থাকাই ভাল। বিপদ ঘটে, তখন নারায়ণ সহায় হইবেন। এখন প্রথমতঃ গঙ্গারামের মন বুঝিয়া দেখিতে হইবে।" এইরূপ ভাবিয়া চন্দ্রচূড় তখন আর কাহারও সাক্ষাতে কোন কথা প্রকাশ করিলেন না। পরে সন্ধ্যার পর তাঁহার গুপ্তচর আসিয়া তাঁহাকে সম্বাদ দিল, যে ফৌজদারী সৈন্য দক্ষিণ পথে মহম্মদপুর আক্রমণে আসিতেছে।

চন্দ্রচূড় তখন মৃণ্ময় ও গঙ্গারামকে ডাকাইয়া, পরামর্শ করিতে লাগিলেন। পরামর্শ এই স্থির হইল, যে মৃণ্ময় সৈন্য লইয়া, সেই রাত্রে দক্ষিণ পথে যাত্রা করিবেন—যাহাতে যবন সেনা নদী পার হইতে না পারে, এমন ব্যবস্থা করিবেন।

চন্দ্রচূড় বলিলেন, "আমার বিবেচনায়, গঙ্গারামও দ্বিতীয় সেনাপতি হইয়া মৃণ্ময়ের সাহায্যার্থ যাওয়া ভাল।"

গঙ্গারাম চুপ করিয়া রহিল—দেখিতেছে মৃণ্ময় কি বলে।

মৃণ্ময়ের একটু রাগ হইয়াছে—আমি কি একা লড়াই পারি না—রে আমার সঙ্গে আবার গঙ্গারাম! অতএব মৃণ্ময় রুষ্টভাবে বলিল,

"তা চলুন না—বেশ ত।"

গঙ্গারাম তখন বলিল, "আমি যাব ত নগর রক্ষা করিবে কে?"

চন্দ্র। মৃণ্ময় না হয় সেজন্য একজন ভাল লোক রাখিয়া যাইবেন।

গঙ্গা। নগর রক্ষার জন্য রাজার কাছে জবাবদিহি আমাকে করিতে হইবে। অতএব আমি নগর ছাড়িয়া কোথাও যাইব না।

চন্দ্র। আমি নগর রক্ষা করিব।

গঙ্গা। করিবেন। কিন্তু আমার উপর যে কামের ভার আছে তাহা আমি করিব।

তখন চন্দ্রচূড় মনে মনে বড় সন্দিগ্ধ হইলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন, "যাহা তোমরা ভাল বুঝ—তাই করিও।"

এদিকে রণসজ্জার ধুম পড়িয়া গেল। মৃণ্ময় পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন, তিনি সৈন্য লইয়া রাত্রেই দক্ষিণ পথে যাত্রা করিলেন। গড় রক্ষার্থ অল্প মাত্র সিপাহী রাখিয়া গেলেন। তাহারা গঙ্গারামের আজ্ঞাধীনে রহিল।

এই সকল গোলমালের সময়ে পাঠকের কি গরিব রমাকে মনে পড়ে? সকলের কাছে মুসলমানের সৈন্যাগমন বার্ত্তা যেমন পৌঁছিল, রমার কাছেও সেইরূপ পৌঁছিল। মুরলা বলিল,

"মহারাণী—এখন বাপের বাড়ী যাওয়ার উদ্যোগ কর।"

রমা বলিল, "মরিতে হয় এইখানে মরিব। কলঙ্কের পথে যাইব না। কিন্তু তুমি একবার গঙ্গারামের কাছে যাও। আমি মরি, এইখানেই মরিব, কিন্তু আমার ছেলেকে রক্ষা করিতে তিনি স্বীকৃত আছেন, তাহা স্মরণ করিয়া দিও। সময়ে আসিয়া যেন রক্ষা করেন। আমার সঙ্গে কিছুতেই আর সাক্ষাৎ হইবে না, তাহাও বলিও।"

রমা মনস্থির করিবার জন্য, নন্দার কাছে গিয়া বসিয়া রহিল। পুরী মধ্যে কেহই সে রাত্রে ঘুমাইল না।

মুরলা আজ্ঞা পাইয়া গঙ্গারামের কাছে চলিল। গঙ্গারাম নিশীথকালে গৃহমধ্যে একাকী বসিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। রত্ন আশায় সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে তিনি প্রবৃত্ত—সাঁতার দিয়া আবার কূল পাইবেন কি? গঙ্গারাম সাহসে ভর করিয়াও একথার কিছু মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। কে

ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু স্থির করিতে না পারে, তাহার শেষ ভরসা জগদীশ্বর। সে বলে, "জগদীশ্বর যা করেন।" কিন্তু গঙ্গারাম তাহাও বলিতে পারিতেছিলেন না—যে পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত সে জানে যে জগদীশ্বর তার বিরুদ্ধ—জগৎপিতা তাহার শত্রু। অতএব গঙ্গারাম বড় বিষণ্ণ হইয়া চিন্তামগ্ন ছিলেন।

এমন সময়ে মুরলা আসিয়া দেখা দিল। রমার প্রেরিত সম্বাদ তাঁহাকে বলিল।

গঙ্গারাম বলিল,

"বলেন ত এখন গিয়া ছেলে লইয়া আসি।"

মুরলা। তাহা হইবে না। যখন মুসলমান পুরীতে প্রবেশ করিবে, আপনি তখন গিয়া রক্ষা করিবেন, ইহাই রাণীর অভিপ্রায়।

গঙ্গা। তখন কি হইবে কে বলিতে পারে? যদি রক্ষার অভিপ্রায় থাকে, তবে এই বেলা বালকটিকে আমাকে দিন।

মুরলা। আমি তাহাকে লইয়া আসিব?

গঙ্গা। না। আমার অনেক কথা আছে।

মুরলা। আচ্ছা—পৌষ মাসে।

এই বলিয়া, মুরলা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। কিন্তু গঙ্গারামের গৃহ হইতে বাহির হইয়া রাজপথে উঠিতে না উঠিতে মুরলার সে হাসি হঠাৎ নিবিয়া গেল—ভয়ে মুখ কালো হইয়া উঠিল। দেখিল, সম্মুখে, রাজপথে, প্রভাত শুক্রতারাবৎ সমুজ্জ্বলা ত্রিশূলধারিণী যুগল ভৈরবী মূর্ত্তি! মুরলা, তাহাদিগকে শঙ্করীর অনুচারিণী ভাবিয়া ভূমিতে পড়িয়া প্রণাম করিয়া, যোড় হাত করিয়া দাঁড়াইল।

একজন ভৈরবী বলিল, "তুই কে?"

মুরলা কাতরস্বরে বলিল,

"আমি মুরলা।"

ভৈরবী। মুরলা কে?

মুরলা। আমি ছোট রাণীর দাসী।

ভৈরবী। নগরপালের ঘরে এতরাত্রে কি করিতে আসিয়াছিলি?

মুরলা। মহারাণী পাঠাইয়াছিলেন।

ভৈরবী। সম্মুখে এই দেবমন্দির দেখিতেছিস্?

মুরলা। আজ্ঞা হাঁ।

ভৈরবী। আমাদের সঙ্গে উহার উপরে আয়।

মুরলা। যে আজ্ঞা।

তখন দুইজনে, মুরলাকে দুই ত্রিশূলাগ্রমধ্যবর্ত্তিণী করিয়া মন্দির মধ্যে লইয়া গেলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কারের সে রাত্রে নিদ্রা নাই। কিন্তু সমস্ত রাত্র নগর পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছেন, যে নগর রক্ষার কোন উদ্যোগই নাই। গঙ্গারামকে সে কথা বলায়, গঙ্গারাম তাঁহাকে কড়া কড়া বলিয়া হাঁকাইয়া দিয়াছিল। তখন তিনি কোন কৌশলে গঙ্গারামকে আবদ্ধ না করিয়া এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিয়াছেন, নিশ্চয় বুঝিয়া, অতিশয় অনুতপ্তচিত্তে কুশাসনে বসিয়া সর্ব্বরক্ষাকর্ত্তা বিপত্তিভঞ্জন মধুসূদনকে চিন্তা করিতেছিলেন। একবার মনে করিতেছিলেন, যে জনকত শিপাহী লইয়া গঙ্গারামকে ধরিয়া আবদ্ধ করিয়া, নগর রক্ষার ভার অন্য লোককে দিবেন। কিন্তু ইহাও ভাবিলেন যে শিপাহীরা তাঁহার বাধ্য নহে, গঙ্গারামের বাধ্য। অতএব সে সকল উদ্যম সফল হইবে না। মৃণ্ময় থাকিলে কোন গোল উপস্থিত হইত না, শিপাহীরা মৃণ্ময়ের আজ্ঞাকারী। মৃণ্ময়কে বাহিরে পাঠাইয়া তিনি এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিয়াছেন; ইহা বুঝিতে পারিয়াই তিনি এত অনুতাপপীড়িত হইয়া নিশ্চেষ্টবৎ কেবল অসুরনিসূদনী হরির চিন্তা করিতেছিলেন। তখন সহসা সম্মুখে প্রফুল্লকান্তি ত্রিশূলধারিণী ভৈরবীকে দেখিলেন।

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! তুমি কে?"

ভৈরবী বলিল, "বাবা! শত্রু নিকটে, এ পুরীর রক্ষার কোন উদ্যোগ নাই কেন, তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।"

মুরলার সঙ্গে কথা কহিয়াছিল শ্রী। চন্দ্রচূড়ের সঙ্গে কথা কহিতেছে, জয়ন্তী।

প্রশ্ন শুনিয়া চন্দ্রচূড় আরও বিস্মিত হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন,

"মা! তুমি কি এই নগরের রাজলক্ষ্মী?"

জয়ন্তী। আমি যে হই, আমার কথায় উত্তর দাও। নহিলে মঙ্গল হইবে না।

চন্দ্র। মা! আমার সাধ্য আর কিছুই নাই। রাজা নগররক্ষকের উপর নগর রক্ষার ভার দিয়াছিলেন, নগররক্ষক নগর রক্ষা করিতেছে না। সৈন্য আমার বশ নহে। আমি কি করিব, আজ্ঞা করুন।"

জয়ন্তী। নগর রক্ষকের সম্বাদ আপনি কিছু জানেন? কোন প্রকার অবিশ্বাসিতার কথা কি শুনেন নাই?

চন্দ্র। শুনিয়াছি। তিনি তোরাব খাঁর নিকট গিয়াছিলেন। বোধ হয়, তাঁহাকে নগর সমর্পণ করিবেন। আমার দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ আমি তাহার কোন উপায় করি নাই। মা! বোধ করিতেছি, আপনি এই নগরীয় রাজলক্ষ্মী। দয়া করিয়া এ দাসকে ভৈরবী বেশে দর্শন দিয়াছেন। মা! আপনি অপরিম্লানতেজস্বিনী হইয়া আপনার এই পুরী রক্ষা করুন।"

এই বলিয়া চন্দ্রচূড় কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তি ভাবে জয়ন্তীকে প্রণাম করিলেন।

"তবে আমিই এই পুরী রক্ষা করিব।" এই বলিয়া জয়ন্তী প্রস্থান করিল। চন্দ্রচূড়ের মনে ভরসা হইল।

জয়ন্তীরও আশার অতিরিক্ত ফল লাভ হইয়াছিল। শ্রী বাহিরে ছিল। তাহাকে সঙ্গে লইয়া জয়ন্তী গঙ্গারামের গৃহাভিমুখে চলিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

মুরলা চলিয়া গেলে, গঙ্গারাম চারিদিকে আরও অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। যাহার জন্য তিনি এই বিপদ্ সাগরে ঝাঁপ দিতেছেন, সে ত তাঁহার অনুরাগিনী নয়। তিনি চক্ষু বুজিয়া সমুদ্র মধ্যে ঝাঁপ দিতেছেন, সমুদ্রতলে রত্ন মিলিবে কি? না ডুবিয়া মরাই সার হইবে। আঁধার! চারিদিকে আঁধার! এখন কে তাঁকে উদ্ধার করিবে?

সহসা গঙ্গারামের শরীর রোমাঞ্চিত হইল, দেখিলেন, দ্বারদেশে প্রভাত-নক্ষত্রোজ্জ্বলরূপিনী ত্রিশূলধারিনী ভৈরবী মূর্ত্তি। অঙ্গপ্রভায় গৃহস্থিত প্রদীপের জ্যোতি ম্লান হইয়া গেল। সাক্ষাৎ ভবানী ভূতলে অবতীর্ণা মনে করিয়া, গঙ্গারামও মুরলার ন্যায় প্রণত হইয়া যোড় হাত করিয়া দাঁড়াইল। বলিল,

"মা, দাসের প্রতি কি আজ্ঞা?"

জয়ন্তী বলিল, "বাছা! তোমার কাছে কিছু ভিক্ষার জন্য আসিয়াছি।"

মুরলার সঙ্গে কথা কহিয়াছিল, শ্রী। গঙ্গারামের কাছে আসিয়াছে, জয়ন্তী একা। কি জানি যদি গঙ্গারাম চিনিতে পারে, এজন্য শ্রী গৃহমধ্যে প্রবেশ করে নাই।

ভৈরবীর কথা শুনিয়া, গঙ্গারাম বলিল,

"মা! আপনি যাহা চাহিবেন, তাহাই দিব। আজ্ঞা করুন।"

জয়ন্তী। আমাকে এক গাড়ি গোলা বারুদ দাও। আর একজন ভাল গোলন্দাজ দাও।

গঙ্গারাম ইতস্ততঃ করিতে লাগিল—কে এ? জিজ্ঞাসা করিল,

"মা! আপনি গোলা বারুদ লইয়া কি করিবেন?"

জয়ন্তী। দেবতার কাজ।

গঙ্গারামের মনে বড় সন্দেহ হইল। এ যদি কোন দেবী হইবে, তবে গোলা গুলি ইহার প্রয়োজন হইবে কেন? যদি মানুষী হয়, তবে ইহাকে

গোলা গুলি দিব কেন? কাহার চর তা কি জানি? এই ভাবিয়া গঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করিল—

"মা! তুমি কে?"

জয়ন্তী। আমি যে হই, রমা ও মুরলা ঘটিত সম্বাদ আমি সব জানি। তা ছাড়া, তোমার ভুষণাগমন সম্বাদ, ও সেখানকার কথাবার্ত্তার সম্বাদ আমি জানি। আমি যাহা চাহিতেছি, তাহা এই মুহূর্ত্তে আমাকে দাও, নচেৎ এই ত্রিশূলাঘাতে তোমাকে বধ করিব।"

এই বলিয়া সেই তেজস্বিনী ভৈরবী উজ্জ্বল ত্রিশূল উত্থিত করিয়া আন্দোলিত করিল।

গঙ্গারাম একেবারে নিবিয়া গেল। "আসুন দিতেছি।" বলিয়া ভৈরবীকে সঙ্গে করিয়া অস্ত্রাগারে গেল। জয়ন্তী যাহা যাহা চাহিল, সকলই দিল, এবং পিয়ারীলাল নামে একজন গোলন্দাজকে সঙ্গে দিল। জয়ন্তীকে বিদায় দিয়া, গঙ্গারাম দুর্গদ্বার বন্ধ রাখিতে আজ্ঞা দিলেন। যেন তাঁহার বিনানুমতিতে কেহ যাইতে আসিতে না পারে।

জয়ন্তী ও শ্রী গোলা বারুদ লইয়া, গড়ের বাহির হইয়া যেখানে রাজবাড়ীর ঘাট সেইখানে উপস্থিত হইল। সেখানে দেখিল এক উন্নতবপু সুন্দরকান্তি পুরুষ তথায় বসিয়া আছেন।

দুইজন ভৈরবীর মধ্যে, একজন ভৈরবী বারুদ, গোলার গাড়ি ও গোলন্দাজকে সঙ্গে লইয়া কিছু দূরে গিয়া দাঁড়াইল, আর একজন সেই কান্তিমান্ পুরুষের নিকট গিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,

"তুমি কে?"

সে বলিল, "যে হই না। তুমি কে?"

জয়ন্তী বলিল, "যদি তুমি বীরপুরুষ হও, এই গোলাগুলি আনিয়া দিতেছি—এই পুরী রক্ষা কর।"

সে পুরুষ বিস্মিত হইল কি না জানি না, কিন্তু কিছুক্ষণ ভাবিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। বলিল,

"তাতেই বা কি?"

জয়ন্তী। তুমি কি চাও?

পুরুষ। যা চাই, পুরী রক্ষা করিলে তা পাইব?

জয়ন্তী। পাইবে।

পুরুষ। কোথা পাইব? তোমাকে ত কোন দেবীর মত বোধ হইতেছে। হাতে ত্রিশূল—তুমি কি ভৈরবী? বলিলে কি বলিতে পার কোথায় তা পাইব? এই পুরী মধ্যে কি পাইব?

জয়ন্তী। হাঁ। তাই পাইবেন?

পু। কবে পাইব?

জয়ন্তী। তাহার কিছু বিলম্ব আছে।

এই বলিয়া জয়ন্তী সহসা অদৃশ্য হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বলিয়াছি, চন্দ্রচূড়ঠাকুরের সে রাত্রে ঘুম হইল না। অতি প্রত্যূষে তিনি রাজপ্রাসাদের উচ্চচূড়ে উঠিয়া চারিদিগ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। দেখিলেন নদীর অপর পারে, ঠিক তাঁহার সম্মুখে, বহুসংখ্যক নৌকা একত্রিত হইয়াছে। তীরে অনেক লোকও আছে বোধ হইতেছে, কিন্তু তখনও তেমন ফরসা হয় নাই, বোঝা গেল না, যে তাহারা কি প্রকারের লোক। তখন তিনি গঙ্গারামকে ডাকিতে পাঠাইলেন।

গঙ্গারাম আসিয়া সেই অট্টালিকাশিখরদেশে উপস্থিত হইল। চন্দ্রচূড় জিজ্ঞাসা করিলেন,

"ওপারে অত নৌকা কেন?"

গঙ্গারাম নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "কি জানি?"

চন্দ্র। দেখ, তীরে বিস্তর লোক। এত নৌকা, এত লোক কেন?

গঙ্গারাম। বলিতে ত পারি না।

কথা কহিতে কহিতে বেশ আলো হইল। তখন বোধ হইল, ঐ সকল লোক সৈনিক। চন্দ্রচূড় তখন বলিলেন,

"গঙ্গারাম! সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমাদের চর আমাদের প্রতারণা করিয়াছে। অথবা সেই প্রতারিত হইয়াছে। আমরা দক্ষিণ পথে সৈন্য পাঠাইলাম, কিন্তু ফৌজদারের সেনা এই পথে আসিয়াছে। সর্ব্বনাশ হইল। এখন রক্ষা করে কে?

গঙ্গা। কেন, আমি আছি কি করিতে?

চন্দ্র। তুমি এই কয় জন মাত্র দুর্গরক্ষক লইয়া এই অসংখ্য সেনার কি করিবে? আর তুমিও দুর্গরক্ষার কোন উদ্যোগ করিতেছ না। কাল বলিয়াছিলাম বলিয়া, আমাকে কড়া কড়া শুনাইয়াছিলে। এখন কে দায় ভার ঘাড়ে করে?

গঙ্গা। অত ভয় পাইবেন না। ওপারে যে ফৌজ দেখিতেছেন, তাহা অসংখ্য নয়। এই কয়খানা নৌকায় কয় জন শিপাহী পার হইতে পারে? আমি তীরে গিয়া ফৌজ লইয়া গিয়া দাঁড়াইতেছি। উহারা যেমন তীরে আসিবে, অমনি উহাদিগকে টিপিয়া মারিব।

গঙ্গারামের অভিপ্রায়, সেনা লইয়া বাহির হইবেন, কিন্তু এখন নয়, আগে ফৌজদারের সেনা নির্ব্বিঘ্নে পার হউক। তার পর তিনি সেনা লইয়া দুর্গদ্বার খুলিয়া বাহির হইবেন, মুক্তদ্বার পাইয়া মুসলমানেরা নির্ব্বিঘ্নে গড়ের ভিতর প্রবেশ করিবে। তিনি কোন আপত্তি করিবেন না। কাল যে মূর্ত্তিটা দেখিয়াছিলেন, সেটা কি বিভীষিকা! কৈ, তার ত আর কিছু বিকাশ প্রকাশ নাই।

চন্দ্রচূড় সব বুঝিলেন। তথাপি বলিলেন,

"তবে শীঘ্র যাও। সেনা লইয়া বাহির হও। বিলম্ব করিও না। নৌকা সকল শিপাহী বোঝাই লইয়া ছাড়িতেছে।"

গঙ্গারাম তখন তাড়াতাড়ি ছাদের উপর হইতে নামিল। চন্দ্রচূড় সভয়ে দেখিতে লাগিলেন যে প্রায় পঞ্চাশ খানা নৌকায় পাঁচ ছয় শত মুসলমান শিপাহী এক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যাত্রা করিল। তিনি অতিশয় অস্থির হইয়া, দেখিতে লাগিলেন, কতক্ষণে গঙ্গারাম শিপাহী লইয়া বাহির হয়। শিপাহী সকল সাজিতেছে, ফিরিতেছে, ঘুরিতেছে, সারি দিতেছে—কিন্তু বাহির হইতেছে না। চন্দ্রচূড় তখন ভাবিলেন, "হায়!

হায়! কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি—কেন গঙ্গারামকে বিশ্বাস করিয়াছিলাম। কেন ফকিরের কথায় সতর্ক হইলাম না। এখন সর্ব্বনাশ হইল। কৈ সেই জ্যোতির্ম্ময়ী রাজলক্ষ্মীই বা কৈ? তিনিও কি ছলনা করিলেন।”
চন্দ্রচূড় গঙ্গারামের সন্ধানে আসিবার অভিপ্রায় সৌধ হইতে অবতরণ করিবার উপক্রম করিতেছিলেন এমত সময়ে গুড়ুম্ করিয়া এক কামানের আওয়াজ হইল। মুসলমানের নৌকাশ্রেণী হইতে আওয়াজ হইল, এমন বোধ হইল না, তাহাদের সঙ্গে কামান আছে, এমন বোধ হইতেছিল না। চন্দ্রচূড় নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, মুসলমানের কোন নৌকায় কামানের ধোঁওয়া দেখা যায় না। চন্দ্রচূড় সবিস্ময়ে দেখিলেন, যেমন কামানের শব্দ হইল, অমনি মুসলমানদিগের একখানি নৌকা জলমগ্ন হইল; আরোহী শিপাহীরা সন্তরণ করিয়া অন্য নৌকায় উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

“তবে কি এ আমাদের তোপ!”

এই ভাবিয়া চন্দ্রচূড় নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, একটি শিপাহীও গড় হইতে বাহির হয় নাই। দুর্গ প্রাকারে, যে সকল তোপ সাজান আছে, সেখানে একটি মনুষ্যও নাই। তবে এ তোপ দাগিল কে?

কোনও দিকে ধূম দেখা যায় কি না ইহা লক্ষ্য করিবার জন্য চন্দ্রচূড় চারিদিগে চাহিতে লাগিলেন,—দেখিলেন গড়ের সম্মুখে যেখানে রাজবাটীর ঘাট, সেই খান হইতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, ধূমরাশি, আকাশমার্গে উঠিয়া, পবন পথে চলিয়া যাইতেছে।

তখন চন্দ্রচূড়ের স্মরণ হইল যে ঘাটের উপরে, গাছের তলায়, একটা তোপ আছে। কোন শত্রুর নৌকা আসিয়া ঘাটে না লাগিতে পারে, এ জন্য সীতারাম সেখানে একটা কামান রাখিয়াছিলেন—কেহ এখন সেই কামান ব্যবহার করিতেছে, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু সে কে? গঙ্গারামের একটি শিপাহীও বাহির হয় নাই—এখনও ফটক বন্ধ। মৃণ্ময়ের শিপাহীরা অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। মৃণ্ময় যে কোন শিপাহী ঐ কামানের জন্য রাখিয়া যাইবেন, ইহা অসম্ভব, কেন না দুর্গ রক্ষার ভার গঙ্গারামের উপর আছে। কোন বাজে লোক আসিয়া

কামান ছাড়িল—ইহাও অসম্ভব, কেন না বাজে লোকে গোলা বারুদ কোথা পাইবে? আর এরূপ অব্যর্থ সন্ধান—বাজে লোকের হইতে পারে না—শিক্ষিত গোলন্দাজের। কার এ কাজ? চন্দ্রচূড় এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে আবার সেই কামান বজ্রনাদে চতুর্দ্দিক শব্দিত করিল—আবার ধূমরাশি আকাশে উঠিয়া নদীর উপরিস্থ বায়ুস্তরে গগণ বিচরণ করিতে লাগিল—আবার মুসলমান সিপাহী পরিপূর্ণ আর একখানি নৌকা জলমগ্ন হইল।

"ধন্য! ধন্য!" বলিয়া চন্দ্রচূড় করতালি দিতে লাগিলেন। নিশ্চিত এই সেই মহাদেবী! বুঝি কালিকা সদয় হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। জয় লক্ষ্মীনারায়ণ জী! জয় কালী! জয় পুররাজলক্ষ্মী! তখন চন্দ্রচূড় সভয়ে দেখিলেন, যে যে সকল নৌকা অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিল—অর্থাৎ যেসকল নৌকার সিপাহীদের গুলি তীর পর্য্যন্ত পৌঁছিবার সম্ভাবনা, তাহারা তীর লক্ষ করিয়া বন্দুক চালাইতে লাগিল। ধূমে সহসা নদীবক্ষ অন্ধকার হইয়া উঠিল—শব্দে কান পাতা যায় না। চন্দ্রচূড় ভাবিলেন, "যদি আমাদের রক্ষক দেবতা হয়েন—তবে এ গুলিবৃষ্টি তাঁহার কি করিবে? আর যদি মনুষ্য হয়েন, তবে, আমাদের জীবন এই পর্য্যন্ত—এ লোহা-বৃষ্টিতে কোন মনুষ্যই টিকিবে না।"

কিন্তু আবার সেই কামান ডাকিল—আবার দশদিক কাঁপিয়া উঠিল—ধূমের চক্রে ধূমাকার বাড়িয়া গেল—আবার সসৈন্য নৌকা ছিন্ন হইয়া ডুবিয়া গেল।

তখন একদিকে—এক কামান—আর এক দিকে শত শত মুসলমান সেনায়, তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। শব্দে আর কাণ পাতা যায় না। উপর্য্যুপরি, গম্ভীর, তীব্র, ভীষণ, মুহুর্মুহুঃ ইন্দ্রহস্ত পরিত্যক্ত বজ্রের মত, সেই কামান ডাকিতে লাগিল,—প্রশস্ত নদীবক্ষ, এমন ধূমাচ্ছন্ন হইল যে চন্দ্রচূড় সেই উচ্চ সৌধ হইতে উত্তালতরঙ্গসংক্ষুব্ধধূম সমুদ্র ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাইলেন না। কেবল সেই তীব্রনাদী বজ্রনাদে বুঝিতে পারিলেন—যে এখনও হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী দেবী জীবিতা আছেন। চন্দ্রচূড় তীব্র দৃষ্টিতে ধূমসমুদ্রের বিচ্ছেদ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন—এই আশ্চর্য্য সমরের ফল কি হইল—দেখিবেন।

ক্রমে শব্দ কম পড়িয়া আসিল—একটু বাতাস উঠিয়া ধুঁয়া উড়াইয়া লইয়া গেল—তখন চন্দ্রচূড় সেই জলময় রণক্ষেত্র পরিষ্কার দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন যে ছিন্ন, নিমগ্ন নৌকা সকল স্রোতে উলটি পালটি করিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। মৃত ও জীবিত সিপাহীর দেহে নদী স্রোতঃ ঝটিকাশান্তির পর পল্লবকুসুম সমাকীর্ণ উদ্যানবৎ দৃষ্ট হইতেছে। কাহারও অস্ত্র, কাহারও বস্ত্র, কাহারও বাদ্য, কাহারও উষ্ণীষ্‌ কাহারও দেহ ভাসিয়া যাইতেছে—কেহ সাঁতার দিয়া পলাইতেছে—কাহাকেও কুম্ভীরে গ্রাস করিতেছে। যে কয়খানা নৌকা ডোবে নাই—সে কয়খানা, নাবিকেরা প্রাণপাত করিয়া বাহিয়া সিপাহী লইয়া অপর পারে পলায়ণ করিয়াছে। একমাত্র বজ্রের প্রহারে আহত আসুরী সেনার ন্যায় মুসলমান সেনা রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল।

দেখিয়া চন্দ্রচূড় হাত যোড় করিয়া উর্দ্ধমুখে, গদ্গদকণ্ঠে, সজল নয়নে বলিলেন "জয় জগদীশ্বর! জয় দৈত্যদমন, ভক্তত্তারণ ধর্ম্মরক্ষণ হরি! আজ বড় দয়া করিলে! আজ তুমি স্বয়ং সশরীরে যুদ্ধ করিয়াছ, নহিলে এই পুর-রাজলক্ষ্মী স্বয়ং যুদ্ধ করিয়াছেন, নহিলে, তোমার দাসানুদাস, সীতারাম আসিয়াছে। তোমার সেই ভক্ত ভিন্ন, এ যুদ্ধ মনুষ্যের সাধ্য নহে।"

তখন চন্দ্রচূড়, প্রাসাদশিখর হইতে অবতরণ করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কামানের বন্দুকের হুড়মুড় হুড়মুড় শুনিয়া গঙ্গারাম মনে ভাবিল—এ আবার কি? লড়াই কে করে? সেই ডাকিনী নয় ত? তিনি কি দেবতা? গঙ্গারাম একজন জমাদ্দারকে দেখিতে পাঠাইলেন। জমাদ্দার নিক্রান্ত হইল। সে দিন, সেই, প্রথম ফটক খোলা হইল।

জমাদ্দার ফিরিয়া গিয়া নিবেদন করিল,

"মুসলমান লড়াই করিতেছে।"

গঙ্গারাম বিরক্ত হইয়া বলিল "তা ত জানি। কার সঙ্গে মুসলমান লড়াই করিতেছে?"

জমাদ্দার বলিল, "কারও সঙ্গে নহে।"

গঙ্গারাম হাসিল, "তাও কি হয় মূর্খ! তোপ কার?"

জমাদ্দার। হুজুর, তোপ কারও না।

গঙ্গারাম বড় রাগিল। বলিল, "তোপের আওয়াজ শুনিতেছিস না?"

জমাদ্দার। তা শুনিতেছি।

গঙ্গারাম। তবে? সে তোপ কে দাগিতেছে?

জমা। তাহা দেখিতে পাই নাই।

গঙ্গা। চোখ কোথা ছিল।

জমা। সঙ্গে।

গঙ্গা। তবে তোপ দেখিতে পাও নাই কেন?

জমা। তোপ দেখিয়াছি—ঘাটের তোপ।

গঙ্গা। বটে! কে আওয়াজ করিতেছে?

জমা। গাছের ডাল।

গঙ্গা। তুই কি ক্ষেপিয়াছিস্? গাছের ডালে তোপ করে?

জমা। সেখানে আর কাহাকে দেখিতে পাইলাম না—কেবল কতক-গুলা গাছের ডাল তোপ ঢাকিয়া নুড়িয়া পড়িয়া আছে দেখিলাম।

গঙ্গা। তবে কেহ ডাল মোড়াইয়া বাঁধিয়া তাহার আশ্রয়ে তোপ দাগিতেছে। সে বুদ্ধিমান্ সন্দেহ নাই। সিপাহীরা তাহাকে লক্ষ করিতে পারিবে না কিন্তু সে পাতার আড়াল হইতে তাহাদের লক্ষ করিবে। ডালের ভিতর কে আছে, তা দেখে এলি না কেন?

জমা। সেখানে কি যাওয়া যায়?

গঙ্গা। কেন?

জমা। সেখানে বৃষ্টির ধারার মত গুলি পড়িতেছে?

গঙ্গা। গুলিতে এত ভয় ত এ কাজে এসেছিলি কেন?

তখন গঙ্গারাম অনুচরকে হুকুম দিল যে জমাদ্দারের পাগড়ি পোষাক

কাপড় সব কাড়িয়া লয়। যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখিয়া মৃন্ময় বাছা বাছা জন কত হিন্দুস্থানীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং দুর্গ রক্ষার জন্য তাহাদের রাখিয়া গিয়াছিলেন। গঙ্গারাম তাহাদিগের মধ্যে চারিজনকে আদেশ করিল,

"যেখানে ঘাটের উপর তোপ আছে সেইখানে যাও। যে কামান ছাড়িতেছে, তাহাকে ধরিয়া আন।"

সেই চারিজন শিপাহী যখন তোপের কাছে আসিল, তখন যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, হতাবশিষ্ট মুসলমানেরা বাহিয়া যাইতেছে। তাহারা গাছের ডালের ভিতর গিয়া দেখিল—তোপের কাছে, একজন মানুষ মরিয়া পড়িয়া আছে—আর একজন জীবিত, পলিতা হাতে করিয়া বসিয়া আছে। সে খুব জোওয়ান, ধুতি মালকোঁচা মারা, মাথায় মুখে গালচাল্লা বাঁধা, সর্ব্বাঙ্গে বারুদে আর ছাইয়ে কালো হইয়া আছে। চারিজন আসিয়া তাহাকে ধরিল। বলিল,

"তোম কোন হো রে!"

সে বলিল, "কেন বাপু!"

"তোম কিয়া ওয়াস্তে হিয়া বৈঠ বৈঠকে তোপ ছোড়তে হো?"

"কেন বাপু তাতে কি দোষ হয়েছে? মুসলমানের সঙ্গে তোমরা মিলেছ?"

"আরে মুসলমান আনেসে হমলোক আভি হাঁকায় দেতে—তোম কাহেকো দিক্ কিয়ে হো। চল হুজুরমে বানে হোগা?"

"কার কাছে যাব?"

"কোতোয়াল সাহেব কি হুকুম, তোমাকো উন্‌কা পাশ লে যাঙ্গে।"

"আচ্ছা যাই। আগে নেড়েরা বিদায় হোক। যতক্ষণ ওদের মধ্যে একজনকে ওপারে দেখা যাইবে, ততক্ষণ তোরা কি, তোদের কোতোয়াল এলে উঠিব না। ততক্ষণ দেখ দেখি, যে মানুষটা মরিয়া আছে, ও কে চিনিতে পারিস কি না?"

শিপাহীরা, দেখিয়া বলিল "হাঁ, হমলোকত ইস্কো পাচানতে হেঁ। যে ত হমারা গোলন্দাজ পিয়ারীলাল হৈ—যে কাঁহা সে আয়া?"

"তবে ওকে আগে গড়ের ভিতর নিয়ে যা—আমি যাচ্ছি।"

শিপাহীরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, "যে আদমি ত আচ্ছা

বোল্‌তা হৈ। যো তোপ্‌কা পাশ রহেগা, ওসিকো লে যানেকা হুকম্‌ হৈ॥ এই মুরদার তোপকা পাশ হৈ—ওসকো আলবৎ লে যানে হোগা।"

কিন্তু মড়া—হিন্দু শিপাহীরা তাহাকে ছুঁইবে না। তখন পরামর্শ করিয়া একজন শিপাহী ডোম ডাকিতে গেল—আর তিনজন তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

এদিগে কালি বারুদ মাখা পুরুষ, ক্রমে ক্রমে দেখিলেন, যে মুসলমান শিপাহীরা সব তীরে গিয়া উঠিল। তখন তিনি শিপাহীদিগকে বলিলেন,

"চল বাবা তোমাদের কোতোয়াল সাহেবকে সেলাম করি গিয়া চল।" শিপাহীরা সে ব্যক্তিকে ধরিয়া লইয়া চলিল।

সেই সমবেত সজ্জিত দুর্গরক্ষক সৈন্য মণ্ডলী মধ্যে যেখানে ভীরু নাগরিকগণ পীপিলিকা-শ্রেণীবৎ সারি দিয়া দাঁড়াইয়া আছে—সেই খানে শিপাহীরা সেই কালিমাখা বারুদমাখা পুরুষকে আনিয়া খাড়া করিল।

তখন সহসা জয়ধ্বনি আকাশ পূরিয়া উঠিল। সেই সমবেত সৈনিক ও নাগরিক মণ্ডলী, একেবারে সহস্রকণ্ঠে গর্জ্জন করিল,

"জয় মহারাজ কি জয়।"

"জয় মহারাজাধিরাজ কি জয়।"

"জয় শ্রীসীতারাম রায় রাজা বাহাদুর কি জয়।"

"জয় লক্ষ্মী নারায়ণ জী কি জয়।"

চন্দ্রচূড় দ্রুত আসিয়া সেই বারুদমাখা মহাপুরুষকে আলিঙ্গন করিলেন; বারুদমাখা পুরুষ ও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। চন্দ্রচূড় বলিলেন,

"সমর দেখিয়াই আমি জানিয়াছি, তুমি আসিয়াছ। মনুষ্য লোকে, তুমি ভিন্ন এ অব্যর্থ সন্ধান আর কাহারও নাই। এখন অন্য কথার আগে গঙ্গারামকে বাঁধিয়া আনিতে আজ্ঞা দেও।"

সীতারাম সেইরূপ আজ্ঞা দিলেন। গঙ্গারাম সীতারামকে দেখিয়া সরিয়া পড়িতেছিল, কিন্তু শীঘ্র ধৃত হইয়া সীতরামের আজ্ঞাক্রমে কারাবদ্ধ হইল।

সংসার।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মেয়ে মহলের মতামত।

শরৎ বাবু যেই বাটী হইতে বাহির হইয়া গেলেন, অমনি দেবী বাবুর বাড়ীর একটী ঝি ঠাকুরের প্রসাদ এক থাল ফল ও মিষ্টান্ন লইয়া আসিল। ঝি থাল নামাইয়া বলিল "মাঠাকরুণ তোমাদের জন্য এই ঠাকুরের প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়েছেন গো! অনেক বাড়ীতে যেতে হয়েছিল তাই আসতে একটু রাত হোল।"

বিন্দু। "থাল রাখ বাছা, ঐ রকে রাখ, কাল আমাদের ঝিকে দিয়া থালা পাঠাইয়া দিব।"

ঝি রকের উপর থাল রাখিল। গার কাপড় খানা একটু টানিয়া গায়ে দিয়া একটু মুখ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, গালে একটী আঙ্গুল দিয়া একটু মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসিতে লাগিল।

বিন্দু। "কি লো কি হয়েছে? তোদের বাড়ীতে পূজার কোন তামাসা টামাসা হয়েছে নাকি, তাই বলতে এসেছিস?"

ঝি। হেঁ তামাসাই বটে, ভদ্দর নোকের ঘরে হলেই তামাসা, আমাদের ঘরে হলেই নোকে পাঁচ কথা কয়?"

বিন্দু। "কি লো, কি তামাসা, কোথায় হয়েছে?"

ঝি। "না বাপু, আমরা গরিবগুরবো নোক, আমাদের সে কথায় কায কি বাপু। তবে কি জান, নোকে এ সব দেখলেই পাঁচ কথা কয়।"

বিন্দু। "কি দেখলি রে, ভেঙ্গেই বল্ না।"

ঝি আর একবার কাপড়টা জোর করে নিয়া আর একটু মুচকে হাসিয়া বলিল—"বলি ঐ ছোঁড়াটা এত রাত্তিরে বেরিয়ে গেল, ও কে গা?"

বিন্দু একটু ভীত হইলেন। সদর দরজাটি এতক্ষণ খোলা ছিল, ঝি কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শরতের কথাগুলি শুনিয়াছে? একটু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,

"তুই কি চখের মাথা খেয়েছিস? শরৎ বাবু এসেছিলেন চিন্‌তে পারিস নি? তুই কি আজ নেক্‌রা কর্‌তে এসেছিস?"

ঝি। "না চক্ষের মাথা খাই নি গো, শরৎ বাবু তা চিনেছি। তা ভদ্দর নোকের ছেলে কি ভদ্দর নোকের মেয়ের সঙ্গে অমনি করে হাত কাড়াকাড়ি করে? জানি নি বাবু তোমাদের পাড়াগাঁয়ে কি নিয়ম, আমি এই উনত্রিশ বছর কলকেতায় চাক্‌রি কর্‌ছি, কৈ এমন ধারাটী দেখি নি। তা ভদ্দর নোকের কথায় আমাদের কায কি বাবু? আমরা দুবেলা দুপেট খেতে পাই তাই ভাল, আমাদের ও সব কথায় কায কি?"

দেবীবাবুর বাড়ীর ঝি গুলা বড় বেয়াড়া তাহা বিন্দু পূর্ব্বেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু অদ্য এই ঝির এই বিদ্রূপপূর্ণ অঙ্গভঙ্গী ও কথা শুনিয়া মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু ক্রোধে আরও অনিষ্ট হইবে জানিয়া তাহা সম্বরণ করিয়া কহিলেন,

"ও কি জানিস ঝি, শরৎ বাবুর মা ত বে দেয় না তাই বাসায় একলা থেকে বই পড়ে পড়ে পাগলের মত হয়ে গিয়েছে, কি বলে, কি কয়, তার ঠিক নেই।"

ঝি। "হেঁ গা তা শরৎ বাবু পাগলই হউক আর ছাগলই হউক পরের বাড়ী এসে উৎপাৎ করে কেন? বে-পাগলা হয়ে থাকে একটা বে করুক গে, তোমাকে এসে টানাটানি করে কেন তোমাকে বে করতে চায় নাকি?"

বিন্দু। "দূর মাগী পোড়ারমুখী! তোর মুখে কি কথা আটকায় না না? যা মুখে আসে তাই বলিস? শরৎ বাবু একটী মেয়েকে দেখেছেন তার সঙ্গে বে করতে চায়। তা শরৎ বাবু সে কথা বাড়ীর কাউকে বলতে পারে না, লজ্জা করে, তাই আমার কাছে বলতে এসেছিল।"

ঝি। সে কে গা? কোন্ মেয়েটী?

বিন্দু। "তা জান্‌বি এখন, সম্বন্ধ যদি ঠিক হয় তোরা সব্বাই জান্‌বি।"

ঝি। "হেঁ গা, আর লুকালে চলবে কেন? আমরা কি আর কিছু জানিনি গা? আমরা ত আর বুড়ো হাবড়া হই নি, চোক্ষের মাথাও খাই নি, কানের মাথাও খাই নি। ঐ যে সুধা সুধা করে চেঁচিয়ে শরৎ বাবু কাঁদ-ছিলেন, যেন সুধার জন্য বুক ফেটে যাচ্ছিল, তা কি আর শুনিনি গা? এ কথা তোমরা বলবে কেন? এ কথা কি ভদ্দর নোকে বলে, না কেউ কখনও শুনেছে। বিধবার আবার বিয়ে? ও মা ছি! ছি! ছি! ভদ্দর নোককে দণ্ড-বৎ, আমাদের ঘরে এমন কথাটী হোলে তাকে একঘরে করে। ও মা ছি! ছি! ছি! এমন কলঙ্কের কথা কি কেউ কোথাও শুনেছে; এ ভদ্দরের ঘর? মুচি মুচুনমানের ঘরে ত এমন কথা কেউ শুনে নি। ও মা ছি! ছি! ছি! ও মা অবাক্ কল্লে মা, ও মা কোথা যাব মা"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিন্দু। এবার যথার্থই ভীত হইলেন। বড় মানুষের ঘরের গর্ব্বিণী মন্দভাবিণী ঝি যতক্ষণ তাঁহার উপর ব্যঙ্গ করিতেছিল ততক্ষণ বিন্দু সহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু সুধার নামে এ কলঙ্ক রটাইবে ভাবিয়া বিন্দু হতজ্ঞান হইলেন। শরতের পাগলামি প্রস্তাবে তিনি কখনই সম্মত হইবেন না স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু বিধবার নামে সামান্য মিথ্যা কলঙ্কও বড় ভয়ানক, মিথ্যা সত্য কেহ ভাবে না, কলঙ্ক চারি দিকে বিস্তৃত হয়, অপনীত হয় না।

বুদ্ধিমতী বিন্দু তখন একটু চিন্তা করিয়া বাক্স হইতে একটী টাকা বাহির করিলেন। অন্য দিন দেবী বাবুর বাটী হইতে খাবার আসিলে ঝিদের দুই আনা পয়সা দিতেন, অদ্য সেই টাকাটী ঝিয়ের হাতে দিয়া বলিলেন,

"ঝি, তুই দেবী বাবুর বাড়ীতে অনেক দিন আছিস, পূজার সময় তোকে আর কি দিব, এই একটী টাকা নিয়ে যা, একখানা নূতন কাপড় কিনিস। আর শরৎ যে পাগলের মত কতগুলা বলে চেঁচাইয়াছে সে কথা আর কাউকে বলিস নি। আজ দশমীর দিন, বোধ হয় কোথাও সিদ্ধি খেয়ে এসে ছিল, তাই পাগলের মত বকেছিল। তা পাগলের কথা কি ধরিতে আছে, ভদ্র

ঘরে এমনও কি হয়, আমাদের একটু মান সম্ভ্রমও আছে, শরৎ বাবুর ও মা আছেন, বোন আছেন, এমন কাযও কি হয়ে থাকে ? তা পাগলের কথা যা শুনেছিস্ শুনেছিস্, কাউকে বলিস নি‚বাছা, এ পাগলামি কথা যেন কেউ টের পায় না।”

চক্‌চকে টাকাটী দেখিয়া ঝির মত একটু ফিরিল, (অনেকেরই ফেরে) সে বলিল,

“তা বৈ কি মা, পাগলের কথা কি ধর্‌তে আছে না বল্‌তে আছে ? শরৎ বাবু একটু সিদ্ধি খেয়েছিলেন বই ত নয়, এই আমাদের বাড়ীর ছেলেরা যে বোথল বোথল কি আনাচ্চে আর খাচ্চে। আর কি বা আচরণ, রাত্রিতে কি বাড়ী থাকে না, বাপ মাকে একটু ভয় করে না, লজ্জা করে না। এখনকার সব অমনি হয়েছে গো, তা এখনকার ছেলেদের কথা কি ধর্‌তে আছে ? শরৎ বাবু যা বলেছে বলেছে, তা সে কথা কি আমি মুখে আনতে পারি, না কাউকে বলতে পারি ? কাউকে বল্‌ব না মা, তুমি কিছু ভেবো না।”

ঝি তুষ্ট হইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইল। বলা বাহুল্য যে মুহূর্ত্তের মধ্যে তারের সংবাদ যেমন জগতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করে, বিন্দুর বাড়ীর কথা সেই রাত্রিতেই সেইরূপ ভবানীপুর, কালীঘাট, কলিকাতা অতিক্রম করিল। পরদিন প্রাতে টি টি পড়িয়া গেল।

দেবী বাবুর মহিষী পরদিন পা ছড়াইয়া তেল মাখিতে মাখিতে এই কলঙ্ক কথা শুনিয়া একেবারে ভেক দর্শনে সর্পের ন্যায় ফোঁস করিয়া উঠিলেন।

“হেঁ গা, তা হবে না কেন গা, তা হবে না কেন ? এখন ত আর ভদ্দর ইতরে বাচ বিচার নেই, যত ছোট লোক পাড়া গাঁ থেকে এসে কায়েত বলে পরিচয় দেয়, অমনি কায়েত হয়ে যায়। ওদের চোদ্দ পুরুষে কেউ কায়েতের সঙ্গে ক্রিয়া কর্ম্ম করেছে, না কায়েতের মান রাখতে জানে ? ওদের সঙ্গে আবার খাওয়া দাওয়া,—মিন্সের ঘটে ত বুদ্ধি নেই তাই ওদের সঙ্গে চলা ফেরা করে। দেব এখন আজ মিন্সেকে দু কথা শুনিয়ে, আপনার মান মর্য্যাদা জানে না, ভারি হৌসে কর্ম্ম হয়েছে, তা যার তার সঙ্গে চলা

ফেরা করে। ওগো আমি তখনই বুঝেছি গো তখনই বুঝেছি, যখন ভবানী-পুরে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা কত্তে বার হয় না, ডেকে পাঠাতে হয়, তখনই বুঝেছি কেমন কায়েত। আর সেই অবধি আর আসা হয় নি, জাঁক কত, ঐ বিধবা ছুড়ীটাকে আবার পাড়ওলা কাপড় পরাণ হয়, কত আদর করা হয়। তা হবে না? এ সব হবে না? যেমন জাত, তেমনি আচরণ, হাড়ী মুচিদের ঘরে আর কি হবে? ঐ যে মুচুনমানদের বিধবার নিকে হয় না? এ তাই গো তাই।"

শ্যামীর মা। (গৃহিণীর ব্যথার জন্য বুকে ও হাতে ঘন ঘন তৈল মার্জ্জন করিতে করিতে) "তা না ত কি বন্ ওরা আবার কায়েত! কায়েত হলে বিধবাটাকে অমনি করে রাখে। ও মা ঐ ছুড়ীটা আবার একাদশীর দিন জল টল খায়, গায়ে তেল মাখে, মাছ না হলে ভাত খাওয়া হয় না, ছি! ছি! ছি! এই আজ একাদশী, কেউ বলুক দিকি যে সকাল থেকে একটু জল গ্রহণ করেছি।"

বামীর মা। (গৃহিণীর চুলে তেল মাখাইতে মাখাইতে,) "আবার শুদ্ধ তাই, আবার গাড়ী করে ঐ ছুড়ীটাকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়, শরৎ বাবু আবার ওটাকে নাকি রোজ রোজ দেখতে আসে! ছি! ছি! লজ্জার কথা, লজ্জার কথা।"

গৃহিণী। "অমন মেয়েকেও ধিক্! মেয়ের মাকেও ধিক্! অমন মেয়ে কি গর্ব্ভে ধারণ করে, অমন মেয়ে জন্মালে মুখে নুন দিয়ে মেরে ফেল্‌তে হয়। বিধবা হয়েছে তবু লজ্জা নেই, মাথার কাপড় খুলে শরতের সঙ্গে ছাতে বেড়ান হয়, শরতের জন্য মিস্ত্রিরপানা করে পাঠান হয়, তা শরৎ বাবুর কি দোষ বল, পুরুষের মন বৈ ত নয়, তাতে আবার বে থা হয় নি, ছুটো বোনে অমন করে ছেলেমাঁনুষকে ভোলালে সে আর ভুল্‌বে না? অমন মেয়ের মুখ দেখতে আছে? ঝেঁটা মার, ঝেঁটা মার।"

এইরূপে গৃহিণী ও তাঁহার সঙ্গিনীদিগের সুমিষ্ট কণ্ঠধ্বনি ক্রমে সপ্তমে চড়িতে লাগিল, বিন্দুর মা, বিন্দুর বাপ, বিন্দুর চতুর্দ্দশ পুরুষ অবধি যাবতীয় পুরুষ স্ত্রীর বিশেষ স্তুতিবাদ করা হইল, রোষে গৃহিণীর বুকের ব্যাথাটা বড়ই বাড়িল, ঘন ঘন কবিরাজ আসিতে লাগিল, সন্ধ্যার সময় বাবু আপিস থেকে

আসিয়া গৃহিণীর পীড়া দেখিতে আসিয়া যেরূপ মধুর আলাপ শ্রবণ করিলেন, পাপিষ্ঠ মনুষ্য ভাগ্যে সেরূপ কদাচ ঘটে।

গৃহিণীর গলার শব্দ শুনিয়া ঝি বৌরা পাতকো তলায় জড় সড় হইয়া কানা কানি করিতে লাগিল।

প্রথমা। "কি লো কি হয়েছে, অত চেঁচাচেঁচি কেন?

দ্বিতীয়া। "ওলো তা শুনিস নি, তবে শুনিছিস কি?"

প্রথমা। "ওলো কি লো কি?"

দ্বিতীয়া। "ওলো ঐ যে হেম বাবু বলে পাড়াগাঁ থেকে এসেছে, সেই তার স্ত্রী আর শালী আমাদের বাড়ী একদিন এসেছিল, তা সেই শালী নাকি বিধবা, তার আবার শরৎ বাবুর সঙ্গে বে হবে।"

তৃতীয়া। "দূর পোড়া কপালী! তাও কি হয় লো, বিধবার আবার বিয়ে হয়?"

দ্বিতীয়া। "তা হবে না কেন, ঐ যে বিদ্যাসাগর বলে বড় পণ্ডিত আছে, ঐ যার সীতার বনবাস তুই সেদিন পড়ছিলি, ঐ সেই নাকি বলেছে বিধবার বিয়ে হয়। সে নাকি কয়েকজন বিধবার বিয়ে দিয়েছে।"

চতুর্থা। "সে ত বড় রসের সাগর লো, বিধবার আবার বিয়ে দেয়? তা বিধবা যদি বুড়ী হয় তবুও বিয়ে হয়?"

দ্বিতীয়া। "তা হবে না কেন, ইচ্ছে করলেই হয়।"

চতুর্থা। "তবে শামীর মা আর বামীর মা কি দোষ করেছেন, চুরি করে করে দুধ টুকু খান, মাচ টুকু খান;—তা বিদ্যাসাগরকে বলে বিয়ে করলেই হয়, আর কিছু লুকোতে চুরোতে হয় না।"

প্রথমা। "চুপ কর লো চুপ কর, এখনই শুনতে পেলে বোকে কাটিয়ে দেবে। তা শরৎ বাবু শুনেছি ভাল ছেলে, তিনি এমন করেন কেন?"

দ্বিতীয়া। "আর ভাল ছেলে, বলে যার সঙ্গে যার মজে মন, কিবা হাড়ী কিবা ডোম! ভাল ছেলে হলে কি হয়, ফুট্‌ফুটে মেয়েটী দেখেছে মন ভুলে গেছে।"

তৃতীয়া। "হে দিদি সে হেমবাবুর শালীর বয়স কত গা।"

দ্বিতীয়া। "বয়সও ১৩। ১৪ বৎসর হয়েছে, দেখতেও সুন্দর, হেসে

হেসে শরৎ বাবুর সঙ্গে কথা কয়, মিস্ত্রির পানা খাওয়ায়, তার সঙ্গে না জানি কি খাওয়ায়, তাতে আর শরৎ বাবু ভুলবে না, হাজার হোক পুরুষের মন তো।"

চতুর্থা। "তবে শরৎ বাবুর সঙ্গে সে মেয়েটীর অনেক দিনের আলাপ ?"

দ্বিতীয়া। "তবে আর শুনছিস কি, এ রসের কথা বুঝলি কি ? আলাপ সেই পাড়া গাঁ থেকে। কি জানি বাবু সে খানে কি হয়েছে, না জেনে শুনে পরের নিন্দে করা ভাল নয়, কিন্তু কলকেতায় এসে যে চলানটা চলিয়েছে তা আর ভবানীপুরে কে না জানে। ওলো শরৎ বাবু সেই মেয়েটীকে নিয়ে আপনার বাড়ীতে কতদিন রাখে, তার বন আর হেমবাবুও সেই বাড়ীতে ছিলেন। হেমবাবু নাকি গতিক মন্দ বুঝে আলাদা বাড়ী করলে, তা সেখানে অমনি রাধিকা বিরহ বেদনায় অচেতন হয়ে পড়লেন—নতা করলেন, যে ভারি জ্বর হয়েছে, আবার আমাদের কৃষ্ণঠাকুর সেখানে গিয়ে উপস্থিত! ওলো এ ঢের কথা লো, বলি বিদ্যাসুন্দর পড়িছিস, এ তাই লো ভাই। এখনকার ছেলেরা সব সুড়ঙ্গ কাট্‌তে শিখেছে, দেখিস্ লো সাবধান।"

চতুর্থা। "দূর পোড়ারমুখী।"

দাসী মহলেও বড় হুলস্থুল পড়িয়া গেল। বুড়ি ঝির কাছে শুনে নবীনা ঝিরা সকাল থেকে বারাণ্ডায়, উঠানে, রান্নাঘরে কানাকানি করিতেছে আর ফিস্ ফিস্ করিতেছে। একজন তন্বঙ্গী নবীনা বলিল,

"হেলা এ কি সত্তি লা, সত্তি কি বিধবার বিয়ে হবে নাকি ?"

স্থূলাঙ্গী নবীনা উত্তর করিল "তবে শুনিচিস্ কি, সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে, পত্তর হয়ে গেছে, হেমবাবু সেকরাকে গয়না গড়াইতে দিয়েছে, আর তুই এখনও হবে কি না, জিজ্ঞেস করচিস ?"

তন্বঙ্গী। "তবে ত এটা চলন হয়ে যাবে ? ভদ্দর ঘরে হলে তো ছোট লোকের ঘরেও হবে ?"

স্থূ। "কেন লো তোর আবার সঁক গেছে নাকি ? ঐ, ঐ কৈবর্ত্ত ছোড়াটাকে বে করবি নাকি, ঐ তোদের কে হয় না ? ঐ যে ফিস্ ফিস্ করে তোর সঙ্গে সদাই কথা কয়।"

ত। "দূর পোড়ারমুখী! অমন কথা আমাকে বলিস নি তোর আপনার

মনের কথা বলছিস বুঝি? ঐ যে তোদের জেতের সদানন্দ বেণে আছে না, তার সে দিন বৌ মরে গেছে, তার এখন ভাত রেঁদে দেয় এমন লোকটি নেই। তা ধনে মশলা কেনবার নতা করে যে ঘন ঘন তার দোকানে যাওয়া হয়, বলি তার ঘর করতে ইচ্ছে টিচ্ছে হয় নাকি?

স্থ। "তোর মুখে আগুন।"

এইরূপে দুই জন নবীনা পরস্পরের মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতেছে এমন সময় এক জন বৃদ্ধা দাসী আসিয়া বলিল "কি লো তোরা গালাগালি করচিস কেন লো?"

স্থ। "না গো কিছু নয়, এই শরৎ বাবুর বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে তাই বলছিনু। ভদ্দর যাই করে তাই সাজে গা, আর আমাদের সময় যত কলঙ্ক!"

বৃদ্ধা। "তা এটা কি ভদ্দরের কায, এত মুচুনমানের কায।"

স্থ। "তবে হেমবাবু এমন কায করেন কেন।"

বৃদ্ধা। "করেন তার কারণ আছে তোরা কি জানবি বল, তোরা কাণে তুলো দিয়ে থাকিস এ কথার কি জানবি বল।"

উভয় নবীনা। "কি, কি, বল্ না দিদি, এর কথাটা কি?"

বৃদ্ধা। বলি শুনিস নি বুঝি, হেম বাবু যে এখন আর না বিয়ে দিয়ে পারে না, সে কথা শুনিস নি বুঝি?"

উভয়ে। "না, না, কি, কি?"

বৃদ্ধা। "এই শুনবি আয় কাণে কাণে বলি।" উভয় নবীনা কায কর্ম্ম ফেলিয়া বৃদ্ধার কাছে দৌড়াইয়া আসিল। বৃদ্ধা তাদের কাণে কাণে বলিল,—সে শব্দটী তেতালা পর্য্যন্ত ও বার বাড়ী পর্য্যন্ত শুনা গেল,—"বলি শুনিস নি, হেম বাবুর শ্যালী যে পোয়াতী!"

সত্যের আবিষ্কার হইতে লাগিল, সত্য প্রচারিত হইতে লাগিল!

ভবানীপুর হইতে কালীঘাট পর্য্যন্ত খবর গেল। কালীতারার তিন খুড় শাশুড়ী সে দিন একাদশী করিয়া রুক্ষস্বভাব হইয়া আছেন, তাঁহারা এই সংবাদ শুনিয়া একেবারে তেলেবেগুণে জ্বলে গেলেন। বড়টী একটু ভাল মানুষ, তিনি বলিলেন,

"এখনকার কালে আর ধর্ম্ম নেই, বাচ বিচার নেই, যার যা ইচ্ছা সে তাই করে। করুক গে বাবু, যে পাপ করবে সেই নরক ভুগবে, আমাদের সে কথায় কায কি?"

ছোটটী বলিলেন "কি হয়েছে কি হয়েছে আমাদের বৌয়ের ভাই বিধবা বে করবে? ও মা কি ঘেন্নার কথা গা, ছি! ছি! ছি! লোকেরা কি এখন মান সম্ভ্রম নেই, একটু লজ্জা নেই যা ইচ্ছে তাই করে? এ যে হাড়ী ডোমেও এমন কায করে না, এ যে আমাদের কুলে কালী পড়লো, এ যে ছোট লোকের মেয়ে বিয়ে করে আপনার কুলটা মজালেন। ও ম ছি! ছি! ছি!"

মেজটী একেবারে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া কালীতারাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ও পোড়ারমুখী, ও হারামজাদী, বলি হেঁলা, এই তোদের মনে ছিল না? ওলো গলায় দড়ী দিবার জন্য কি একটা পয়সা মেলেনি না? বলি কলসী গলায় বেঁধে আদি গঙ্গায় ডুবে মরিস নি কেন? মর, মর, মর। আমাদের কুলে এই লাঞ্ছনা! ওলো বাগ্দীর মেয়ে! বলি শ্বশুর কুল টা একেবারে ডোবালি রে? তা রোস না, বে হোক না, তোরই একদিন কি আমারই একদিন। মোড়া দিয়ে তোর মুখ ভোঁতা করে দিব না, তোর পিটে মুড়ো খেংরা ভাঙ্গবো না? মাথায় ঘোল ঢেলে তোকো ঝেঁটা মেরে যদি বের করে না দি, তবে আমি কায়েতের মেয়ে নই।"

কালীতারা কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা হইল,—সন্ধ্যার সময় বিন্দুকে চিঠি লিখিলেন।

"বিন্দুদিদি, এ কি কথা, এ ত আমি শুনিনি, এ অপযশ, এ নিন্দা, এ কলঙ্ক কি আমাদের কুলে?

"বিন্দুদিদি এ কাযটী করিও না। শরৎ যদি পাগল হইয়া থাকে তাকে তোমাদের বাড়ী ঢুকিতে দিও না। এ কায হলে আমি শ্বশুর বাড়ী মুখ দেখাতে পারব না, শাশুড়ীরা আমাকে আস্ত রাখবে না,—তোমার কালীতারাকে আর দেখিতে পাবে না।"

কলিকাতায় এ সংবাদ রটিল। বিন্দুর জেঠাই মা লোক দিয়া বলিয়া

পাঠাইলেন "বিন্দু তোকে আর সুধাকে আমি পেটের ছেলের মত মনে করি, পেটের ছেলের মত মানুষ করেছি। বুড়ি জেঠাই মাকে এই বয়সে খুন করিস নি, মল্লিক বংশ একেবারে কলঙ্কে ডুবাসনি। বাছা বিন্দু তোর জ্ঞান হয়েছে, বুদ্ধি হয়েছে, বাপ মার কুল নরকে ডুবাসনি। বাপ মা থাকিলে কি এমন কাযটী করতিস বাছা?

বিন্দুর মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল। বিন্দু দেখিলেন, ঝিকে যে একটী টাকা দিয়াছিলেন তাহাতে কোনও ফল হয় নাই; কলঙ্ক জগৎ সুদ্ধ রটিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পুরুষ মহলের মতামত।

হেমচন্দ্র বিন্দুর নিকট সমস্ত কথা অবগত হইয়া অন্তঃকরণে বড়ই ব্যথিত হইলেন। শরতের প্রতি তাঁহার যে ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল তাহার কিছু মাত্র লাঘব হইল না, শরতের প্রস্তাবটী তিনি পাপ প্রস্তাব মনে করিলেন না; তথাপি তিনি শান্ত স্থিতিপ্রিয় লোক ছিলেন, সমাজের মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া সকল বন্ধু বান্ধব ও স্বদেশীয় দিগকে মনে ক্লেশ দেওয়া ন্যায়সঙ্গত কার্য্য বিবেচনা করিলেন না। যাহা হউক তিনি এ বিষয়ে অনেক চিন্তা করিয়া, অনেক পরামর্শ লইয়া যাহা হউক নিষ্পত্তি করিবেন, এইরূপ স্থির করিলেন।

ভাগ্যক্রমে তাঁহার পরামর্শের অভাব রহিল না। পরামর্শ-দাতাগণ দলে দলে আসিতে লাগিলেন, 'হিতৈষী বন্ধুগণ" হিত কথা বলিতে আসিতে লাগিলেন, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ শাস্ত্রীয় কথা বলিতে আসিলেন, সমাজ-সংস্কারক-গণ প্রকৃত সংস্কার কাহাকে বলে বুঝাইতে আসিলেন; সমাজ সংরক্ষকগণ

সংরক্ষা কার্য্য বুঝাইতে আসিলেন। * ভবানীপুরে তাঁহার এত বন্ধু ছিল হেমচন্দ্র পূর্ব্বে তাহা অনুভব করেন নাই।

প্রথমে জনার্দ্দন বাবু, গোবর্দ্ধন বাবু, হরিহর বাবু প্রভৃতি বৃদ্ধ সমাজপতি গণ আসিয়া হেম বাবুর সঙ্গে অনেকক্ষণ এ দিক ও দিক কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। হেম বাবু অতি ভদ্র কায়স্থ সন্তান, তাঁহার শিষ্টাচারে সকলেই তুষ্ট আছে, তাঁহারা সর্ব্বদাই হেম বাবুর তত্ত্ব লইয়া থাকেন, ও হিত কামনা করেন, হেম বাবুর চাকুরির কি হইল, তিনি সাহেবদের সঙ্গে দেখা করিয়া ভাল করিয়া চেষ্টা করেন না কেন, তাঁহারা হেম বাবুকে কোন কোন সাহেবের কাছে লইয়া যাইবেন, ইত্যাদি অনেক স্নেহগর্ভ কথায় আপনাদিগের অকৃত্রিম স্নেহ (যাহার পরিচয় হেমবাবু ইতি পূর্ব্বে পান নাই) প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পর শরৎ বাবুর কথা উঠিল, হেম বাবুর ঘরের কথাটী উঠিল। জনার্দ্দন বাবু বলিলেন

"এখনকার কলেজের ছেলেরা সকলেই ঐরূপ, তাহারা রীতি নীতি বুঝে না, পৈত্রিক আচার অনুসারে চলে না, সুতরাং দোষ ঘটে। তা তুমি বাবু বুদ্ধিমান্ ছেলে, তুমি কি আর নির্ব্বোধের মত কায করিবে, তা আমরা স্বপ্নেও মনে করি না। তোমাকে সৎপরামর্শ দেওয়াই বাহুল্য।"

গোবর্দ্ধন বাবু। "তবে কি জান বাবা আমরা কয়েকজন বুড়া আছি, যত দিন না মরি, তোমাদেরই হিত কামনা করি, দুটা কথা না বলিলেও নয়। শরৎটা লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, আমাদের কথা টথা শুনে না, যা ইচ্ছে তাই করে, তা ওটাকে আর বড় বাড়িতে আসিতে দিও না। তা হইলেই এ কথাটা আর কেউ বড় শুনিতে পাইবে না, কে আর কার কথা মনে করে রাখে বল?"

হরিহর বাবু। "হাঁ তা বৈ কি? ঐ যে মিত্রজার বাড়ীতে সে দিন একটা কলঙ্ক উঠিল, তোমারা সে কথা অবশ্যই জান, (এই বলিয়া কলঙ্কটী আর একবার প্রকাশ করা হইল,) তা মিত্রজা বুদ্ধিমান্ লোক, চাপিয়া গেলেন, এখন আর সে কথা কে তোলে বল?"

জনার্দ্দনবাবু। "হাঁ তা বৈকি? কে বা কার কথা মনে রাখে, আজ কাল সকলেই আপনার আপনার কায নিয়ে ব্যস্ত। সে কালে এক রীতি

ছিল, গ্রামের বুড়াদের কথাটী না লইয়া পাড়ার কোন কাজ হইত না।
কেমন, বল না গোবৰ্দ্ধন বাবু, ঐ সেকালে আমাদের মতামত না নিয়ে কি
কেউ কোনও কায কত্তে পারত ?”

গোবৰ্দ্ধন বাবু। “সাধ্য কি ? আর এখনুই যাঁরা একটু শিষ্ট শান্ত তাঁরা
কোন্ আমাদের না জিজ্ঞাসা করিয়া কিছু করেন। ঐ ঘোষজা মশাইয়ের
বিধবা ভাদ্রবধুকে লইয়া সে বছর এইরূপ একটা কলঙ্ক হইল, (সে কলঙ্কটী
সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা হইল,) তা ঘোষজা মশাই তখনই আমার কাছে
আসিয়া বলিলেন “হরিহর বাবু করি কি ? যাই যে ? তা আমি বলিলাম,
যখন আমার কাছে এসেছ তখন কিছু ভয় নেই আমি এর একটা কিনারা করে
দিবই।” কি বল জনার্দ্দন বাবু, আমরা অনেক দেখেছি শুনেছি বিপদ আপ-
দের সময় আমাদের জানাইলে কোন্ না একটা উপায় করিয়া দিতে পারি ?”

জনার্দ্দন বাবু। “তা বৈ কি।”

হরিহর বাবু। ‘তা আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া ঘোষজাকে বলিলাম তোমার
ভাদ্রবৌকে ৺কাশীধামে পাঠাইয়া দাও তিনি সেই অনুসারে কার্য্য
করিলেন, এখন কাহার সাধ্য সে কথা উত্থাপন করে ? তা বাবা, এখনকার
কি ছেলেরা কি মেয়েরা সকলেই স্বেচ্ছাচারী হয়েছে, যাহার যা ইচ্ছা করে,
তাতে তোমার দোষ কি বল ? তা একটী কায কর, তোমার শ্যালীটীকেও
৺কাশীধামে পাঠাইয়া দাও, সেখানে যা ইচ্ছা করিবে, কে দেখ্তে যাইতেছে
বল ? তোমার কোন অপযশ হইবে না।”

হেম আর সহ্য করিতে পারিলেন না, কম্পিত স্বরে বলিলেন,

“মহাশয় আপনাদিগের কথা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। শরৎ যে
সমাজরীতি বিরুদ্ধ প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে আমার বড় মত নাই ; সে
বিষয় পরে বিচার্য্য। কিন্তু আপনারা যদি শরৎ বাবুর অথবা আমার শ্যালীর
চরিত্রে কোনও দোষ ঘটিয়াছে এরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন তবে
একেবারে ভ্রম করিয়াছেন। তাহাদিগের নির্ম্মল চরিত্রে দোষ স্পর্শে না,
তাঁহাদিগের অপেক্ষা নির্দ্দোষচরিত্র লোক আমি জানি না।”

জনার্দ্দন বাবু, গোবৰ্দ্ধন বাবু ও হরিহর বাবু একস্বরে “না, না, না,
আমরা দোষের কথা বলি নাই, এমন কথাও কি লোকে বলে !”

হরিহর বাবু। "এমন কথা ও কি লোকে বলে, ঘরে কিছু হলেও কি লোকে বলে ? তা নয় তা নয়। ঘোষজা মশাই কি সে কথা বলিয়াছিলেন তা নয়, অন্য একটু কারণ দেখাইয়া পাপ দূর করিলেন। তা আমরাও তাই বলিতেছি তোমার শ্যালীর চরিত্রে কোন দোষ থাকিলেও কি সে কথা মুখে আনিতে আছে ? রামঃ, আমরা কি কারও কলঙ্কের কথা মুখে আনিতে পারি, তা নয়, তা নয়। তবে গোলমালটা এইরূপে চুকিয়ে ফেলিলেই ভাল। সকল বিষয়েই সরল পথ অবলম্বন করাই ভাল, সরলপথেই ধর্ম্ম।"

জনার্দ্দন বাবু। "তা বৈকি, তা বৈকি, "যতোধর্ম্ম-স্ততোজয়" শাস্ত্রেই একথা আছে। হরিহর বাবু যে কথাটা বলিলেন তাহাই সৎপথ তার কি আর সন্দেহ আছে। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে বাবা, এবারটা যেন চেপে গেলে, কিন্তু তুমি ছেলে মানুষ, ঘরে অল্পবয়স্কা বিধবা কি রাখতে আছে ? কখন কি হয় তার কি ঠিক আছে ?"

গোবর্দ্ধন বাবু। "তা বৈ কি, শাস্ত্রে বলে সহস্রাক্ষ ইন্দ্রও নারীর গুপ্ত আচরণ দেখিতে পান না, পঞ্চমুখ ব্রহ্মাও নারীর গুপ্ত কথা জানিতে পারেন না। তুমি ত বাবা ছেলে মানুষ।"

হরিহর বাবু—"তা বৈ কি ? এবার যেন চাপিয়া গেলে, কিন্তু দৈবক্রমে,—দৈবের কথা বলা যায় না, যদি যথাকালে তরুণ-বয়স্কা বিধবা একটী সন্তান প্রসব করে, তাহা হইলে কি আর চাপিবার যো আছে, লোকেত একেই কলঙ্কপ্রিয়, তখন কি আর রক্ষা আছে,—এখনই লোকে সেই কথা বলিতেছে। তা ৺ কাশীধামে পাঠানই শ্রেয়।"

ইত্যাদি নানা সারগর্ভ পরামর্শ দিয়া বৃদ্ধগণ বিদায় হইলেন। হেমচন্দ্র রোষে ও অভিমানে উত্তর দিতে পারিলেন না,—তাঁহার জলন্ত নয়ন হইতে একবিন্দু অশ্রু বিমোচন করিলেন।

তাহার পর রামলাল, শ্যামলাল, যদুলাল প্রভৃতি নব্যের দল হেমচন্দ্রকে পরামর্শামৃত দান করিতে আসিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ শিক্ষিত, কেহ এণ্ট্রান্স ক্লাস পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া পরে বাড়ীতেই (রেনল্‌ডস্ প্রভৃতি) সাহিত্য আলোচনা করিয়া বিজ্ঞ হইয়াছেন; কেহ সচ্চরিত্র কেহ বা

"সভ্যতা"-সম্মত আমোদ গুলি পরক করিয়া দেখিয়াছেন ও দেখেন; কিন্তু পরামর্শ দানে সকলেই সমান সক্ষম, সকলেই হেমচন্দ্রের "হিতৈষী বন্ধু।

তাঁহারা অদ্য প্রাতে একটী কথা শুনিয়া হেমবাবুর নিকট আসিয়াছিলেন, হেমবাবুর অযথা নিন্দা প্রতিবাদ করাই তাঁহাদের একান্ত ইচ্ছা, পাড়ার একজন বিদ্যোৎসাহী যুবক ও একজন ধর্ম্মপরায়ণা বিধবার অযথা অপবাদ তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না, সেই জন্যই হেমবাবুর নিকট প্রকৃত অবস্থা জানিতে আসিলেন। কিন্তু হেমবাবুর যদি কোনও কথা বলিতে কোনও আপত্তি থাকে তাহা হইলে তাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন না, কেন না কাহারও গুপ্ত কথা অনুসন্ধান করা সুরুচি-সম্মত কার্য্য নহে। কিন্তু যদি হেমবাবুর বলিতে কোন আপত্তি না থাকে তাহা হইলে,—ইত্যাদি, ইত্যাদি, নব্য ভাষায় গৌর চন্দ্রিকা অনেকক্ষণ চলিল।

হেম বাবুর এখন আর লুকাইবার কিছুই নাই, যেরূপ অপবাদ রাষ্ট্র হইয়াছে—তাহাতে সত্য কথা প্রকাশ হওয়াই ভাল, এই অনাহূত বন্ধুদিগের আগমনে ও প্রশ্নে তিনি অতিশয় তিক্ত হইলেও ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া যাহা ঘটনা তাহা জানাইলেন।

রামলাল। "তা যাহা হউক অদ্য যে ঘোর অপবাদ শুনিলাম তাহার অধিকাংশ মিথ্যা জানিয়া আহ্লাদিত হইলাম। কিন্তু দেখুন সকলে সহজে এ অপবাদটী অবিশ্বাস করিবে না, আপনি সকল সময়ে বাটী থাকেন না, শরৎ কলেজেই কিছু অবাধ্য ও গর্ব্বী এবং স্বীয় মত গুলি লইয়া বড় স্পর্দ্ধা করে, এবং নারীর চরিত্র দুর্ব্বিজ্ঞেয়। অতএব, অপবাদ সম্বন্ধে সমাজের মনে যদি কিছু সন্দেহ থাকে, তাহা স্বাভাবিক, এবং মনুষ্য-চরিত্র পর্য্যালোচনার ফল মাত্র। তা যাহা হউক আপনি এই বিবাহে আপাততঃ মত করেন নাই এটী সুখের বিষয়।"

শ্যামলাল। "সে কথা যথার্থ। আরও দেখুন এ কার্য্য প্রকৃত সমাজ সংস্কার নহে। যে কার্য্যে আমাদের দিন দিন ঐক্য সাধন হইবে, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি হইবে, তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য। পুরাতন লোকদিগের ন্যায় আমাদের কোনও "প্রেজুডিস্" নাই, কিন্তু এ কার্য্যটী

আমাদিগের সমাজে, বিপ্লব ও বিচ্ছেদ ঘটাইবে মাত্র, ইহা দ্বারা আমাদের ঐক্য সাধন হইবে না, অতএব এ কার্য্য গর্হিত।"

যদুলাল। "আরও দেখুন মেলথস বলেন লোকসংখ্যা যত শীঘ্র বৃদ্ধি পায়, খাদ্য তত শীঘ্র বৃদ্ধি পায় না। এই জন্যই সুসভ্য দেশে অনেক পুরুষ ও নারী অবিবাহিত থাকে। আমাদের দেশে সেটী হয় না, অতএব নিদেন বিধবা গুলিকে অবিবাহিতা রাখা কর্ত্তব্য।"

শ্যামলাল। 'আর আপনার মত বুদ্ধিমান লোক এটীও অবশ্য বিবেচনা করিবেন যে স্বদেশের উন্নতি, ভারতের উন্নতি, আমাদিগের সকলেরই উদ্দেশ্য তাহাও বিধবাবিবাহ দ্বারা বিশেষরূপে সংঘটিত হইবে না। আমার সামান্য ক্ষমতা দ্বারা যতদূর দেশের উন্নতি হয় আমি তাহার চেষ্টা করিতেছি। একটী লাইব্রেরী স্থাপন করিয়াছি, দেশস্থ যাবদীয় গ্রন্থকারদিগকে পুস্তকের জন্য পত্র লিখিয়াছি, এবং প্রতি শনিবার সেই লাইব্রেরিতে কয়েকজন বন্ধু সমবেত হয়েন, রাজনৈতিক তর্কও করিয়া থাকেন। আপনার যদি সবকাশ থাকে তবে এই আগামী শনিবার আসিলে আমরা বড়ই তুষ্ট হইব।"

যদুলাল। "আরও দেখুন আমাদের সংসারে যে কবিত্ব যে মধুরত্ব টুকু আছে, আমাদিগের গৃহে গৃহে যে অমৃত টুকু লুক্কায়িত আছে, কি কাঙ্গাল কি ধনী সকল গৃহে যে অনির্ব্বচনীয় মিষ্টত্ব টুকু আছে,—ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে সে টুকু কোথায়? বৈদেশিক আচরণ অনুকরণ করিবেন না, তাহাতে আমাদিগের গৃহধর্ম্ম লুপ্ত হইবে, ভারতবাসীর শেষ সুখ টুকু বিলুপ্ত হইবে, আর্য্য-গৌরব ও আর্য্য-ধর্ম্মের নিস্তেজ দীপটী একেবারে নির্ব্বাণ হইবে। ইউরোপীয়দিগের সদ্‌গুণগুলি অনুকরণ করুন, আমাদিগের গৃহে সংসারের কবিত্ব, মিষ্টত্ব, ও পবিত্রতা ধ্বংস করিবেন না।"

রামলাল। "সে কথা সত্য। হেমবাবু যদুবাবুর কথা গুলি শুনিবেন, তাঁহার ন্যায় বিজ্ঞ স্বদেশহিতৈষী লোক আজ কাল দেখা যায় না। তাঁহার কথা গুলি সারগর্ভ তাহা আর আমার বলা বাহুল্য। আর যে অপবাদ শুনিলাম তাহা যদি সত্য হয়,—যাহা অনেকে বিশ্বাস করিবে, যদিও সে বিষয়ে আমার নিজের মত সমস্ত প্রমাণাদি না দেখিয়া স্থাক

করিতে চাহি না,—যদি সে অপবাদ সত্য হয়, তাহা হইলে এই রূপ যুবক ও এরূপ রমণীকে উৎসাহিত করিলে ভারতের উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক অধোগতি হইবে।"

হেমচন্দ্র এরূপ তর্কের উত্তর করিতেও ঘৃণা বোধ করিলেন; নব্য পরামর্শদাতাগণ ক্ষণেক পর উঠিয়া গেলেন।

তাহার পর সমাজ সংরক্ষণের দুই একজন চাঁই দিগ্‌গজ ঠাকুরকে লইয়া হেম বাবুর বাটী আসিলেন। দিগ্‌গজ ঠাকুর ভবানীপুরের মধ্যে হিন্দু ধর্ম্মের একটী আকটর্লনী মনুমেণ্ট, ধর্ম্ম শাস্ত্রের একটী পেসিফিক সমুদ্র, বিদ্যায় একটী শুণ্ডধারী দিগ্‌গজ, তর্কে বন্য বরাহ অবতার। বেদ বেদান্ত শ্রুতি স্মৃতি, ন্যায়, দর্শন, পুরাণ ইতিহাস, ব্যাকরণ অভিধান সকলই তাঁহার কণ্ঠস্থ, সকল বিষয়েই তাঁহার সমান অধিকার। তিনি আপন পরিমাণ রহিত বিদ্যা-পয়োধি হইতে অজস্র তর্কস্রোত বর্ষণ করিয়া হেম চন্দ্রকে একেবারে প্লাবিত করিলেন, হেমচন্দ্র একেবারে নিরুত্তর হইয়া বসিয়া রহিলেন। যখন দিগ্‌গজ ঠাকুরের গলা ভাঙ্গিয়া গেল, বাক্য ক্ষমতা শেষ হইল, (তর্ক ক্ষমতা শেষ হইবার নহে,) তখন তিনি কাশিতে কাশিতে আরক্ত নয়নে নিরস্ত হইলেন।

হেম তখন ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন "মহাশয় এ কার্য্য করিতে এখনও আমার মত নাই, সুতরাং আপনার এক্ষণে এরূপ পরিশ্রম স্বীকার করার বিশেষ আবশ্যক নাই এটী শাস্ত্রসিদ্ধ কি না বিবেচনা করিব। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও পড়া শুনায় যতদূর উপলব্ধি হয় তাহাতে বোধ হয় বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে আমাদিগের শাস্ত্রেও দুটী মত আছে, ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রথা ছিল। বৈদিক কালে বিধবাবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল; পরাশর মনু প্রভৃতি শাস্ত্রপ্রণেতাদিগের কালে এ প্রথাটী একেবারে নিষিদ্ধ হয় নাই, কিন্তু ক্রমে উঠিয়া যাইতেছিল। পরে পৌরাণিককালে এ প্রথাটী একেবারে নিষিদ্ধ হইয়া যায়। আমার শাস্ত্রে অধিকার নাই, আলোচনারও ক্ষমতা নাই, অন্য পণ্ডিতদিগের মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহাই বলিতেছি।" শুনিয়াছি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতাগ্রগণ্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বলেন, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রের অসম্মত নহে।"

যাঁহারা দ্বিপ্রহর রজনীতে সহসা একটা গ্রামে আগুণ লাগিতে দেখিয়াছেন, আকাশের রক্তবর্ণ দেখিয়াছেন, অগ্নির প্রজ্জলিত অভ্রলেহী জিহ্বা দেখিয়াছেন, তাঁহারই তৎকালে দিগ্‌গজ ঠাকুরের মুখের ভঙ্গি কতক পরিমাণে অনুভব করিতে পারেন। সিংহ গর্জ্জন-বিনিন্দিত স্বরে তিনি কহিলেন,

সেই (কাশি,) সেই বিধবাবিবাহ প্রচারক বিদ্যাসাগর পণ্ডিত? সে আবার পণ্ডিত? সে বর্ণপরিচয়ের পণ্ডিত, বর্ণপরিচয় শিখে পণ্ডিত হয়েছে, (অধিক কাশি) একটা নূতন প্রথা চালিয়ে দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, ধর্ম্মে কুঠারাঘাত করিয়াছে, মনুষ্য হৃদয়ের স্তরে স্তরে শেল নিক্ষেপ করিয়াছে, মনুষ্য চরিত্র অনপনেয় কলঙ্ক রাশিতে আবৃত করিয়াছে, আর্য্যনাম, আর্য্য-গৌরব আর্য্যরীতি নীতি একেবারে সমুদ্রবক্ষে মগ্ন করিয়াছে, (ভয়ানক কাশি) উঃ (কাশি,) সে পণ্ডিত? সেই স্বধর্ম্মবিদ্বেষী, ম্লেচ্ছদিগের অনুকরণ-কারী, বিদেশীয় রীতির পক্ষপাতী, হৃদয়শূন্য, আর্য্যঅভিমানশূন্য আর্য্য-বংশের কুসন্তান,—(অনবরতঃ কাশিতে বাক্যস্রোত সহসা রুদ্ধ হইল। তখন আসন পরিত্যাগ করিয়া,—) চল হে সংরক্ষক মহাশয়, এ বাড়ীতে আর থাকা নহে, এখানে পদবিক্ষেপ করিলেও পাপ আছে। যাহা শুনিয়াছিলাম সমস্তই সত্য বটে,—সে গর্ভবতী যদি গর্ভ নষ্ট করে, তোমরা পুলিসে সংবাদ দিও।"

হেমচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইলেন না,—দিগ্‌গজ ঠাকুরের ক্রোধ ও অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া তাঁহার একটু হাসি আসিল।

সে দিন সমস্ত দিন হেমচন্দ্রের পরামর্শের অভাব রহিল না। তাঁহার এত বন্ধু আছে, এত হিতৈষী আছে, এত পরামর্শদাতা আছে তাহা পীড়ার সময় কষ্টের সময় দারিদ্রের সময় হেমচন্দ্র অনুভব করেন নাই। কলিকাতা সহরে গেল, তথা হইতে বালিগঞ্জের বাগানে ভ্রমণ করিল। মর্ম্মর বিনির্ম্মিত দালানের উপর সুসভ্য সভা হইয়াছে, গীত, নৃত্য, সুধা ও দিবার ন্যায় ঝাড়ের আলোক সেই সভাকে রঞ্জিত করিতেছে! তথায় দরিদ্রের এই কথাটী উঠিল।

ধনঞ্জয় বাবু শ্যালীর কলঙ্ক সম্বন্ধে আর কোন উপহাস করিলেন না, একটু হাসিলেন;—কিন্তু অন্যান্য ধার্ম্মিকগণ এ ধর্ম্মবহির্ভূত কার্য্যের কথা

শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। হিন্দুধর্ম্মের স্থূল স্তম্ভ স্বরূপ হরিশঙ্কর বাবু একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন, তাঁহার হস্ত হইতে সুধা পাত্র পড়িয়া শত খণ্ড হইয়া গেল,—বলিলেন "হা ধর্ম্ম! তোমাকে কি সকলেই বিস্মৃত হইল? ভদ্রলোকের ঘরে এ কি অধর্ম্ম আচরণ? হিঁদুয়ানি আর বুঝি থাকে না।" শিক্ষিত যদুনাথের হস্ত হইতে কাঁটা ছুরি পড়িয়া গেল, সম্মুখের গোজিহ্বা অনাস্বাদিত রহিল, তিনি বলিয়া উঠিলেন "আর বুঝি ন্যাশনালিটী থাকে না?"—বিশ্বম্ভর বাবু, সিদ্ধেশ্বর বাবু, গিদ্ধেশ্বর বাবু প্রভৃতি বনিয়াদি ধনাঢ্যগণ নিজ নিজ আসনে কম্পিত হইলেন, এই ঘোর অধর্ম্ম কর্ম্মের নাম শুনিয়া তাঁহারা বাক্ শক্তি রহিত হইলেন, এবং তাঁহাদের কালের লোকের ধর্ম্মানুষ্ঠানের কথা শতমুখে প্রশংসা করিয়া এখনকার কলেজের ছেলেদের স্বেচ্ছাচারিতার ভূয়োভূয়ঃ নিন্দা করিতে লাগিলেন।

পাশ্চাত্য সভ্যতার অবতার মিষ্টর কর্ম্মকার ও তাঁহার সারগর্ভ মত প্রকাশ করিলেন, যে এরূপ বিধবা বিবাহ পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুমোদিত নহে, এ পাশ্চাত্য সভ্যতার বিড়ম্বনা মাত্র। বিধবা বাহির হইয়া আইসুক, জগৎ পরিদর্শন করুক সুসভ্য সুরুচি সম্পন্ন যুবক দিগের সহিত আলাপ করুক, (দর্পণে নিজ প্রতিমূর্ত্তি দর্শন,) তৎপর দীর্ঘ কোর্টসিপের পর একজনকে নির্ব্বাচন করুক,—এইরূপ কার্য্যই পাশ্চাত্য সুসভ্য প্রথা; পিঞ্জর বদ্ধ বিধবাকে বিবাহ দেওয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার অবমাননা মাত্র!

এই সারগর্ভ হৃদয় গ্রাহী বক্তৃতা শুনিয়া শ্রোত্রীবর্গ বলিয়া উঠিলেন, তাঁহারা ত জগৎ পরিদর্শন করিয়াছেন এবং সুরুচি সম্পন্ন যুবকদিগের সহিত ও আলাপ করিয়াছেন, অতএব তাঁহাদের একটী করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতা (অর্থাৎ সুন্দর বর) মিলে না কেন,—তাঁহাদের একটী করিয়া বিবাহ ঘটে না কেন? সুবুদ্ধি সুমতি বাবু একটু হাসিয়া এ প্রশ্নের উত্তর করিলেন যে বিধবা বিবাহ প্রথাটা প্রকৃতই মন্দ প্রথা, ঐ প্রথা চলিলে সমাজের বিশেষ অনিষ্ট। রসজ্ঞ পণ্ডিতগণ এ তর্ক বুঝিলেন। সভ্য ও সভ্যাদিগের মধ্যে এ রসের কথাটা সুধার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর গড়াইল, কিন্তু পাঠকগণ আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন, আমারা সে সমস্ত কথা লিপি বদ্ধ করিতে অক্ষম।

বিশ্ব জগতের পরামর্শ, অভাবন্ত, বিদ্রুপ ও দোষারোপ হেমচন্দ্রের কাণে উঠিল। সন্ধ্যার সময় হেমবাবু বিন্দুর নিকট গিয়া বলিলেন,—"সমাজ একমত হইয়া এই বিধববিবাহ, নিবারণ করিতেছে, এ কার্য্য করিতে আমার ইচ্ছা নাই। যাঁহাদের বিদ্যা আছে, যাহাদের বিদ্যা নাই, যাঁহারা সৎলোক, যাঁহারা সৎলোক নহেন, যাহাদের শ্রদ্ধা করি এবং যাহাদের শ্রদ্ধা করি না সকলে একমত হইয়া এ কার্য্য নিষেধ করিতেছেন।"

বিন্দু। "আর তা ছাড়া এ কাযে কলঙ্ক কত, নিন্দা কত; এ কায করিলে সমাজে কি আমাদের অতিশয় নিন্দা হইবে।"

হেম। "না, তাহার বড় ভয় নাই। সমাজ অনুগ্রহ করিয়া আমাদের সম্বন্ধে যে কলঙ্ক বিশ্বাস করিতেছেন ও রটাইতেছেন তাহা অপেক্ষা অধিক কলঙ্ক হইবার সম্ভাবনা নাই। বিধবা বিবাহতে প্রকৃত অধর্ম্ম নাই,—আমাদিগের হিতৈষীগণ বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া শরতের চরিত্র ও সরলা বালিকার চরিত্র সম্বন্ধে যার পর নাই অধর্ম্ম সূচক প্রবাদ প্রকটিত করিতেছেন এক্ষণে সেই অধর্ম্মাচরণ গোপন করিয়া রাখিলেই সমাজের মতে ধর্ম্ম রক্ষা হয়।"

কৃষ্ণচরিত্র।

উভয় পক্ষে যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে থাকুক। এদিকে দ্রুপদের পরামার্শমনুসারে যুধিষ্ঠিরাদি দ্রুপদের পুরোহিতকে ধৃতরাষ্ট্রের সভায় সন্ধিস্থাপনের মানসে প্রেরণ করিলেন, কিন্তু পুরোহিত মহাশয় কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। কেন না বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্রবেধ্য ভূমি ও প্রত্যর্পন করা দুর্যোধনাদির অভিপ্রায় নহে। এদিকে যুদ্ধে ভীমার্জ্জুন ও কৃষ্ণকে * ধৃতরাষ্ট্রের বড়

* বিপক্ষেরা ও যে এক্ষণে কৃষ্ণের সর্ব্বপ্রাধান্য স্বীকার করিতেন, তাঁহার অনেক প্রমান এই উদ্যোগপর্ব্বে পাওয়া যায়। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগের অন্যান্য সহাযের নামোল্লেখ করিয়া পরিশেষে বলিয়াছিলেন, বৃষ্ণি সিংহ কৃষ্ণ যাঁহাদিগের সহায়, তাঁহাদিগের প্রতাপ সহ্য করা কাহার সাধ্য?" (২১ অধ্যায়) পুনশ্চ বলিতেছেন, "সেই কৃষ্ণ এক্ষণে পাণ্ডব

ভয়; অতএব যাহাতে পাণ্ডবেরা যুদ্ধ না করে, এমন পরামর্শ দিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্র আপনার অমাত্য সঞ্জয়কে পাণ্ডবদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। "তোমাদের রাজ্য ও আমরা অধর্ম্ম করিয়া কাড়িয়া লইব, কিন্তু তোমারা যুদ্ধ ও করিওনা, সে কাজটা ভাল নহে;" এরূপ অসঙ্গত কথা বিশেষ নির্লজ্জ ব্যক্তি নহিলে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না। কিন্তু দূতের লজ্জা নাই। অতএব সঞ্জয় পাণ্ডব সভায় আসিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার মূল মর্ম্ম এই যে যুদ্ধ বড় গুরুতর অধর্ম্ম, তোমরা সেই অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছ। যুধিষ্ঠির, তদুত্তরে অনেক কথা বলিলেন, তন্মধ্যে আমাদের যে টুকু প্রয়োজনীয় তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

"হে সঞ্জয়! এই পৃথিবীতে দেবগনের ও প্রার্থনীয় যে সমস্ত ধন সম্পত্তি আছে তৎসমুদায় এবং প্রাজাপত্য স্বর্গ এবং ব্রহ্মলোক এই সকল ও অধর্ম্মতঃ লাভ করিতে আমার বাসনা নাই। যাহা হউক মহাত্মা কৃষ্ণ ধর্ম্মপ্রদাতা, নীতিসম্পন্ন ও ব্রাহ্মণগণের উপাসক। উনি কৌরব ও পাণ্ডব উভয় কুলেরই হিতৈষী এবং বহু সংখ্যক মহাবলপরাক্রান্ত ভূপতিগণকে শাসন করিয়া থাকেন। এক্ষণে উনিই বলুন যে যদি আমি সন্ধিপথ পরিত্যাগ করি তাহা হইলে নিন্দনীয় হই, আর যদি যুদ্ধে নিবৃত্ত হই তাহা হইলে আমার স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করা হয়, এ স্থলে কি কর্ত্তব্য। মহাপ্রভাব শিনির নপ্তা এবং চেদি অন্ধক বৃষ্ণি ভোজ কুকুর ও সৃঞ্জয় বংশীয়গণ বাসুদেবের বুদ্ধি প্রভাবেই শত্রু দমন পূর্ব্বক সুহৃদগণকে আনন্দিত করিতেছেন। ইন্দ্রকল্প উগ্রসেন প্রভৃতি বীর সকল এবং মহাবলপরাক্রান্ত মনস্বী সত্যপরায়ণ

দিগকে রক্ষা করিতেছেন। কোন্ শত্রু বিজয়াভিলাষী হইয়া দ্বৈরথ যুদ্ধে তাহার সম্মুখীন হইবে? হে সঞ্জয়! কৃষ্ণ পাণ্ডবার্থ যেরূপ পরাক্রম প্রকাশ করেন, তাহা আমি শ্রবণ করিয়াছি। তাঁহার কার্য্য অনুক্ষণ স্মরণ করত আমি শান্তিলাভে বঞ্চিত হইয়াছি; কৃষ্ণ যাঁহাদিগের অগ্রণী, কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদিগের প্রতাপ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে? কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছেন শুনিয়া ভয়ে আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে।" আর এক স্থানে ধৃতরাষ্ট্র বলিতেছেন, "কিন্তু কেশব ও অধৃষ্য, লোকত্রয়ের অধিপতি, এবং মহাত্মা। যিনি সর্ব্বলোকে একমাত্র বরেণ্য কোন মনুষ্য তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিবে?" এইরূপ অনেক কথা আছে।

যাদবগণ কৃষ্ণ কর্ত্তৃক সততই উপদিষ্ট হইয়া থাকেন। কৃষ্ণ ত্রাতা ও কর্ত্তা বলিয়াই কাশীশ্বর বভ্রু উত্তম স্ত্রী প্রাপ্ত হইয়াছেন; গ্রীষ্মাবসানে জলদজাল যেমন প্রজাদিগকে বারি দান করে তদ্রূপ বাসুদেব কাশীশ্বরকে সমুদায় অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করিয়া থাকেন। কর্ম্ম নিশ্চয়জ্ঞ কেশব ঈদৃশ গুণসম্পন্ন, ইনি আমাদের নিতান্ত প্রিয় ও সাধুতম, আমি কদাচ ইঁহার কথার অন্যথাচরণ করিব না।"

বাসুদেব কহিলেন "হে সঞ্জয়! আমি নিরন্তর পাণ্ডবগণের অবিনাশ সমৃদ্ধি ও হিত এবং সপুত্র রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অভ্যুদয় বাসনা করিয়া থাকি। কৌরব ও পাণ্ডবগণের পরস্পর সন্ধি সংস্থাপন হয় ইহা আমার অভিপ্রেত, আমি উঁহাদিগকে ইহা ব্যতীত আর কোন পরামর্শ প্রদান করি না। অন্যান্য পাণ্ডবগণের সমক্ষে রাজা যুধিষ্ঠিরের মুখে ও অনেক বার সন্ধি সংস্থাপনের কথা শুনিয়াছি; কিন্তু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণ সাতিশয় অর্থলোভী, পাণ্ডবগণের সহিত তাঁহার সন্ধি সংস্থাপন হওয়া নিতান্ত দুষ্কর. সুতরাং বিবাদ যে ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি? হে সঞ্জয়! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও আমি কদাচ ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হই নাই, ইহা জানিয়া শুনিয়া ও তুমি কি নিমিত্ত স্বকর্ম্ম সাধনোদ্যত উৎসাহ সম্পন্ন স্বজন পরিপালক রাজা যুধিষ্ঠিরকে অধার্ম্মিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে?"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই কথাটা কৃষ্ণচরিত্রে বড় প্রয়োজনীয়। আমরা বলিয়াছি, তাঁহার জীবনের কাজ দুইটি; ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন এবং ধর্ম্মপ্রচার। মহাভারতে তাঁহার কৃত ধর্ম্ম রাজ্য সংস্থাপন সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের কথা প্রধানতঃ ভীষ্ম পর্ব্বের অন্তর্গত গীতা পর্ব্বাধ্যায়েই আছে। এখন এমন বিচার উঠিতে পারে, যে গীতায় যে ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে তাহা গীতাকার কৃষ্ণের মুখে বসাইয়াছেন বটে, কিন্তু সে ধর্ম্ম যে কৃষ্ণপ্রচারিত কি গীতাকার প্রণীত, তাহার স্থিরতা কি? সৌভাগ্য ক্রমে আমরা গীতাপর্ব্বাধ্যায় ভিন্ন মহাভারতের অন্যান্য অংশে ও কৃষ্ণদত্ত ধর্ম্মোপদেশ দেখিতে পাই। যদি আমরা দেখি যে গীতায় যে অভিনব ধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে, আর মহাভারতের অন্যান্য অংশে কৃষ্ণ যে ধর্ম্ম ব্যাখ্যাত করিতেছেন, ইহার

মধ্যে একতা আছে, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে এই ধর্ম্ম কৃষ্ণপ্রণীত এবং কৃষ্ণপ্রচারিতই বটে। মহাভারতের ঐতিহাসিকতা যদি স্বীকার করি, আর যদি দেখি যে মহাভারতকার যে ধর্ম্মব্যাখ্যা স্থানে স্থানে কৃষ্ণে আরোপ করিয়াছেন তাহা সর্ব্বত্র এক প্রকৃতির ধর্ম্ম, যদি পুনশ্চ দেখি যে সেই ধর্ম্ম প্রচলিত ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন প্রকৃতির ধর্ম্ম; তবে বলিব এই ধর্ম্ম কৃষ্ণেরই প্রচারিত। আবার যদি দেখি যে গীতার যে ধর্ম্ম সবিস্তারে এবং পূর্ণতার সহিত ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার সহিত ঐ কৃষ্ণ প্রচারিত ধর্ম্মের সঙ্গে ঐক্য আছে, তাহারই আংশিক ব্যাখ্যা মাত্র, তবে বলিব যে গীতোক্ত ধর্ম্ম যথার্থই কৃষ্ণ প্রণীত বটে।

এখন দেখা যাউক কৃষ্ণ এখানে সঞ্জয়কে কি বলিতেছেন।

"শুচি ও কুটুম্ব পরিপালক হইয়া বেদাধ্যয়ন করত জীবন যাপন করিবে, এই রূপ শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট বিধি বিদ্যমান থাকিলেও ব্রাহ্মণগণের নানা প্রকার বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। কেহ কর্ম্মবশতঃ কেহ বা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বেদজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভ হয় এইরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু যেমন ভোজন না করিলে তৃপ্তিলাভ হয় না, তদ্রূপ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া কেবল বেদজ্ঞ হইলে ব্রাহ্মণগণের কদাচ মোক্ষ লাভ হয় না। যে সমস্ত বিদ্যা দ্বারা কর্ম্ম সংসাধন হইয়া থাকে, তাহাই ফলবতী; যাহাতে কোন কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধি নাই, সে বিদ্যা নিতান্ত নিষ্ফল। অতএব যেমন পিপাসার্ত্ত ব্যক্তির জল পান করিবা মাত্র পিপাসা শান্তি হয়, তদ্রূপ ইহকালে যে সকল কর্ম্মের ফল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। হে সঞ্জয়! কর্ম্ম বশতঃই এইরূপ বিধি বিহিত হইয়াছে; সুতরাং কর্ম্মই সর্ব্ব প্রধান। যে ব্যক্তি কর্ম্ম অপেক্ষা অন্য কোন বিষয়কে উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া থাকে, তাহার সমস্ত কর্ম্মই নিষ্ফল হয়।

"দেখ, দেবগণ কর্ম্মবলে প্রভাবসম্পন্ন হইয়াছেন; সমীরণ কর্ম্ম বলে সতত সঞ্চারন করিতেছেন; দিবাকর কর্ম্ম বলে আলস্যশূন্য হইয়া অহোরাত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন; চন্দ্রমা কর্ম্ম বলে প্রজাগণের নক্ষত্রমণ্ডলী পরিবৃত্ত হইয়া মাসার্দ্ধ উদিত হইতেছেন; হুতাশন কর্ম্মবলে প্রজাগণের কর্ম্ম সংসাধন করিয়া নিরবচ্ছিন্ন উত্তাপ প্রদান করিতেছেন; পৃথিবী

কর্ম্ম বলে নিতান্ত দুর্ব্বহ ভার অনায়াসেই বহন করিতেছেন। স্রোতস্বতী সকল কর্ম্ম বলে প্রাণীগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া সলীলরাশি ধারণ করিতেছে। অমিতবলশালী দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি সেই কর্ম্ম বলে দশ দিক ও নভোমণ্ডল বারিবর্ষণ করিয়া থাকেন এবং অপ্রমত্তচিত্তে ভোগাভিলাষ বিসর্জ্জন ও প্রিয়বস্তু সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠত্বলাভ এবং দম, ক্ষমা, ক্ষমতা সত্য ও ধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক দেবরাজ্য অধিকার করিয়াছেন। ভগবান বৃহস্পতি সমাহিত হইয়া ইন্দ্রিয়নিরোধ পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত তিনি দেবগণের আচার্য্য পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। রুদ্র আদিত্য যম কুবের গন্ধর্ব্ব যক্ষ অপ্সর, বিশ্বাবসু ও নক্ষত্রগণ কর্ম্ম প্রভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন; মহর্ষিগণ ব্রাহ্মবিদ্যা ব্রহ্মচর্য্য ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন।"

কর্ম্মবাদ কৃষ্ণের পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল, কিন্তু সে প্রচলিত মতানুসারে বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ডই কর্ম্ম। মনুষ্যজীবনের সমস্ত অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম, যাহাকে পাশ্চাত্যেরা Duty বলেন—সে অর্থে সে প্রচলিত ধর্ম্মে কর্ম্ম শব্দে ব্যবহৃত হইত না। গীতাতেই আমরা দেখি কর্ম্ম শব্দের পূর্ব্ব প্রচলিত অর্থ পরিবর্ত্তিত হইয়া, যাহা কর্ত্তব্য, যাহা অনুষ্ঠেয়, যাহা Duty সাধারণতঃ তাহাই কর্ম্ম নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।* আর এই খানে হইতেছে। আর ভাষাগত বিশেষ প্রভেদ আছে—কিন্তু মর্ম্মার্থ এক। এখানে যিনি বক্তা, গীতাতে তিনিই প্রকৃত বক্তা এ কথা স্বীকার করা যাইতে পারে।

অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের যথাবিহিত নির্ব্বাহের (অর্থাৎ ডিউটির সম্পাদনের) নামান্তর স্বধর্ম্ম পালন। গীতার প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ স্বধর্ম্ম পালনে অর্জ্জুনকে উপদিষ্ট করিতেছেন। এখানে ও কৃষ্ণ সেই স্বধর্ম্ম পালনের উপদেশ দিয়েছেন। যথা

---

* আমি স্বীকার করিতেছি "ভূতভাবোদ্ভবকরোবিসর্গঃ কর্ম্ম সংজ্ঞিতঃ" ইত্যাদি দুই একটা গোলযোগের কথা গীতাতেও আছে। তাহার মীমাংসা প্রস্তাবান্তরে করিবার ইচ্ছা আছে।

"হে সঞ্জয়! তুমি কি নিমিত্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রভৃতি সকল লোকের ধর্ম্ম সবিশেষ জ্ঞাত হইয়াও কৌরবগণের হিতসাধন মানসে পাণ্ডবদিগের নিগ্রহ চেষ্টা করিতেছ? ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বেদজ্ঞ অশ্বমেধ ও রাজসূয়যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর্ত্তা। যুদ্ধ বিদ্যার পারদর্শী এবং হস্তাশ্বরথ চালনে সুনিপুণ। এক্ষণে যদি পাণ্ডবেরা কৌরবগণের প্রাণ হিংসা না করিয়া ভীমসেনকে শান্তনা করত রাজ্যলাভের অন্য কোন উপায় অবধারণ করিতে পারেন; তাহা হইলে ধর্ম্ম রক্ষা ও পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়। অথবা ইঁহারা যদি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক স্বকর্ম্ম সংসাধন করিয়া দুরদৃষ্টবশতঃ মৃত্যুমুখে নিপতিত হন তাহা ও প্রশস্ত। বোধ হয়, তুমি সন্ধি সংস্থাপনই শ্রেয়ঃসাধন বিবেচনা করিতেছ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধে ধর্ম্ম রক্ষা হয় কি যুদ্ধ না করিলে ধর্ম্ম রক্ষা হয়? ইহার মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিবে আমি তাহাতেই অনুষ্ঠান করিব।"

শূন্য।

কি আছে তোমাতে শূন্য হে! না জানি,
হেরিলে, নয়ন ফেরে না আর।
সাধের জীবন সুখের সংসার
মনে নাহি থাকে কিছুই তার॥
ভুলি আপনারে ভুলি প্রিয় জনে
ভুলি স্বদেশীরে, ভুলি প্রাণকুল।
ভুলি এ ভারত ভুলি সিন্ধু, গিরি
ভুলে যাই এই ধরা বিপুল॥
খুলে যেন যায় বুকের কপাট
ধু ধু করে যেন হৃদয় খান।
মনে হয় যেন কেহ নাই বুকে
পড়ে আছে একা উদাস প্রাণ॥
কে যেন আছিল বড়ই আপন
বহুদিন যেন ভুলে গেছি তায়।

কে সে মনে নাই কিন্তু আছে মনে
নিরুপম তার প্রেমের সুধায়॥
কি জানি কি আছে তোমাতে তাহার
হেরিলে তোমারে সে যেন ডাকে।
হেন ভোলা কথা কেন তোল মনে
শূন্য হে যদি না দেখাবে তাকে॥

২–

হেরি মনে হয় হৃদয়ে তোমার
আছে কোথা স্থান বড় মধুময়!
সেইখানে গেলে নিরাশার জ্বালা
যেন প্রাণে আর কিছু না রয়!!
সেই যেন দেশ প্রাণের আমার
এ যেন প্রবাসে পড়িয়ে রই।
যেন কি বন্ধনে রেখেছে বাঁধিয়া
আমি ইহাদের কেহই নই॥
আমার যা কিছু ফেলিয়ে এসেছি
কিছু কিছু তার যেন মনে পড়ে।
বুক ভরা প্রেম যেন শূন্য মনে
বসে আছে সেথা আমারি তরে॥
হেথাকার এই মায়া দয়া প্রেম
এ যেন সাজান করিয়ে ধাব।
সাঙ্গ হ'লে খেলা সাদের এ বেশ
খুলে ল'য়ে যাবে যেটি যাহার॥
ফিরে যাব ঘরে শূন্য একবার
খুলে দাও তব হৃদয়-দ্বার।
এমন করিয়ে বালকের খেলা
খেলিতে পারি না নিয়ত আর॥

সংসার।

৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যার যে তার মনে আছে।

সুধার বিবাহের কথা লইয়া পাড়াপড়শীর ঘুম নাই, চল একবার সেই সুধাকে দেখিয়া আসি। ক্ষুদ্র গৃহের অভ্যন্তরে সেই সরল বালিকা কি করিতেছিল, চল, একবার তাহা দেখিয়া আসি।

সুধার নিকট এ কথা গোপন রাখিবার সমস্ত যত্ন বৃথা হইল। যে কথা লইয়া পাড়ায় এত আন্দোলন, মেয়ে মহলে এত আন্দোলন, সে কথা গোপন থাকে না। যে বাড়ীতে ঝি আছে সে বাড়ীতে সংবাদ পত্রেরও অনাবশ্যক!

তবে ঝি বিন্দুর বার বার নিষেধ বাক্যের এই টুকু মান রাখিল যে সুধাকে সব কথা ভাঙ্গিয়া বলিল না; সুধার চরিত্র সম্বন্ধে যে কলঙ্ক উঠিয়াছিল, সে টুকু বলিল না। তবে শরৎবাবু যে সুধাকে বিবাহ করিবার জন্য পাগল হইয়াছেন, মাতাঠাকুরাণীর নিকট সেই বিবাহের জন্য জেদ করিতেছেন, পাড়ায় পাড়ায় এই কথা রাষ্ট্র হইয়াছে, তাহা সুধাকে গোপনে অবগত করাইল।

বালিকা একেবারে শিহরিয়া উঠিল, লজ্জায় অভিভূত হইল, যাতনায় অস্থির হইল। উঃ এ কি সর্ব্বনাশের কথা, কি অধর্ম্মের কথা, এ কথা কেন উঠিল, সুধা লোকের কাছে কেমন করিয়া আর এ মুখ দেখাইবে? কালীদিদির কাছে, শরতের মাতার কাছে, দেবী বাবুর বাড়ীতে, চন্দ্রবাবুর বাড়ীতে কেমন করিয়া মুখ দেখাইবে, হতভাগিনী আবার তালপুখুরে কোন্ মুখে ফিরিয়া যাইবে? ছি! ছি! শরৎবাবু এমন কাজ কেন করিলেন, বিধবার নাম কেন লজ্জায় ডুবাইলেন, এ কলঙ্ক কি আর কখনও যাবে? ঐ পথে মেয়ে মানুষেরা কি বলিতে বলিতে যাইতেছে, তাহারা বুঝি

সুধার কলঙ্কের কথা কহিতেছে, ঐ হেমবাবু দিদির সঙ্গে কি কথা কহিতেছেন! লজ্জায়, বিষাদে, মনের যতনায় বালিকা অধীর হইল, মুখ ফুটিয়া সে কথা কাহাকেও কহিতে পারে না, বালিশে মুখ লুকাইয়া সমস্ত দুই প্রহর বেলা একাকিনী কাঁদিল, সন্ধ্যার সময় না খাইয়া শুইতে গেল। উঃ শরৎবাবু কেন এমন কাজ করিলেন, দরিদ্র বিধবার কেন কলঙ্ক রটাইলেন?

কিন্তু অন্ধকারে স্থাপিত লতা যেরূপ সহস্র বাধা অতিক্রম করিয়া একটী সূর্য্য-রশ্মির দিকে ধায়, অভাগিনী সুধার শুষ্ক অন্তঃকরণ সেইরূপ এই যাতনায় ও লজ্জায় জীবনের একটী আশা-রশ্মির দিকে ধাবিত হইল। বিষাদে অন্ধকারের মধ্যে সুধা যেন একটী কিরণচ্ছটা দেখিতে পাইল, অকূল সমুদ্রের মধ্যে যেন ধ্রুব নক্ষত্রের হীন জ্যোতি তাহার নয়নে পতিত হইল।

শরৎ বাবু কেন এমন কাজ করিলেন? বোধ হয় শরৎ বাবু না আসিলে সুধা যেমন পথ চাহিয়া থাকে, সন্ধ্যার সময় একাকিনী বসিয়া শরৎ বাবুর কথা ভাবে, শরৎ বাবুও সেইরূপ সুধার কথা একবার মনে করেন। বোধ হয় দিন রাত্রি শরৎ বাবু এই লজ্জার কথা ভাবেন, বোধ হয় সেই জন্যই অস্থির হইয়া শরৎ বাবু এই লজ্জার কথা প্রস্তাব করিয়াছেন। বোধ হয় শরৎ বাবু অনেক যতনা পাইয়াছেন, না হইলে কি দিদির কাছে মুখ ফুটিয়া এমন কথাও বলিতে পারেন? ঝি বলে, শরৎ বাবু বড় কাহিল হইয়া গিয়াছেন, অভাগিনী সুধার জন্য শরৎ বাবু এত কষ্ট পাইয়াছেন? সুধার ইচ্ছা করে একবার শরৎ বাবুর পা দুখানি হৃদয়ে ধারণ করে। তা কি হবে? বিধাতা কি দরিদ্র সুধার কপালে এত সুখ লিখিয়াছেন? শরৎ বাবু যাহা প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা কি হইতে পারে? উঃ লজ্জার কথা, পাপের কথা,—সুধা এ কথা মনে স্থান দিও না।

ধীরে ধীরে চক্ষু হইতে এক বিন্দু অশ্রু বাহির হইয়া পড়িল। ছোট ছোট দুটী কোমল হস্ত দিয়া সেই চক্ষু মুছিয়া ফেলিয়া সুধা আবার ভাবিতে লাগিল। আচ্ছা, শরৎ বাবু যা বলিয়াছেন সত্য সত্যই যদি তাহা হয়? দরিদ্র সুধা যদি সত্য সত্যই শরৎ বাবুর গৃহিণী হয়? তাহা হইলে

প্রাতঃকালে উঠিয়া সেই তালপুখুরে শরৎ বাবুর বাড়ীটী পরিষ্কার করিবে, উঠানে ঝাট দিবে, বাসন মাজিবে, কায়মনে শরৎ বাবুর মাতাকে সেবা করিবে, আর স্বহস্তে শরৎ বাবুর ভাত রাঁধিয়া খাইবার সময় তাঁহার কাছে বসিবে। অপরাহ্নে আক ছাড়াইয়া দিবে, বেলের পানা প্রস্তুত করিয়া দিবে, আর স্বহস্তে মিশ্রির পানার বাটি শরৎ বাবুর মুখের কাছে ধরিবে। সহসা একটী পদশব্দ হইল, সুধা শিহরিয়া উঠিল, লজ্জায় মুখ লুকাইল, পাছে তাহার হৃদয়ের চিন্তা কেহ টের পায়, পাপিয়সীর পাপ চিন্তা পাছে কেহ জানিতে পাবে!

আর যদি শরৎ বাবুর বিদেশে কোথাও চাকুরি হয়? সুধা দাসীর ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইবে, হৃদয়ের সহিত তাঁহার যত্ন করিবে। একটী ক্ষুদ্র কুটীরে তাহারা বাস করিবে, সুধা সেই কুটীরে দুটী লাউ গাছ দিবে, দুটী কুমড়া গাছ দিবে, দুই চারিটী ফুলের গাছ স্বহস্তে রোপন করিবে। কলিকাতায় ঠাকুরদের সুন্দর সুন্দর ছবি চার পয়সা করিয়া পাওয়া যায় সুধা তাই কিনিয়া শুইবার ঘরটী সাজাইবে। উমা সিংহে চড়িয়া বাপের বাড়ী আসিয়াছে, উমার মাতা দুই হাত প্রসারণ করিয়া আলু থালু বেশে মেয়েকে একবার কোলে করিতে আসিয়াছে, দাসীগণ কেহ পাখা হাতে কেহ খাদ্য হাতে, কেহ ফুলের মালা হাতে করিয়া দৌড়াইয়া আসিয়াছে। অথবা অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে পতিপ্রাণা দময়ন্তী নিদ্রিত রহিয়াছে, নলরাজা উঠিয়া বসিয়া গালে হাত দিয়া চিন্তা করিতেছে। অথবা কুঞ্জবনে রাধিকা গালে হাত দিয়া ভাবিতেছে, বিদেশিনী তাহার নিকট বসিয়া কৃষ্ণের কথা বলিতেছে, শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া রাধিকার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। এইরূপ ঠাকুরের ছবি গুলি দিয়া সুধা ঘরটী সাজাইবে, ভাল করিয়া ঝাট দিয়া ঘরটী পরিষ্কার করিবে, আপন হস্তে শয্যা প্রস্তুত করিবে, সন্ধ্যার সময় প্রদীপ জ্বালাইয়া শরৎ আসিতেছেন বলিয়া প্রতীক্ষা করিবে। শরৎ বাবু বাড়ী আসিলে সুধা জল আনিয়া আপন হস্তে শরতের পা ধুইয়া দিবে; সেই পা দুখানি ধারণ করিয়া সাশ্রু-নয়নে একবার বলিবে "তোমার দয়া, তোমার যত্ন কেমন করিয়া পরিশোধ করিব? আমার জীবন সর্ব্বস্ব তোমারই, দরিদ্র বলিয়া একটু স্নেহ করিও।"

চিন্তা একবার আরম্ভ হইলে আর শেষ হয় না। প্রাতঃকালে সুধা গৃহকার্য্য করিতে করিতে এই চিন্তা করিত, দ্বিপ্রহরের সময় সমস্ত দিন জানালার কাছে বসিয়া বসিয়া ভাবিত; সন্ধ্যার সময় বিন্দু ও হেমবাবু একত্র বসিয়া যখন কথাবার্ত্তা করিতেন, সুধা ও তাঁহাদের কাছে বসিত, কিন্তু তাহার মন কোথায় বিচরণ করিত! তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিন্দু দেখিলেন সুধা সমস্ত জানিতে পারিয়াছে, সুধা দিবা রাত্রি চিন্তাশীল,—সুধা আর প্রফুল্ল বালিকা নহে, যৌবন প্রারম্ভে যৌবনের স্বপ্ন তাহার হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়াছে। সুধা সমস্ত দিন অন্যমনস্কা;—কখন, কদাচ, শরতের নামটী হইলেই সুধার মুখ খানি লজ্জায় রঞ্জিত হইত, বালিকা অন্য কার্য্যচ্ছলে উঠিয়া যাইত।

এক দিন অপরাহ্নে বিন্দু ঘরে আসিয়া দেখিলেন সুধা জানালার কাছে বসিয়া এক খানি বৈ পড়িতেছে, দিদি আসিতেই সুধা সে বই খানি মুড়িল।

বিন্দু। "ও কি বৈ পড়ছিলে বন?"

একটু লজ্জিত হইয়া সুধা বলিল "ও বঙ্কিম বাবুর একখানা বই।"

বিন্দু। "কি বই?"

সুধা। "বিষবৃক্ষ।"

বিন্দুর মুখ গম্ভীর হইল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন,

"ও বই আমাকে দাও, উহা পড়িও না।"

সুধা দিদির হাতে বৈ খানি দিয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল,

"কেন পড়বো না দিদি, ও কি খারাব বই?"

বিন্দু। "না বন, বই খানি ভাল, কিন্তু ছেলে মানুষে কি ও বই পড়ে?"

সুধা। "তবে দিদি তুমি আমাকে গল্পটী বলিও।"

বিন্দু। "গল্প আর কি, নগেন্দ্রের সঙ্গে কুন্দর বিবাহ হইল, কিন্তু তাহাতে সুখ হইল না, কুন্দ শেষে বিষ খাইয়া মরিল।"

শুষ্ক হৃদয়ে সুধা স্থানান্তরে গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দেওয়ালী।

ভারতবর্ষের দেওয়ালী একটি বড় সুন্দর প্রথা। এই কালী পূজার অন্ধকার নিশীথে ভারতবর্ষের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত, যে খানে হিন্দু বাস করে সেই খানেই গ্রাম ও নগর ও সংসারীর গৃহ দীপাবলিতে উদ্দীপিত হয়। সে দিন অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রি আলোকে পরিপূর্ণ হয়, আকাশের নির্ম্মল নক্ষত্র সমূহ নিস্তব্ধে জগতের নক্ষত্র দেখিয়া হাস্য করে। ধনীর গৃহ উজ্জ্বল আলোক-শ্রেণিতে পরিপূর্ণ হয়, দরিদ্র গৃহিণী একটী পয়সার তেল কিনিয়া কোন প্রকারে পাঁচটী প্রদীপ সাজাইয়া সন্ধ্যার সময়ে কুটীর দ্বারে জ্বালাইয়া দেয়।

কলিকাতায় আজ বড় ধূম। গৃহে গৃহে তুবড়ী উজ্জ্বল অগ্নিকণা উদ্গীরণ করিতেছে, যেন আমাদের টাউন হালের সম্বক্তাদিগকে অনুকরণ করিতেছে, সেই রূপ গলার আওয়াজের সহিত তাহাদের কার্য্য শেষ হয়। যুবা যশোলিপ্সু দিগের ন্যায় হাউই বাজি আকাশের দিকে মহা তেজে উঠিতেছে, আবার তেজ টুকু বাহির হইয়া গেলেই হেটমুখ হইয়া মাটিতে পড়িতেছে, যাহার মাথায় পড়ে তাহারই সর্ব্বনাশ। বঙ্গ দেশের অসংখ্য নব্য কবির ন্যায় আজি রাত্রিতে অসংখ্য পটকা শব্দ করিতেছে,—একই আওয়াজে তাহাদের উদ্যম শেষ, কেননা প্রথম প্রকাশিত পদ্য-কুসুম বা গীতিকাব্যটী বিক্রয় হইল না। বিষয়ীর ন্যায় চরকি বাজী বৃথা ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিতেছে, ঘুরিতে ঘুরিতে ও সকলকে জ্বালাইতেছে, মেজাজ বড় গরম কেহ কাছে যাইতে পারেনা। আর ছুঁচা বাজির ক্ষুদ্র ঘৃণিত জীবন ছুঁচামি করিয়াই শেষ হইল; কুটীলতা ভিন্ন সরল গতি তাহারা জানে না, পরকে বিরক্ত করা, পরনিন্দা, পরহিংসা, পরগ্লানি তাহাদের জীবিকার উপায়।

রাত্রি দশটার পর শরৎচন্দ্র হেমের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। বিন্দুর সহিত দেখা করিবেন মনে করিয়াছিলেন, দেখিলেন স্বয়ং হেমচন্দ্র দ্বারদেশে

তাঁহাকে প্রতীক্ষা করিতেছেন। হেমচন্দ্র নিস্তব্ধে শরতের হাত ধরিয়া বাহিরের ঘরে লইয়া গেলেন, শরৎ লজ্জায় ও উদ্বেগে কাঁপিতে কাঁপিতে হেমের সহিত সেই ঘরে গিয়া বসিলেন, মুখ নত করিয়া রহিলেন, বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

হেম প্রদীপের সল্‌তে উস্‌কাইয়া দিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন,

"শরৎ, আমার স্ত্রীকে তুমি যে কথা বলিয়াছিলে তাহা শুনিয়াছি।"

শরৎ অনেক কষ্ট করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন,

"যদি আমি দোষ করিয়া থাকি, আপনার বাল্য-সুহৃদের এই একটী দোষ ক্ষমা করুন।"

হেম। "শরৎ, তুমি দোষ কর নাই, তোমার উন্নত চরিত্রের উপযুক্ত কার্য্য করিয়াছ। জগৎ সুদ্ধ যদি তোমাকে নিন্দা করে, জানিও তোমার প্রতি আমার মত তিলার্দ্ধও বিচলিত হয় নাই।"

শরৎ উত্তর করিতে পারিলেন না, তাঁহার চক্ষুর জল হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। হেমচন্দ্র তাহা বুঝিলেন।

হেম। "আমার স্ত্রী বাল্যকাল অবধি তোমাকে বড় ভাল বাসেন, ভ্রাতার মত স্নেহ করেন, তিনিও তোমার কথায় দোষ গ্রহণ করেন নাই। তোমার প্রতি আমাদিগের ভক্তি আমাদিগের স্নেহ চিরকাল একরূপ থাকিবে।"

শরৎ। "আপনাদের এই দয়া আমি এ জীবনে ভুলিব না।"

ক্ষণেক উভয়ে চুপ করিয়া রহিলেন, পরে অনেক কষ্টের সহিত শরৎ হৃদয়ের উদ্বেগ দমন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,

"আমার প্রস্তাব সম্বন্ধে একটু বিবেচনা করিয়াছেন?" শ্বাস রুদ্ধ করিয়া শরৎ উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, তাহার জীবনের সুখ বা দুঃখ এই উত্তরে নির্ভর করে।

হেম। "সে কথা বলিতেছি তুমি সকল দিক দেখিয়া সকল বিষয় আলোচনা করিয়া এই প্রস্তাবটী করিয়াছ?"

শরৎ। "আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যত দূর বুঝিতে পারি ইহাতে কোনও পক্ষে কোনও ক্ষতি দেখিতে পাই না। যতদূর আমার সাধ্য, আমি বিশেষ চিন্তা করিয়াই এ প্রস্তাবটী করিয়াছি।"

হেম। "শরৎ, তুমি শিক্ষিত, কিন্তু তোমার বয়স অল্প, এই জন্যই আমি দুই একটী কথা স্মরণ করিয়া দিতেছি। এ বিবাহে অতিশয় লোক-নিন্দা।"

শরৎ। "অনেক নিন্দা সহ্য করিয়াছি, জীবনে অনেক নিন্দা সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি। কাযটী যদি অন্যায় না হয় তবে নিন্দা ভয়ে আমি জীবনের সুখ বিসর্জ্জন করিব?"

হেম। "তোমাদের একঘরে করিবে।"

শরৎ। "সমাজের যদি তাহাতেই রুচি হয়, তাহাই করুন। আমি সমাজের অনুগ্রহের প্রার্থী নহি।"

হেম। "তোমাদের নিষ্কলঙ্ক কুলে কলঙ্ক হইবে।"

শরৎ। "কলঙ্ক কি? আমি বিধবা বিবাহ করিয়াছি এই কথা। এটী যদি পাপ কার্য্য না হয় তবে সে কলঙ্ক আমার গায়ে লাগিবে না; যাঁহারা নিন্দা করিবেন তাঁহাদের মতামতে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। আর যদি আপনি এ কায নিন্দনীয় মনে করেন, আজ্ঞা করুন, আমি ইহাতে নিরস্ত হই।"

হেম। "বিধবা বিবাহ বোধ হয় আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র বিরুদ্ধ নয়, কিন্তু আধুনিক রীতি বিরুদ্ধ।"

শরৎ। "ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব্বে সমুদ্রগমনও রীতি বিরুদ্ধ ছিল, অদ্য জাহাজে করিয়া সহস্র সহস্র যাত্রী জগন্নাথ যাইতেছে। চন্দ্রনাথ বাবু সে দিন বলিলেন, অস্বাস্থ্যকর নিয়ম গুলির ক্রমশঃ সংস্কার হওয়াই জীবিত সমাজের লক্ষণ। ক্রমশঃ উন্নতিই জীবনের চিহ্ন, গতিহীনতা মৃত্যুর চিহ্ন।"

হেম। "শরৎ, তুমি চিন্তাশীল, তুমি উদার চরিত্র, একটী কথা আমি স্পষ্ট করিয়া বলিব, বিশেষ চিন্তা করিয়া তোমার প্রকৃত মতটী আমাকে বলিও। দেখ হৃদয়ের উদ্বেগ চিরকাল সমান থাকে না, অদ্য যে প্রণয় আমাদিগকে উন্মত্ত প্রায় করে, দুই বৎসর পর সেটী হ্রাস পায় অথবা সেটী একেবারে ভুলিয়া যাই। সুধার প্রতি তোমার এরূপ প্রণয় চিরকাল না থাকিতে পারে, তখন তোমার মনে কি একটু আক্ষেপ উদয় হইবে না? উত্তর করিও না, আমি যাহা বলিতেছি আগে মন দিয়া শুন। তখনও

তোমরা একঘরে হয়ে হইয়া থাকিবে, বন্ধুগণ তোমাদের গৃহে আহার করিবে না, তোমার কন্যাকে কেহ বিবাহ করিবে না, তোমার পুত্রকে কেহ গৃহে ডাকিবে না, সমাজের মধ্যে তোমরা একক। তখন হয় ত মনে উদয় হইবে কেন বাল্যকালে না বুঝিয়া একটী কায করিয়া এত বিপদ জড়াইলাম, আমার স্নেহের পাত্র, ভালবাসার পাত্র পুত্র কন্যাকে জগতে অসুখী করিলাম। শরৎ, যে কাযে এই ফল সম্ভব, সে কাযে কি সহসা হস্তক্ষেপ করা বিধেয়? যৌবনের সময় একটু বিচক্ষণতার সহিত কার্য্য করিয়া বার্দ্ধক্যের অনুশোচনা দূর করা উচিত নহে? সুধার ন্যায় অনিন্দনীয়া রূপবতী, ত্রয়োদশ বর্ষীয়া সরলহৃদয়া অনেক বালিকা কায়স্থ গৃহে আছে, তোমার ন্যায় জামাতা পাইলে তাহাদের পিতা মাতা আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিবেন, সেরূপ বিবাহ করিলে, এখন না হউক কালে তুমিও সুখী হইবে। শরৎ, তুমি বুদ্ধিমান্, বিবেচনা করিয়া কার্য্য কর, এখনকার লালসার বশবর্ত্তী না হইয়া যাহাতে জীবনে সুখী হইবে তাহাই কর।"

শরৎ। "হেম বাবু, আমার কথায় বিশ্বাস করুন, আমি কেবল হৃদয়ের উদ্বেগের বশবর্ত্তী হইয়া এই প্রস্তাব করি নাই, জীবনে সুখী হইব সেই আশায় প্রস্তাব করিয়াছি। আপনি যে কথাগুলি বলিলেন তাহা শতবার আমার মনে উদয় হইয়াছে, আলোচনা করিতে ত্রুটী করি নাই। আক্ষেপের বিষয় যে বলিতেছেন, যদি বিধবা বিবাহ নিন্দনীয় কার্য্য হয় তবে আক্ষেপ হইবে বটে, যদি তাহা না হয় তবে তজ্জন্য কখনই আমার হৃদয়ে আক্ষেপ উদয় হইবে না। বলুন এই বিস্তীর্ণ সমাজে কেন্ বিজ্ঞ লোক সৎকার্য্য করিয়া পরে আক্ষেপ করিয়াছেন? ধর্ম্ম প্রচার করিয়া অনেকে জাতি হারাইয়াছেন, বিদেশ গমন করিয়া অনেকের জাতি গিয়াছে, ইঁহাদিগের মধ্যে কোন্ তেজস্বী লোক সেইরূপ কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া পরে আক্ষেপ করিয়াছেন? সমাজের সংস্কার পথে তাঁহারা অগ্রগামী হইয়াছেন, এই চিন্তা তাঁহাদিগের জীবনের সুখের হেতু হয়, এই চিন্তা তাঁহাদিগের বার্দ্ধক্যে শান্তি দান করে। হেমবাবু তাঁহারা সমাজের বহির্ভূত নহেন, সমাজ অদ্য তাঁহাদিগকে ভক্তি করে, সমাদর করে, স্নেহ করে, কল্য তাঁহাদিগকে আপন বলিয়া গ্রহণ করিবে। এইরূপে সমাজ সংস্কার সিদ্ধ হয়, এইরূপে

জীবিত সমাজ হইতে অনিষ্টকর নিষেধগুলি একে একে স্খলিত হয়।

হেমবাবু, পরে আক্ষেপ হইবে এরূপ কায করিতেছি না, চিরকাল সুখে থাকিব, জগদীশ্বরের ইচ্ছায় চিরকাল অভাগিনী সুধাকে সুখী করিব এই জন্য এই কাজ করিতেছি।

সুধার মন, সুধার হৃদয়, সুধার স্নেহ, সরলতা ও আত্মবিসর্জ্জন আমি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছি, সুধা আমার সহধর্ম্মিণী হইলে এ জীবন অমৃতময় হইবে। হেমবাবু, আমার হৃদয়ের উদ্বেগের কথা বলিয়া আপনাকে ত্যক্ত করিব না, কিন্তু যদি এ বিবাহে আপনাদিগের মত না হয়, আমার জীবনের উদ্যম ও আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ ও চেষ্টা অদ্য সাঙ্গ হইল, হৃদয়ে একটী শেল লইয়া শ্রমজীবীরা পরিশ্রম করে না।”

হেমচন্দ্র একটু হাসিয়া বলিলেন “একটী বালিকার জন্য উৎসাহী পুরুষের জীবনের উৎসাহ লোপ হয় না,—একটী নৈরাশ্যে তোমার ন্যায় উন্নত হৃদয় যুবকের জীবনের চেষ্টা ও উদ্যম ক্ষান্ত হইবে না।”

হতাশ হইয়া শরৎ বলিলেন—“একটী অবলম্বন না থাকিলে মনুষ্য হৃদয়ে উৎসাহ, চেষ্টা, ধর্ম্ম কিছুই থাকে না, অদ্য আমার জীবন অবলম্বন-শূন্য হইল। কিন্তু এ কথা আপনাকে বুঝাইতে পারি এরূপ আমার ক্ষমতা নাই। তবে আপনারা স্থির করিয়াছেন, এ বিবাহে আপনাদিগের মত নাই?”

হেমচন্দ্র শরতের দুইটী হাত ধরিয়া হাসিয়া বলিলেন “শরৎ, তুমি ভাল করিয়া বুঝিয়া সুঝিয়া এই কার্য্যটী করিতেছ কি না তাহাই দেখিতে-ছিলাম। উপরে যাও, আমার স্ত্রী তোমাকে বলিবেন এ বিবাহে আমাদের সম্পূর্ণ মত আছে। হতভাগিনী সুধার জীবন জগদীশ্বর সুখপূর্ণ করিবেন তাহাতে কি আমাদের অমত হইবে? জগদীশ্বর তোমাদের উভয়কে সুখী করুন।”

শরৎ উত্তর করিতে পারিলেন না। ধারা বহিয়া তাহার নয়ন হইতে অশ্রু পড়িতে লাগিল। তিনি নীরবে হেমের হাত দুটী আপনার মাথায় স্থাপন করিলেন, পরে উপরে গেলেন।

শয়নঘরে বিন্দু একটী প্রদীপ জ্বালিয়া একটী মাদুর পাতিয়া বসিয়াছিলেন, শরৎ সাহসে সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া বিন্দুর পা দুটী ধরিয়া নয়ন জলে তাহা সিক্ত করিয়া গদ্‌গদ্ স্বরে বলিলেন,

"বিন্দুদিদি, তুমি আমাকে জীবন দান করিলে, এ দয়া, এ স্নেহের কি পরিশোধ করিতে পারি ?"

বিন্দু। "ও কি শরৎবাবু, ছাড়, ছাড়, ছি! ছি! যার পা ধরিতে হবে সে ধরবেই এখন, আমাকে কেন, ছি। ছেড়ে দাও।"

শরৎ একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,

"বিন্দুদিদি, তুমি হেম বাবুকে এ কথা বুঝাইয়াছ, তুমি এ কার্য্যে সম্মত হইয়াছ, তাহার জন্য চিরকাল তোমার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব।"

বিন্দু। "আর সম্মতি না দিয়া কি করি ? যখন বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তা সম্মত হইয়াছেন তখন আর আমরা বারণ করে কি করি ?"

শরৎ। "বরকর্ত্তা আর কন্যাকর্ত্তা কে ?"

বিন্দু। "দেখতে পাচ্চি বরই বরকর্ত্তা, কন্যাই কন্যাকর্ত্তা! বর এসে কনে দেখে গেলেন, বেশ পছন্দ হইল, আর কনেও লুকিয়ে লুকিয়ে বর দেখিলেন, বেশ পছন্দ হইল, সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেল!"

শরৎ। "বিন্দুদিদি, একবার উপহাস ত্যাগ কর, তুমি নিঃসঙ্কুচিত চিত্তে তোমার সম্মতি প্রকাশ করিয়া আমার মনকে শান্ত কর। সুধা ছেলে মানুষ, তার আবার সম্মতি কি সে এ গুপ্ত কার্য্যের কি বুঝিবে বল ?"

বিন্দু। "না গো, সে এখন বেশ বুঝতে সুঝতে শিখেছে। তা বুঝি জান না ? সে যে এখন সেয়না মেয়ে হয়েছে, লুকিয়ে লুকিয়ে বিষবৃক্ষ পড়ে।"

শরৎ। "তোমার পায়ে ধরি বিন্দুদিদি, ঠাট্টা ছাড়, একবার তোমার মনের কথাটী বলিয়া আমাকে তৃপ্ত কর।"

বিন্দু। "না বাবু, পায়ে টায়ে ধরিও না, এখনই সুধা দেখতে পাবে, আবার রাগ করবে ? তুমি চলে গেলে কি আমরা দুটী বনে কোঁদল করিব ? পরের দায়ে কেন ঠেকা বাবু ?"

শরৎ। "তোমার সঙ্গে আর পারলুম না বিন্দুদিদি। মনে করেছিলুম

তোমার সঙ্গে পরামর্শ করিব, সব ঠিকঠাক করিব, তা দেখছি আজ কিছুই হইল না।”

বিন্দু। “তা ঠিকঠাক আর কি? কেবল বামুন পুরুত ডাকা বাকি আছে বৈত নয়, তা না হয় ডেকে দি বল? না কি আজকাল কলেজের ছেলে নিজেই বামুন পুরুতের কাজ সেরে নেয় তাও ত জানি নি। স্ত্রী-আচারটা কি আমাদের করিতে হবে, না তাও সুধা নিজেই সেরে নেবে? তা না হয় সুধাকে ডেকে দি? ও সুধা! একবার এ দিকে আয় ত ব’ন, শরৎ বাবু তোকে ডাকচেন, বড় দরকার, একটু শিগ্‌গির করে আয়।”

শরৎ হতাশ হইয়া উঠিলেন, বিন্দুও হাসিতে হাসিতে উঠিলেন। তখন শরৎ বিন্দুর দুটী হাত ধরিয়া বলিলেন,

“বিন্দুদিদি, তুমি ছেলে বেলা থেকে আমাকে বড় স্নেহ কর, একটী কথা শুন। তুমি এ কার্য্যে সম্মত হইয়াছে, হেমবাবু তাহা আমাকে বলিয়াছেন, একবার সেই কথাটী মুখে বলিয়া আমাকে তৃপ্ত কর,—একবার আমাদের আশীর্ব্বাদ কর।”

বিন্দু তখন ধীরে ধীরে বলিলেন “শরৎ বাবু, ভগবান্ আমার অভাগিনী ভগ্নীর জীবনের সুখের উপায় করিয়া দিয়াছেন তাহাতে কি আমাদের অমত? ভগবান্ তোমাকে সুখে রাখুন, তোমার চেষ্টা গুলি সফল করুন, তোমাকে মান্য ও যশ দান করুন। অভাগিনী সুধাকে ভগবান্ সুখে রাখুন, যেন চির-পতিব্রতা হইয়া সংসারে সুখলাভ করে।”

সাশ্রুনয়নে শরৎ উত্তর করিলেন ‘ বিন্দুদিদি, জগদীশ্বর তোমার এ দয়ার পুরস্কার দিবেন। তোমাদের দয়া, তোমাদের সৎকার্য্যে সাহস, তোমাদের অনিন্দনীয় জ্ঞান এ জগতে দুর্লভ। লোকনিন্দা ভয় করিও না;—বঙ্গদেশের প্রধান পণ্ডিতগণ বলেন বিধবা-বিবাহ আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নহে।”

“বিন্দু। “শরৎ বাবু, আমি মেয়ে মানুষ, আমি শাস্ত্র বুঝি না। কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় যে কচি মেয়েকে আমরা চিরকাল যাতনা দিব এরূপ আমাদের শাস্ত্রের মত নহে, দয়াবান পরমেশ্বরেরও ইচ্ছা নহে।”

জগতের মধ্যে সুখী শরৎচন্দ্র বিন্দুর নিকট অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

করিয়া বিদায় লইলেন। নীচে উঠানে আসিলেন। দেখিলেন সুধা ভাঁড়ার ঘরের দরজায় চাবি দিয়া একটী প্রদীপ হাতে করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে! শরৎ সুধাকে প্রায় দুই মাস অবধি দেখেন নাই, তাঁহার হৃদয় স্তম্ভিত হইল, শরীর কণ্টকিত হইল। ঐ লাবণ্যময়ী পবিত্রহৃদয়া স্বর্গীয়া কন্যা কি শরতের হইবে? ঐ স্নেহপ্লাবিত নির্ম্মল নয়ন দুটী কি শরৎ চুম্বন করিবেন? ঐ লতা-বিনিন্দিত কমনীয় পেলব বাহুদুটী কি শরত নিজ বাহুতে ধারণ করিবেন? ঐ কুসুম বিনিন্দিত লাবণ্যবিভূষিত দেহলতা কি শরৎ নিজ বক্ষে ধারণ করিবেন? শরতের দরিদ্র কুটীরে কি ঐ সুন্দর কুসুমটী দিবারাত্র প্রস্ফুটিত থাকিবে? প্রাতঃকালে ঊষার আলোকের ন্যায় ঐ প্রণয় তারাটী শরতের জীবন আলোকিত করিবে? সায়ংকালে ঐ স্নেহ প্রদীপ শরতের ক্ষুদ্র কুটীর উজ্জ্বল করিবে? অসংখ্য উদ্যমে, অসংখ্য চেষ্টা ক্লেশে ও পরিশ্রমে ঐ স্নেহময়ী ভার্য্যা কি শরতের জীবনে শান্তি দান করিবে, জীবন সুখময় করিবে? এইরূপ চিন্তা লহরীতে শরতের পূর্ণ হৃদয় উথলিতে লাগিল, শরৎ একটী কথা কহিতে পারিল না।

সুধা কবাটের শিকলি দিয়া চাবি বন্ধ করিয়া দেখিলেন শরৎ বাবু দাঁড়াইয়া আছেন। সহসা তাহার গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল লজ্জায় রক্তবর্ণ হইল, সুধা হেটমুখী হইল,—মাথায় কাপড়টী টানিয়া দিল। আবার শরৎ বাবুর কাছে মাথায় কাপড় দিল মনে করিয়া অধিক লজ্জিত হইল, চক্ষু দুটী মুদিত করিল,—চক্ষুর উপরের চর্ম্ম পর্য্যন্ত লজ্জায় রঞ্জিত হইয়াছে। সুধা আর দাঁড়াইতে পারিল না,—দৌড়াইয়া পলাইয়া গেল।

সুধার সেই রঞ্জিত অবনত মুখ খানি অনেক দিন শরতের হৃদয়ে অঙ্কিত রহিল। ক্লেশে, নৈরাশ্যে, পীড়ায়, সে মূর্ত্তি অনেক দিন তাঁহার স্মরণপথে আরোহণ করিয়াছিল।

আনন্দ ও উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে শরৎ বাটী আসিলেন। শরতের ভাগ্যে কি এই স্বর্গীয় সুখ যথার্থই আছে? না অদ্য রজনীর দীপাবলির ন্যায় এই সুখের আশা সহসা নিবিয়া যাইবে, ঘোর অমাবস্যার অন্ধকারে শরতের হৃদয় পূর্ণ করিবে? অপরিমিত সুখ মনুষ্য ভাগ্যে প্রায় ঘটে না, অপরিমিত সুখের সময় মনুষ্য হৃদয়ে এইরূপ ভাবের উদয় হয়।

বাটী আসিবা মাত্র শরতের ভৃত্য শরতের হস্তে এক খানি পত্র দিল। শরতের হৃদয় সহসা স্তম্ভিত হইল, কেন হইল শরৎ তাহা জানেন না।

উপরে গিয়া বাতির আলোকে শরৎ দেখিলেন তাঁহার মাতার চিঠি। মাতা গুরুকে দিয়া এই পত্র লিখাইয়াছেন। পত্র এই রূপ।

"বাছা শরৎ! তুমি সুস্থ শরীরে কুশলে থাক, তোমার চেষ্টা সফল হয়, তোমার জীবন সুখময় হয়, তাহাই ভগবানের নিকট দিবারাত্রি প্রার্থনা করিতেছি।"

"বাছা আজ একটী নিন্দার কথা শুনিয়া মনে বড় ব্যথা পাইলাম। বাছা শরৎ, তুমি ভাল ছেলে, তুমি মাকে ভালবাস আমি এ নিন্দার কথা বিশ্বাস করি না; তুমি তোমার অভাগিনী মাতাকে কষ্ট দিবে না।

"লোকে বলে তুমি সুধাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। বাছা এটী অধর্ম্মের কথা, এ কাযটী করিয়া তোমার বাপের নির্ম্মল কুলে কলঙ্ক দিও না, তোমার মা যত দিন বেঁচে আছে তাহাকে তুমি কষ্ট দিও না। বাছা, তুমি ত কথার অবাধ্য ছেলে নও।

"বাছা শরৎ, আমি অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছি। তোমার বাপ আমাকে কাঁদাইয়া রেখে গেছেন,—বাছা কালিব যে অবস্থা তাহা তুমি জান। তুমি আমার হৃদয়ের ধন, তোমার আশায় বেঁচে আছি, এ বয়সে তুমি আমাকে কাঁদাইও না,—আমার অধিক দিন বাঁচিবার নাই।

আমার মাথার চুলের মত তোমার পরমায়ু হউক। ভগবান্ তোমাকে সংসারে সুখ দান করুন, পুণ্য কর্ম্মে তোমার মতি হউক্। এ অভাগিনী আর কি আশীর্ব্বাদ করিবে?"

শরৎ একবার, দুইবার, তিনবার এই পত্র পাঠ করিলেন। তাঁহার হাত কাঁপিতে লাগিল, সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। দুর্ব্বল হস্ত হইতে পত্রখানি পড়িয়া গেল;—শরৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মাতা ও সন্তান।

সে দিন রাত্রিতে শরৎ যে যাতনা ভোগ করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করিতে আমরা অক্ষম। নৈরাশ্যের কৃষ্ণবর্ণ ছায়া তাঁহার হৃদয়কে আবৃত করিল, আপনার কার্য্য ঘৃণাও লজ্জা তাঁহাকে ব্যথিত করিল, বন্ধুর সর্ব্বনাশ করিয়াছেন এই চিন্তা শত বৃশ্চিকের ন্যায় তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল।

যে স্বপ্ন-বৎ সুখের আশা ছয় মাস ধরিয়া শরৎ হৃদয়ের হৃদয়ে সযত্নে ধারণ করিয়াছেন তাহা অদ্য জলাঞ্জলি দিবেন? মাতৃ আজ্ঞা পালনার্থ শরৎ তাহা করিতে প্রস্তুত আছেন। সমস্ত জীবন সুখশূন্য উদ্দেশ্য-শূন্য চেষ্টা ও আশা শূন্য হইবে, মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক ও রসশূন্য হইবে, দুর্ব্বহ জীবন ভার বহন করিতে পারিবেন? মাতৃ আজ্ঞার জন্য শরৎ তাহাতেও প্রস্তুত আছে। কিন্তু জীবনের প্রিয়তম বন্ধু হেমচন্দ্র ও বিন্দুর নামে আজি যে কলঙ্ক রটিল, সমাজে তাহাদিগকে ঘৃণা করিবে, তিরস্কার করিবে, অঙ্গুলি দিয়া তাহাদিগের দিকে দেখাইয়া দিবে, শরৎ সেটি কি সহ্য করিতে পারিবেন? লোকে এখন বলিবে ঐ দুইজনে একটা নষ্টা বিধবাকে শরতের সঙ্গে বিবাহ দিতে চাহিয়াছিল, শরৎ বুঝিয়া সুঝিয়া সে বিবাহ করিলেন না, ব্যভচারিণীটা হেমবাবুর ঘরেই আছে, এ হৃদয়-বিদারক কথা কি শরৎ সহ্য করিতে পারিবেন। যে বিন্দু বাল্যকালাবধি শরতের স্নেহময়ী ভগিনীর ন্যায় তাঁহার প্রতি শরৎ এইরূপ আচরণ করিবেন? যে হেমবাবু স্বীয় ঔদার্য্যগুণে শরৎকে ভ্রাতার ন্যায় ভাল বাসিতেন, লোক নিন্দা তুচ্ছ করিয়া আজি কেবল শরৎ ও সুধার সুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া শরতের বিষম প্রস্তাবেও সম্মত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে কি শরৎ জগতের তিরস্কার ও ঘৃণার পদার্থ করিবেন? যে স্নেহপূর্ণ নিষ্কলঙ্ক পরিবারে প্রবেশ করিয়া শরৎ এতদিন শান্তি লাভ করিয়াছিলেন, আজি কি কুটিলগতি বিষধর সর্পের

ন্যায় তাহাদিগকে দংশন করিয়া চলিয়া আসিবেন? কালকূট বিষে সে পরিবার জর্জ্জরিত হউক, ধ্বংস প্রাপ্ত হউক, অনপনেয় কলঙ্ক সাগরে নিমগ্ন হউক, শরৎ নিঃসঙ্কুচিত চিত্তে তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া আসিলেন! এ চিন্তা শরতের অসহ্য হইল, অসহ্য বেদনায় চিৎকার করিয়া উঠিলেন "মাতা, ক্ষমা কর, আমি এ কাযটী পারিব না।"

আর সেই ধর্ম্ম-পরায়ণা, পবিত্র-হৃদয়া হতভাগিনী সুধা? ছয় মাস পূর্ব্বে সে বালিকা ছিল, প্রণয়ের কথা জানিত না, বিবাহের কথা মনে উদয় হয় নাই। এই ছয় মাসের মধ্যে শরৎই তাহাকে প্রণয় কাহাকে বলে শিখাইয়াছে, বালিকার হৃদয়ে নূতন ভাব, নূতন চিন্তা, নূতন আশা জাগরিত করিয়াছে। আহা! উষার আলোক যেরূপ নিস্তব্ধে ধীরে ধীরে সুপ্ত জগতে ও গভীর আকাশে প্রসারিত হয়, এই নূতন আশা অনাথিনী বিধবার হৃদয়ে সেইরূপ ব্যাপ্ত হইয়াছে, আজি লজ্জাবতী নম্রমুখী বিধবা তৃষার্ত্ত চাতকের ন্যায় সেই প্রণয় বারির জন্য চাহিয়া রহিয়াছে। এখন শরৎ তাহাকে বঞ্চিত করিবেন? চিরকাল হতভাগিনী করিবেন, কলঙ্কে কলঙ্কিতা করিয়া তাহাকে এই নিষ্ঠুর সংসার মধ্যে ত্যাগ করিবেন? হয় ত অসহ্য অবমাননা ও কলঙ্কে দগ্ধহৃদয় হইয়া অকালে সে প্রাণত্যাগ করিবে, অথবা চিরজীবন হৃদয়ে এই নিষ্ঠুর শেল বহন করিয়া জীবন্মৃত হইয়া থাকিবে! শরৎ আর সহ্য করিতে পারিলেন না, গর্ব্বিত যুবক আজি ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া বালিকার ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন।

ঘর বড় গরম হইল। শরৎ উঠিয়া গবাক্ষের কাছে দাঁড়াইলেন, শরৎ কালের নৈশবায়ু তাঁহার ললাটে লাগিল, তাঁহার জ্বলন্ত মুখমণ্ডল ঈষৎ শীতল হইল। সমস্ত জগৎ সুপ্ত ও নিস্তব্ধ। অমাবস্যার অন্ধকারে আকাশ ও মেদিনী আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, আকাশ হইতে অসংখ্য তারা এই পাপ-পূর্ণ শোকপূর্ণ জগতের দিকে নিস্তব্ধে দৃষ্টি করিয়া রহিয়াছে।

মাতা পত্রে লিখিয়াছেন তিনি দুই এক দিনের মধ্যে কলিকাতায় আসিবেন। মাতাকে এ সকল কথা বুঝাইলে তিনি বুঝিবেন? এ কার্য্যে তিনি সম্মতি দিবেন? সে বৃথা আশা! শরৎ মাতাকে জানিতেন, বার্দ্ধক্যে বৈধব্যে, তিনি কখনই এ কার্য্যে সম্মত হইবেন না, কিম্বা যদি মুখে সম্মতি

প্রকাশ করেন, হৃদয়ে বড় ব্যথা পাইবেন, পুত্রের আচরণে অচিরে শোকে প্রাণত্যাগ করিবেন। করযোড় করিয়া সেই নীল আকাশের দিকে চাহিয়া শরৎ সাশ্রুনয়নে কহিলেন "পুণ্যা জননি! আমি যেন সন্তানের আচরণ না ভুলি, তোমার হৃদয়ে যেন সন্তাপ না দি, তোমার শেষ কাল যেন তিক্ত না করি।"

সমস্ত রাত্রি চিন্তার দংশনে শরৎচন্দ্র ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালের শীতল বায়ুতে তাঁহার শরীর একটু শীতল হইল, মন একটু শান্তি লাভ করিল, তিনি কর্ত্তব্য নিরূপণ করিলেন। শোকসন্তপ্ত কিন্তু শান্ত হৃদয়ে তিনি দিবালোক প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

প্রাতঃকালের শীতল বায়ুতে তাঁহার একটু তন্দ্রা আসিল। কতক্ষণ নিদ্রা গেলেন তাহা তিনি জানেন না. কিন্তু তাঁহার বোধ হইল যেন কেহ কোমল হস্তে তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতেছে। তখন চক্ষু উন্মীলিত করিলেন, দেখিলেন তাঁহার স্নেহময়ী মাতা তাঁহার মাথাব কাছে বসিয়া বাৎসল্য ও স্নেহের সহিত তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতেছেন। শরৎ উঠিবামাত্র তাঁহার মাতা বলিলেন,

"বাছা শরৎ তুমি এত কাহিল হয়ে গেছ; আহা তোমার মুখখানি শুকিয়ে গিয়েছে। আহা বিছানায় না শুইয়া ভূমিতে শুইয়া আছ কেন? এস বাছা বিছানায় এস।"

শরৎ। "না মা, আমি বেশ ঘুমাইয়াছি আর ঘুমাব না। মা তুমি কখন এলে? কবে আসিবে তাহা ঠিক কবে আমাকে লেখ নি কেন? তোমার ষ্টেশন হইতে আসিতে কোনও কষ্ট হয়নি ত?"

মাতা। "না বাছা, আমার সঙ্গে গুরু এসেছেন, তিনি গাড়ি টাড়ি ঠিক করে দিয়েছেন, আমার কোনও কষ্ট হয় নাই।"

শরৎ "মা, আমি না বুঝিযা সুঝিয়া অপরাধ করিয়াছি, তোমার মনে কষ্ট দিয়াছি সেটী ক্ষমা কর। তোমার চিঠি পাইয়া আমার অভিপ্রায় ত্যাগ করিয়াছি। মা আমি তোমার অবাধ্য হইব না, যদি কিছু কষ্ট দিয়া থাকি সন্তানকে সে টুকু ক্ষমা কর। মা তুমি আমার সকল দোষই ত ক্ষমা কর।"

বৃদ্ধার নয়ন হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল; তিনি স্নেহ গদ্ গদ্ স্বরে বলিলেন,

"বাছা শরৎ, তোর মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, তুই আমার কথাটী রেখে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা করিলি। বাছা তুমি আমার কথা রাখিবে তাহা জানিতাম, তুমি ত বাছা আমার অবাধ্য ছেলে নও। আহা ভগবান্ তোমাকে সুখী করুন।"

মাতার হস্তদুটী মস্তকে স্থাপন করিয়া শরৎচন্দ্র অবারিত অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মাতা অঞ্চল দিয়া পুত্রের অশ্রু মুছাইয়া দিলেন, মাতৃস্নেহে পুত্রের হৃদয় শান্ত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কুল গৌরবের পরিণাম।

সুধার সহিত শরতের বিবাহের কথা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তথাপি মেয়ে মহলে সে কলঙ্কের কথা নিয়া অনেক দিন অবধি নাড়া চাড়া হইতে লাগিল, এমন সরস কথা কি আর রোজ রোজ মিলে? কালীতারার শাশুড়ীরা ত হাটের নেড়া হুজুক চায়, যখন একটু কায কর্ম্ম করিয়া অবসর হয়, অথবা কালীতারাকে গঞ্জনা দিতে ইচ্ছে হয় অমনি কথায় কথায় ঐ কথা উঠে।

ছোট। "হেঁ হেঁ বে ভেঙ্গে গেছে, মুখেই ভেঙ্গেছে, কাজে কি আর ভাঙ্গে। আমার বেন কলকেতায় এসেছেন, ছেলে আর কি করে দিন কত চুপ করে আছে। বেনও গঙ্গাযাত্রা করবে আর ছেলেটা ঐ হতভাগা ছুঁড়ীটাকে আবার বিয়ে করবে।"

মেজ। "হেঁ গো হেঁ বেন বড় গুণবতী। ঐ পোড়ামুখীই ত সব করেছে, ও না করলে কি আর সম্বন্ধ হেতো? তার পর আমাদের ভয়ে সিন কাযটা

থেমে গেল, আমাদের ঘরে মেয়ে দিয়েছে পোড়ামুখীর প্রাণে ভয় নেই, ঐ বে হোলে কি আজ কালীকে আস্তো রাখতুম? আহা যেমন নচ্ছার মা তেমনি নচ্ছার মেয়েও হয়েছে, 'এমন ছোট লোকের ঘরের মেয়েও বে করে আনে? আমাদের এমন কুলেও কালী দিয়েছে।"

ছোট। "আর সেই মাগীই কি নচ্ছার বাবু,—ঐ হেমবাবুর স্ত্রীর কি লজ্জা সরম নেই? সে কিনা বিধবা ব'নটাকে বিয়ে দিতে রাজি হলো? ও মা ছি! ছি! চোদ্দ পুরুষকে একেবারে কলঙ্কে ডুবালে? অমন মেয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল। বাপ মায় নুন খাইয়া মেরে ফেলেনি কেন?"

মেজ। "আর সেই এক রত্তি মেয়েটাই কি নচ্ছার গা? অমন বিধবাকে কি আর ঘরে রাখতে হয়? অন্য লোকে হলে কাশী বৃন্দাবন পাঠিয়ে দিত, কি হরিনামের মালা হাতে দিয়ে বৈষ্ণবদের আখড়ায় পাঠিয়ে দিত। ছি! ছি! ভদ্দর নোকের ঘরে এমন লজ্জার কথা?"

ছোট। "তা দিকনা সেটাকে বের করে, আর এত ঢলাঢলি কেন, সেটাকে বাজারে বের করে দিক্ না?"

মেজ। "ওলো ঢলাঢলির কি হয়েছে? আরও হবে। তোরা ত বন সব কথা জানিস নি, আমি ওদেব সব শুনেছি। এই দেখ না কি হয়? বড় দেরি নেই। তখন কেমন করে নুকোয় দেখব। পুলিসে খবর দিও না। অমন কুটুম থাকার চেয়ে না থাকা ভাল, কুটুমের মুখে আগুণ।"

ছোট। "আবার বেন কলকেতা এসে কালীকে নিতে নোক পাঠিয়েছিল। একটু লজ্জা সরম নেই গা।"

মেজ। "ও লো লজ্জা সরম থাকলে আর পোড়ামুখী ছেলের অমন সম্বন্ধ করে? তা হতভাগা বংশে আর কি হবে বল না? বৌমাকে নিতে আসবে? কাঠের চেলা দিয়ে পিঠ ভেঙ্গে দেব না? কালী একবার যাবার নাম করুক দিকি? ওর পিঠের চামড়া যদি না তুলি ত আমি কায়েতের মেয়ে নই। ছি! ছি! অমন ঘরে বৌ পাঠায়, ওদের ছুঁলে আমাদের সাত পুরুষের জাত যায়, কি ঝকমারি হয়েছে যে এমন হাড়ি ডোমের ঘরে গিয়ে বাবু বে করেছেন। ছি! ছি! ছি!"

এইরূপ বংশের সুখ্যাতি, মাতার সুখ্যাতি, শরতের সুখ্যাতি, বিন্দু ও সুধার সুখ্যাতি কালীতারাকে কত দিন শুনিতে হইত তাহা আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু অমৃত-ভাষিণীদিগের সে অমৃত বচন এক্ষণ কিছু দিনের জন্য মুলতুবি রহিল,—বাবুর পীড়া সহসা এত বৃদ্ধি পাইল যে তাঁহার প্রাণের সংশয়; তখন সকলে তাঁহার চিন্তায় ব্যাকুল হইল।

তখন কালীতারার খুড়-শাশুড়ীরা বড়ই ভয় পাইল, সে বিপুল বংশ গোছাইয়া রাখিতে পারে এমন আর একজন লোক সে বংশে ছিল না। কালীতারা ভয়ে ও চিন্তায় শীর্ণ হইয়া গেল, খাইবার সময় খাওয়া হইত না, রাত্রিতে চিন্তায় ঘুম হইত না, কেবল বাবু কেমন আছেন জানিবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতেন। ভগিনীপতির সঙ্কটাপন্ন পীড়ার সংবাদ পাইয়া শরৎ চন্দ্র সে বাটীতে আসিলেন, কয়েক দিন তথায় রহিলেন। হেমচন্দ্রও প্রত্যহ প্রাতঃকালে আসিয়া দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত তথায় থাকিতেন। তাঁহাকে দেখিয়া লোকে কানাকানি করিত, তিনি তাহা গ্রাহ্য করিতেন না। হেমকে দেখিয়া শরৎও একটু অপ্রতিভ হইলেন, কিন্তু উদার-চরিত্র হেম শরৎকে এক পার্শ্বে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, "শরৎ তুমি আর আমাদের বাড়ী যাও না কেন? তুমি মন্দ কার্য্য কর নাই, লজ্জা কিসের? বিবাহে তোমার মাতার মত নাই, মাতার কথা অনুসারে কার্য্য করিয়াছ তাহা কি নিন্দনীয়? তোমার মাতার অমতে তুমি যদি বিবাহ করিতে স্বীকার করিতে, আমরা স্বীকার করিতাম না। শরৎ তোমার কার্য্যে দোষ নাই, দোষের কার্য্য না করিলে নিন্দার কারণ নাই। লোকের কথা আমরা গ্রাহ্য করি না, তুমিও গ্রাহ্য করিও না।" শরৎ হেমের এই কথাগুলি শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। যে বাল্যবন্ধুকে তিনি জগতের ঘৃণাস্পদ করিয়াছেন, যাঁহার পবিত্র সংসার তিনি কলঙ্কিত করিয়াছেন, সেই ঋষিতুল্য ব্যক্তি আপনি আসিয়া শরতের হাত ধরিয়া তাঁহাকে সকল মার্জ্জনা করিলেন। শরৎ হেমের কথায় উত্তর দিতে পারিলেন না, কৃতজ্ঞতায় তাঁহার চক্ষু জলপূর্ণ হইল, মনে মনে কহিলেন "এত দিন আপনাকে জ্যেষ্ঠ সহোদর বলিয়া স্নেহ করিতাম, অদ্য হইতে দেব বলিয়া পূজা করিব।"

হেমচন্দ্র ও শরৎ রোগীর যথেষ্ঠ সুশ্রূষা করিলেন। ঠাকুরের প্রসাদ

বন্ধ করিয়া দিলেন। অর্থব্যয়ে সঙ্কুচিত না হইয়া কলিকাতার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসকগণকে প্রত্যহ ডাকাইতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের আদেশ সম্পূর্ণরূপে পালন হয় দেখিবার জন্য শরৎ দিবারাত্রি রোগীর ঘরে থাকিতেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। এক সপ্তাহ উৎকট পীড়া সহ্য করিয়া কালীতারার স্বামী মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

কালীর শরীরখানি চিন্তায় আধখানি হইয়া গিয়াছিল;—এ সংবাদ পাইবামাত্র চিৎকার শব্দে রোদন করিয়া ভূমিতে আছাড় খাইয়া মূৰ্চ্ছিতা হইল।

শরৎ অনেক জল দিয়া বাতাস করিয়া দিদিকে সংজ্ঞাদান করিলেন, তখন কালীতারা একবার স্বামীকে দেখিবে বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। শরৎচন্দ্র সেটী নিবারণ করিতে চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না,—আলু থালু বেশে আলুলায়িত কেশে শোকবিহ্বলা কালীতারা স্বামীর ঘরে দৌড়াইয়া গেলেন, মৃত স্বামীর চরণ দুটী মস্তকে স্থাপন করিয়া ক্রন্দন ধ্বনিতে সকলের হৃদয় বিদীর্ণ করিলেন। কালীতারা স্বামীর প্রণয় কখনও জানে নাই, অদ্য সে প্রণয়টী জানিল, শূন্য-হৃদয় বিধবার অসহ্য যাতনায় স্বামীপদে বার বার লুণ্ঠিত হইয়া অভাগিনীর কান্না কাঁদিতে লাগিল। একবার করিয়া মৃত-স্বামীর মুখমণ্ডল দেখে, আর একবার করিয়া হৃদয় উথলিয়া উঠে, রোদনেও তাহার শান্তি হয় না। ক্ষণেক পর আবার মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িল,—কালীর চৈতন্য শূন্য শীর্ণ দেহ হস্তে উঠাইয়া শরৎ অন্য ঘরে লইয়া আসিলেন।

কয়েকদিন পরে কালীতারার শ্বশুরবাড়ীর সকলে বৰ্দ্ধমানে প্রস্থান করিলেন। শোকবিহ্বলা বিধবা ভবানীপুরে শরতের বাড়ীতে আসিয়া মাতার স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে শান্তি লাভ করিলেন। কালীর বয়ঃক্রম ২০ বৎসর হয় নাই, কিন্তু তাহার সম্মুখের সমস্ত চুল উঠিয়া গিয়াছে, চক্ষু দুটী বসিয়া গিয়াছে, শরীর-যষ্টিখানি অতি শীর্ণ, শোকে ও কষ্টে নানারূপ রোগের সঞ্চার হইয়াছে। দেখিলে তাঁহাকে চত্বারিংশৎ বৎসরের চিররোগিণী বলিয়া বোধ হয়। চিরদুঃখিনী মাতৃস্নেহে কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিলেন।

কুলমর্য্যাদা দেখিয়া কালীর বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল,—কিন্তু উৎকৃষ্ট কুল হইলেই সর্ব্বদা সুখ হয় না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ধনগৌরবের পরিণাম।

আমরা একজন হতভাগিনীর কথা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে লিখিলাম, আর একজন হতভাগিনীব কথা এই পরিচ্ছেদে লিখিব। শোকের কথা আর লিখিতে ইচ্ছা করে না, কিন্তু যখন সংসারের কথা লিখিতে বসিয়াছি তখন শোকের কাহিনীই লিখিতে বসিয়াছি। শোক দুঃখের কথা না লিখিলে সংসারের চিত্রটী প্রকৃত হয় না। সংক্ষেপে সে কথাটি লিখিব।

কালীতারার স্বামীর পীড়ার সময় হেমচন্দ্র সর্ব্বদাই সেই বাড়ীতে থাকিতেন, সুতরাং বিন্দু বাড়ী থেকে বড় বাহির হইতে পারিতেন না। তাঁহাদের পাড়ার লোকে অনুগ্রহ করিয়া যেরূপ প্রবাদ রটাইয়াছিল তাহাতে তাঁহার বাড়ীব বাহিরে যাইতে বড ইচ্ছাও ছিল না। তবে উমাতারা কেমন আছে, জানিতে বড় উৎসুক ছিলেন। মধ্যে মধ্যে লোক পাঠাইতেন, লোকে যে খবর আনিত তাহাতে বিন্দুর বড় ভয় হইতে লাগিল। কয়েক দিন পরে তিনি পালকী করিয়া উমার বাড়ী গেলেন।

বিন্দু পথে মনে করিতেছিলেন তাঁহার জেঠাই মা তাঁহাকে কত তিরস্কার করিবেন, কিন্তু বাড়ী পঁহুছিয়া তাঁহার জেঠাই মাকে যে অবস্থায় দেখিলেন তাহাতে বিন্দুর চক্ষুতে জল আসিল। জেঠাই মার সে চিরপ্রফুল্ল মুখ খানি শুখাইয়া গিয়াছে, ভাসা ভাসা নয়ন দুটী বসিয়া গিয়াছে, কাক পক্ষের ন্যায় কৃষ্ণ কেশ গুলি স্থানে স্থানে শুক্ল হইয়াছে, সে স্থুল সুস্থ শরীর খানি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কন্যার সেবায় দিবারাত্রি জাগরণ করিয়া, কন্যার মানসিক কষ্টের জন্য দিবারাত্র রোদন ও চিন্তায় উমার মাতা অকালে বার্দ্ধক্যের লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বিন্দু আসিবা মাত্রই তাঁহার জেঠাই মা চক্ষুর জল ফেলিয়া বলিলেন

"আয় মা তোরা একে একে আয়, বাছা উমাকে একবার দেখ, যা করতে হয় কর, আমি আর পারি নি।"

উদ্বিগ্ন হৃদয়ে বিন্দু জেঠাই মার সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিলেন, উমাতারাকে দেখিবা মাত্র তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইল। মৃত্যুর ছায়া সেই রক্তশূন্য জ্যোতিঃশূন্য মুখমণ্ডলে পতিত হইয়াছে।

বিন্দুদিদিকে দেখিয়া রোগীর মুখখানি একবার একটু উজ্জ্বল হইল, বিন্দুর দিকে উমা হাত বাড়াইলেন, বিন্দু সেই হাতটি ধরিয়া বাল্য-সহচরী উমাতারার নিকট বসিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। মনে মনে ছেলে বেলার কথা উদয় হইতে লাগিল। অতি শৈশবে বিন্দু জেঠাই মার বাড়ী খেলা করিতে আসিত, উমার সঙ্গে কত খেলা করিত, উমা আপনার সন্দেশটী ভাঙ্গিয়া বিন্দুকে দিত, আপনার খেলনা হইতে বিন্দুকে একটী দিত। তাহার পর বিন্দুর পিতার মৃত্যু হইলে বিন্দু জেঠাই মার বাড়ীতে আশ্রয় পাইয়াছিল, তখনও উমার সঙ্গেই খেলা করিতে ভাল বাসিত, উমাও গরিবের মেয়ে বলিয়া বিন্দুকে তুচ্ছ করিত না।

তাহার পর উভয়ের বিবাহ হইল, উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গেলেন, কিন্তু বাল্যকালের প্রণয়টী ভুলিলেন না। যখন জেঠাই মার বাড়ীতে উমার সঙ্গে দেখা হইত তখনই কত আনন্দ। ছয় মাস পূর্ব্বে জেঠাই মার বাড়ীতে দুই জন কত আহ্লাদে দেখা করিয়াছিলেন, আজ সে আনন্দ কোথায়! উমার সেই জগতে অতুল সৌন্দর্য্য কোথায়? সেই সুন্দর ললাটে হীরকের সিঁতি কোথায়,—সে সুগোল বাহুতে হীরক খচিত বলয় কোথায়? সরলচিত্তা জেঠাই মার সেই মিষ্ট হাসি কোথায়? সেই একটু ধনগর্ব্ব, একটু সাংসারিক গর্ব্ব কোথায়? সে সংসার সুখ অতীতের গর্ভে লীন হইয়াছে,—সে সুখ উমাতারার অদৃষ্টাকাশে আর কখন, কখন, কখনই হইবে না। সে সুখ সাঙ্গ হইয়াছে, উমাতারার লীলা খেলাও সাঙ্গ প্রায়, ধন, যৌবন, অতুল সৌন্দর্য্য, অকালে লীন হইল।

অনেকক্ষণ পরে ক্ষীণ স্বরে উমা কহিলেন

"বিন্দুদিদি, অনেক দিনের পর তোমাকে দেখিলাম, তোমাকে একবার দেখিয়া প্রাণটা জুড়াইল।"

বিন্দু। "কালীতারার স্বামীর বড় পীড়া হইয়াছিল তাই আমরা বড় ব্যস্ত ছিলাম, উমা সেই জন্য তোমাকে দেখিতে আসিতে পারি নি।"

উমা। "ব্যারাম আরাম হইয়াছে ?"

বিন্দু ধীরে ধীরে বলিলেন "কালী বিধবা।"

উমা নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন ;—এক বিন্দু অশ্রুজল সেই শীর্ণ গণ্ডস্থল দিয়া গড়াইয়া পড়িল। ক্ষণেক পর বলিলেন,

"কালী এখন কোথায় ?"

বিন্দু। "শরতের বাড়ীতে আছে। কালীর মাও সেই খানে আছেন, তিনি কলিকাতায় আসিয়াছেন।"

উমা। "কালীকে বলিও, তাহার মন স্বস্থ হইলে একবার আসিয়া দেখা করে। মরিবার আগে তাকে একবার দেখতে বড় ইচ্ছে করে।"

বিন্দু। "ছি উমা, অমন কথা মুখে আন কেন ? তোমার উৎকট রোগ হয়েছে, তা ডাক্তার দেখ্‌ছে, ব্যারাম ভাল হবে এখন ; ছি, অমন ভাবনা মনে আনিও না।"

উমা। "ভাল হয়ে কি হবে ?"

বিন্দু। "ভাল হইয়া আবার সংসার করিবে। মানুষের কষ্ট কি আর চিরকাল থাকে ? আজ যে কষ্ট আছে, কাল তাহা থাকিবে না, সুখ দুঃখ সকলেরই কপালে বটে। ব্যারাম ভাল হইলে তুমি সুখী হইবে, পতিপুত্রবতী হইয়া সোণার সংসারে বিরাজ করিবে।

উমা কোনও উত্তর করিলেন না,—একটী ক্ষীণ হাসি সেই শীর্ণ ওষ্ঠ প্রান্তে দেখা গেল। ক্ষণেক যেন কি শব্দ শুনিতে লাগিলেন, পর বলিলেন "ঐ জানালা থেকে দেখ"।

বিন্দু ও বিন্দুর জেঠাই মা জানালার নিকট গিয়া দেখিতে লাগিলেন। জুড়ী আসিয়া ফাটকের নিকট দাঁড়াইল, ধনঞ্জয় বাবু গাড়ী হইতে নামিলেন। দ্বারদেশে একটী বৃদ্ধ দাঁড়াইয়াছিল তাহার সঙ্গে দুই জনে কি কথা কহিতে লাগিলেন। তিন জনে পরামর্শ করিতে২ উপরে গেলেন।

বিন্দু জিজ্ঞাসা করিলেন "জেঠাই মা ধনঞ্জয় বাবুর সঙ্গে ও বাবুটী কে ?"

বিন্দুর জেঠাই মা বলিলেন "ও গো ঐ ত আমার জামাইয়ের শনি।

ওঁর নাম সুমতি বাবু, কলকেতার যত বড় মানুষের কাছে গিয়ে পোড়ামুখো অমনি করে হেসেং কথা কয় গো, আর যত মন্দ রীত চরিত শেখায় আর টাকা ফাঁকি দেয়। জামাইয়ের কত টাকা ফাকি দিয়ে নিয়েছে ভগবানই জানেন। যম কি পোড়ামুখোকে ভুলে আছেন?"

বিন্দু। "আর ঐ বুড়ী টা কে, ঐ যে হাত নেড়েং হেসেং বাবুদের সঙ্গে কথা কইতেং উপরে গেল?"

জেঠাই মা। "কে জানে ও হতভাগা মাগীটা কে,—এই কয়েক দিন অবধি জোঁকের মত আমার জামাইয়ের সঙ্গে নেগে রয়েছে। কি কু চক্রে ঘুরচে, কে জানে?"

ক্ষীণ স্বরে উমা কহিলেন "মা, আমি জানি, তোমরাও শীঘ্র জানিবে।" রোগী পাশ ফিরিয়া শুইলেন ও নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। উমা একটু ঘুমাইয়াছে বিবেচনা করিয়া বিন্দু সে দিন বিদায় হইলেন।

সেই দিন অবধি বিন্দু প্রায় প্রত্যহ উমাকে দেখিতে আসিতেন, কিন্তু বিন্দুর স্নেহ, উমার মাতার যত্ন সমস্তই বৃথা হইল। রোগীর মনে সুখ নাই, আশা নাই, জীবনে আর রুচি নাই; তাহার কাশি অতিশয় বৃদ্ধি পাইল, তাহার সঙ্গেং আমাশাও বাড়িল; দুর্ব্বল ক্ষীণ উমা সমস্ত দিন প্রায় আর কথা কহিতে পারিত না। তখন চিকিৎসকগণও আরোগ্যের আশা ত্যাগ করিল, আজ যায় কাল যায়, সকলে এইরূপ বিবেচনা করিতে লাগিল।

শেষে বিন্দু কালীর বাড়ীতে খবর পাঠাইলেন ও কালীকে সঙ্গে করিয়া নিয়া উমাকে দেখিতে গেলেন।

হতভাগিনী বিধবা কালী দিদিকে দেখিয়া রোগীর চক্ষু হইতে ধারা বহিয়া জল পড়িতে লাগিল;—রোগী কথা কহিতে পারিলেন না। কালী ও উমার একটী হাত ধরিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন।

পীড়া বড় বাড়িল। সন্ধ্যার সময় নাড়ী অতিশয় ক্ষীণ, প্রায় পাওয়া যায় না। চিকিৎসক আসিয়া মুখ ভারি করিল, একটী নূতন ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন, বলিলেন "সমস্ত রাত্রি দুই ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে হইবে, প্রাতঃকালে আবার আসিব।"

উমার মাতা এ কয়েক দিন ক্রমাগত রাত্রি জাগরণ করিয়াছিলেন বিন্দু বলিলেন "জেঠাই মা আজ তুমি ঘুমাও, আজ আমি রাত্রিতে থাকিব, উমার কাছে আমিই বসিয়া আছি।"

কালীতারাও থাকিতে ইচ্ছা করিল।

রাত্রি ৯টা হইয়াছে, তখন বিন্দু একবার ঔষধ খাওয়াইলেন। উমা অতি ক্ষীণ স্বরে বলিলেন "আর কেন ঔষধ? আমি চলিলাম। যাইবার সময় তোমাদের মুখ দেখিয়া মরিলাম এই আমার পরম সুখ। বিন্দু দিদি, কালী দিদি, আমাকে মনে রাখিও।"

বিন্দু ও কালী রোগীর দুই হস্ত আপনাদিগের বক্ষে ধারণ করিলেন, নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন।

অর্দ্ধ ঘণ্টা পর উমা ক্ষীণ স্বরে বলিলেন "মা, মা।" উমার মাতা পাশেই শুইয়া ছিলেন, তাঁহার ঘুম হয় নাই। তিনি কন্যার আরও নিকটে আসিলেন। উমা দুই হাত তুলিয়া মার গলা ধরিলেন, কথা কহিতে পারিলেন না। তাঁহার শ্বাস প্রশ্বাস কষ্টে বহিতে লাগিল, হস্ত পদ হিম হইল, নখ গুলি নীল বর্ণ হইল, চক্ষু স্থির হইল, মাতৃ বক্ষে স্নেহময়ী উমার মৃত দেহ শান্তি প্রাপ্ত হইল।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় উমার মাতা ও বিন্দু ও কালীতারা পালকী করিয়া সে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। ফাটকের নিকট তাঁহারা দেখিলেন সেই সুমতি বাবু সেই বৃদ্ধার সঙ্গে, বাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া, নামিয়া আসিতেছেন। বিন্দু জিজ্ঞাসা করিলেন

"জেঠাই মা, ও বুড়ী কে তুমি এখন জেনেছ।"

জেঠাই মা কোনও উত্তর করিলেন না। দুই তিন বার বিন্দু জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন "ঐ বুড়ী মাগীর বনঝি, না কে একটা আছে, সে এই থিয়েটারে সীতা সাজে, সাবিত্রী সাজে, রাধিকা সাজে,—তার মুখে আগুন। সুমতি বাবু সেইটাকে ধনঞ্জয় বাবুর কাছে আনিয়াছিলেন, তার নাম করে ১০।১৫ হাজার টাকা বার করে নিয়েছেন, ভগবানই জানেন। বাছা উমা বেঁচে থাকিতে সেটাকে বাড়ী আনেন নি, এখন নাকি বাড়ীতে এনে রাখবেন, তার জন্য অনেক টাকা দিয়ে ঘর সাজান হয়েছে।"

*   *   *   *   *

ধনবান্ গুণবান্ রূপবান্ ধনঞ্জয় বাবু কলিকাতা সমাজের একটী শিরোরত্ন। সকল সভায় তাঁহার সমান আদর, সকল স্থানে তাঁহার গৌরব, সকল গৃহে তাঁহার খ্যাতি। তাঁহার অমাত্যেরা তাঁহার বদন্যতার সুখ্যাতি করেন, শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহার রুচির প্রশংসা করেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁহাকে হিঁদুয়ানীর জন্য পূজা করেন, কন্যাকর্ত্তাগণ (উমার মৃত্যুর পর) তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপনার্থে ঘন ঘন ঘটকী পাঠাইতেছে। রাজপুরুষেরা ধনাঢ্য বদান্য জমিদার পুত্রকে "রাজা" খেতাব দিবার সঙ্কল্প করিতেছেন।

সুবিজ্ঞ সুশিক্ষিত সুমতি বাবু শীঘ্র কলিকাতার এক জন অনরারি মেজিষ্ট্রেট হইবেন এইরূপ শুনা যায়। তিনি সাহেবদিগের সহিত সর্ব্বদাই দেখা সাক্ষাৎ করেন, এবার লেভিতে গিয়াছিলেন, ভদ্রাচরণ ও সুমার্জ্জিত কথা বার্ত্তা শ্রবণে তুষ্ট হইয়াছেন। সুমতি বাবুর গাড়ী ঘোড়া আছে, সুমার্জ্জিত বুদ্ধি আছে, ও মিষ্ট কথায় অসাধারণ ক্ষমতা আছে; তিনি সাহেব সুবোকে তুষ্ট রাখেন, বড় মানুষদের সর্ব্বদাই মন যোগান, উন্নতির পথে ক্রমশঃই উঠিতেছেন। তিনিও সমাজের একটী শিরোরত্ন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পরীক্ষা।

শরৎ বাবুর পরীক্ষা অতি নিকটে, তিনি সমস্ত দিনই পড়েন; বাড়ীর ভিতর বড় যান না। শরৎ পড়িয়া২ বড় কাহিল হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার মাতা ও ভগিনী তাঁহার অনেক যত্ন সুশ্রূষা করেন, শরতের খাওয়া দাওয়া দেখেন, যাতে শরৎ একটু ভাল থাকেন, একটু গায়ে সারেন সে বিষয়ে দিবা রাত্রি যত্ন করেন। কিন্তু শরতের চেহারা ফিরিল না, শরৎ বড় পরিশ্রম করেন, রাত্রি জাগিয়া একাকী পড়বার ঘরে গিয়া বসিয়া থাকেন, তিনি দিনং আরও বিবর্ণ ও দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন।

শরতের মাতা বলিলেন "বাছা, এত পড়ে পড়ে কি ব্যারাম করিবে? তোমার পরীক্ষা দিয়ে কাজ নেই, চল আমরা তালপুখুরে ফিরে যাই, তোমার বাপের বিষয় দেখিও, সচ্ছন্দে থাকিবে। কলিকাতার জল হাওয়া তোমার সহ্য হয় না।"

শরৎ বলিলেন "না মা, এই বয়সে লেখা পড়া ছেড়ে দেওয়া ভাল হয় না। পরীক্ষা নিকট, একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।"

কালীতারা পূর্ব্বেই বর্দ্ধমানে শরতের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন। মনে করিলেন বৌ ঘরে এলে শরতের মনে একটু স্ফূর্ত্তি হইবে, শরৎ একটু গায়ে সারিবে। সেই বিবাহের কথা এক দিন শরতের নিকট উত্থাপন করিলেন। শরৎ বলিলেন "দিদি পড়বার সময় ব্যস্ত কর কেন?"

বিন্দুর জেঠাই মা এখন বিন্দুদের বাসায় থাকেন, এখনও তালপুখুরে ফিরে যান নাই। তিনি সর্ব্বদাই শরতের মাতার সহিত দেখা করিতে আসিতেন, এবং সমস্ত দিন ধরিয়া কথা বার্ত্তা কহিতেন। তাঁহারা দুই জনে উমার কথা কহিতেন, কালীর কথা কহিতেন, আর মনের দুঃখে রোদন করিতেন। উমার মা বলিতেন "দিদি, তখন যদি লোকের কথা না শুনে আমরা একটু বুঝে সুঝে কাজ করিতাম তা হইলে আর আজ এমনটী হইত না। তুমি তখন বড় কুল দেখিয়া বামুন পুরুতের কথা শুনে কালীর বিয়ে দিলে, আমিও পড়সীর কথা শুনে বাছা উমার বড় মানুষের সঙ্গে বিয়ে দিলাম, তাই আজ এমন হইল। তা ভগবানের ইচ্ছা, এতে কি মানুষের হাত আছে, আমরা যা মনে করি সেইটী কি হয়? তা দিদি, আমার যা হয়েছে তা হয়েছে, তুমি শরৎকে একটু দেখিও, বাছা পড়ে২ বড় কাহিল হয়ে গেছে। শরৎকে মানুষ কর, সুখে সংসার করিতে পারে এইরূপে বে থা দাও, বৌ ঘরে নিয়ে এস, বৌয়ের মুখ দেখে শোক একটু ভুলিবে।"

শরতের মাতা বলিতেন "আমার ও তাই ইচ্ছে, বাছা যে কাহিল হয়ে গিয়েছে, আমার বড়ই ভাবনা হয়েছে। আমার ও বোধ হয় বে থা দিলে বাছা একটু গায়ে সারবে। তা শরৎ যে এখন বে করতে চায় না। তার উপর লোকে যে একটা নিন্দা রটিয়েছে, মনে হলে কষ্ট হয়।"

উমার মাতা। "ছি, ছি, সে কথা আর মুখে এন না। আমি তখন মেয়েকে

নিয়ে ব্যস্ত, কিছু দেখতে শুনতে পাইনি, তা না হলে কি আর এমন হয়। বাছা বিন্দু ছেলে মানুষ, হেম আর শরৎও ছেলে মানুষ, ওরা সব সে দিন-কার ছেলে, সে দিন ওদের হাতে করে মানুষ করেছি, ওদের কি এখনও তেমন বুদ্ধি সুদ্ধি হয়েছে, তা নয়। বুদ্ধি থাকলে কি আর এমন কাজ করে? তা যা হয়েছে হয়েছে, বিন্দু আর সে কথাটী মুখে আনে না; তা তাতে তোমার ছেলের যে আটকারে না। নিন্দে মেয়েদেরই। ভুগতে হবে, নিন্দে সইতে হবে, বিন্দুকে আর বাছা সুধাকে। আহা সে কচি মেয়ে, কিছু জানে না, সে দিন অবধি বেরাল নিয়ে খেলা করত, আর আঁকুসি দিয়ে পেয়রা পেড়ে খেত, তাকে ও এমন কলঙ্কে ডোবার। আহা বাছার শরীর খানি যেন খেংরা কাটী হয়ে গিয়েছে, মুখ খানি সাদা হয়ে গিয়েছে, চোক দুটী বসে গিয়েছে। দুদের ছেলে, এমন কলঙ্ক কি সে সইতে পারে? তা কপালে নিন্দে আছে, কে খণ্ডাবে বল?"

শরতের মা। "আহা বাছা সুধার কথা মনে হলে আমার বুক ফেটে যায়। কচি মেয়ে, ছেলে বেলায় বিধবা হয়েচে, আহা বাছার কপালে যে কি কষ্ট তা আমরাই বুঝি, সে দুদের ছেলে সে কি বুঝিবে? তার উপর আবার এই নিন্দে? যারা নিন্দে করে তাদের কি একটু মায়া দয়া নেই গো, একটু বিচার নেই? সুধা কি করেছিল? তার এতে কি দোষ বল? আর কাকেই বা দোষ দি? বাছা বিন্দুও ত মন্দ ভেবে এ কায করে নি; শরৎ সুধাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, কলকেতায় নাকি এমন বিয়ে কটা হয়ে গিয়েছে; বিন্দু ছেলে মানুষ, সে মনে ভাবলে এ বিয়ে হলেই বা। না হয় লোকে দুটা মন্দ বল্‌বে, শরৎ আর সুধা ত সুখে থাকবে। এই ভেবেই বিন্দু কাজটা করতে চেয়েছিল, সেও মন্দ ভেবে করে নি, আহা বিন্দুকে আমি ছেলে বেলা থেকে জানি, তার মত মেয়ে আমাদের গ্রামে নেই। তা বিন্দু আমাদের বাড়ী আসে না কেন? তা কে আসতে বলিও, তাকে দেখলেও প্রাণটা জুড়ায়।"

উমার মা। "আমি বলি গো বলি, তা সে সমস্ত দিনই কাজ কচ্চে তাই আসতে পারে না। বছা সুধা ত আর এখন কিছু কাজ করতে পারে না, তার যে শরীর হয়েছে, তাকে বড় কাজ করিতে দিই নে। আমি ও এই

শোকে পেয়ে উঠি নি, কুটনো কুটতে উমাকে মনে পড়ে, ভাত বাড়তে উমাকে মনে পড়ে, উঠতে দাঁড়াতে উমাকে মনে পড়ে। আহা বাছারে, এই বয়সে মাকে ফেলে কেমন কোরে গেলি?” উভয়ে অনেকক্ষণ রোদন করিতে লাগিলেন।

কালীতারা সেই সময়ে ঘরে আসিলেন। উমার মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

“হেঁ কালী, তোর ভাই অমন হয়ে যাচ্চে কেন? তুই একটু দেখিস বাছা, একটু খাবার দাবার যত্ন করিস, পড়ে পড়ে কি ব্যারাম করবে?”

কালী। “আমি যত্ন করিগো, কিন্তু সদাই পড়া শুনা করে; খাওয়া দাওয়ার তেমন মন নেই, তাই কাহিল হয়ে যাচ্চে।”

উমার মা। “বের কথা বলিছিলি?”

কালী। “একবার কেন, অনেকবার বলেছিলুম।”

উমার মা। “কি বলে?”

কালী। “সে কথায় কাণ দেয় না, কিম্বা বলে বিবাহে আমার রুচি নাই। অনেক জেদ করিয়া, মার নাম করিয়া বলিলে বলে, “মাকে বলিও, মা যদি নিতান্ত ইচ্ছা করিয়া থাকেন তবে আমি বিবাহ করিব, কিন্তু তাহাতে আমি সুখী হইব না।”

উমার মা। “ও সব ছেলেই অমন করে বলে গো, তার পর বৌকে পছন্দ হলেই মন ফিরে যায়। আমার বোধ হয় বিবাহ দেওয়াই কর্ত্তব্য।”

শরতের মা। “না দিদি, বাছা শরৎ আমার কাছে কখনও মনের কথা ঢেকে রাখে না। আমার ভয় করে, আমি জোর করে বিয়ে দিলে পাছে শরৎ অসুখী হয়। আমার কপাল ত অনেক দিনই ভেঙ্গেছে, বাছা কালীর উপর ও ভগবান্ নির্দ্দয় হইলেন, (রোদন।) কেবল শরৎ ই আমার ভরসা, শরৎ যদি অসুখী হয়, এ চক্ষে দেখিতে পারিব না।”

উমার মা। “বালাই, কেন গা বাছা শরৎ অসুখী হবে? তা এখন বে না করে নেই নেই, পরে বে করবে। এখন পড়া শুনায় মন দিয়েছে, না হয় পড়ুক না, সে ভালই ত।”

শরতের মা। “দিদি, পড়া শুনাও যে তেমন হচ্চে, আমার বোধ হয় না।

শরতের চিরকাল পড়া শুনায় মন আছে, সে জন্য সে এমন কাহিল হইয়া যায় না।"

উমার মা সে দিন বিদায় হইলেন। কালীতারা বলিলেন—"মা, তবে শরতের জন্য কি করিব? ডাক্তার দেখাব?

মাতা। "বাছা, মনের ভাবনায় ডাক্তার কি করিবে? চিকিৎসক সে রোগ চিকিৎসা করিতে জানে না।"

কালী। "তবে কি হবে? বিন্দু দিদির সঙ্গে এক দিন পরামর্শ করে দেখব? আমাদের যখন যা কষ্ট হইত, বিন্দু দিদিই আমাদের পরামর্শ দিতেন।"

মাতা। "বিন্দু এ বিষয়ে পরামর্শ দেবে না।"

কালী। "দেবে বৈ কি মা, আমি এক দিন বিন্দু দিদির বাড়ী যাব এখন।"

শীতকালে শরতের পরীক্ষা আসিল। শরতের সহাধ্যায়ীরা সকলেই বলিল পরীক্ষায় হয় শরৎ চন্দ্র না হয় তাহার এক জন সহাধ্যায়ী কার্ত্তিক চন্দ্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবে। এক মাস পর পরীক্ষার ফল জানা গেল, কার্ত্তিক চন্দ্র সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হইলেন, সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র দিগের মধ্যে শরতের নাম নাই!

তখন শরতের মাতা শরৎকে ডাকাইয়া বলিলেন "বাছা এত করে পড়ে শুনে হাড় কালী করেও ত পরীক্ষায় পারিলে না। এখন কি করিবে?"

শরৎ কিছু মাত্র উদ্বিগ্ন না হইয়া বলিলেন, "মা একবারে পারি নাই, আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখি না। পরীক্ষা বড় কঠিন, অনেকেই প্রথম বার উত্তীর্ণ হইতে পারে না।" শরৎ আর এক বৎসর পড়িলেন।

কালীতারা কয়েক দিন বিন্দু দিদির বাড়ী গেলেন, কিন্তু বিন্দু কোন পরামর্শ দিতে পারিলেন না, বলিলেন "তোমার মাকে বলিও জেঠাই মার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া শরৎ বাবুর জন্য যাহা ভাল হয় করিবেন। আমরা বন ছেলে মানুষ আমরা কি এ বিষয়ে কিছু পরামর্শ দিতে পারি!"

কালী এই কথা গুলি মাতাকে বলিলেন।

মাতা। "বাছা সুধাকে কেমন দেখিলে?"

কালী। "সুধা ভাল আছে। কিন্তু কলকেতায় এসে কি বদলে গেছে, এখন আর তাকে চেনা যায় না। সে এখন ডেঙ্গা মেয়ে হয়েছে, একটু কাহিল হয়ে গেছে, কিন্তু বেশ কাজ কর্ম্ম করচে। রংটাও সে ছেলে বেলার মত কাঁচা সোণার রং নেই, এখন কাল হয়ে গেছে, এখন আর সে তালপুখুরের সেই কচি মেয়েটীর মত নেই।"

বুদ্ধিমতী শরতের মাতা কোনও উত্তর করিলেন না। সমস্ত দিন আপনা আপনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, কয়েক দিন অবধি প্রায়ই একাকী বসিয়া ভাবিতেন। রাত্রিতে শয়ন করিতে যাইবার সময় মনেং বলিলেন—

"বাছা শরৎ, মাতার প্রতি যাহা কর্ত্তব্য তাহা তুমি করিয়াছ। ভগবান সহায় হউন, সন্তানের প্রতি যাহা কর্ত্তব্য তাহা আমি করিব।"

নবম পরিচ্ছেদ।

গুরুদেবের আদেশ।

পর দিন প্রাতঃকালে শরতের মাতা একখানি শিবিকা আরোহণ করিয়া ভবানীপুর হইতে উত্তর দিকে বড়শে বেহালা নামক গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। একটী ক্ষুদ্র কুটীরের সম্মুখে পালকী নামান হইল, শরতের মাতা পালকীর ভিতর রহিলেন, সঙ্গে ঝি ছিল সে কুটীরের ভিতর গেল।

ক্ষণেক পর সেই ঝির সঙ্গে এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার বয়স কত, ঠিক অনুভব করা যায় না; মস্তকে অল্পই কেশ আছে তাহা সমস্ত শুক্ল, শরীর গৌর বর্ণ ও স্থূল কিন্তু বলিপূর্ণ, মুখ খানি বার্দ্ধক্যের রেখায় অঙ্কিত কিন্তু প্রসন্ন। দুই কর্ণে দুইটী পুষ্প, ললাটে ও বক্ষে চন্দন রেখা, স্কন্ধদেশে উপবীত লম্বিত রহিয়াছে। শিবিকার নিকট আসিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন,

"মা, আজ কি মনে করে আমাকে সাক্ষাৎ দিতে এসেছ? এস ঘরে এস।"

শরতের মাতা বৃদ্ধের সঙ্গে ঘরের ভিতর গিয়া বসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,

"পিতা কুশলে আছেন,'

ব্রাহ্মণ। "হেঁ বাছা, ভগবানের ইচ্ছায় আমার শরীর সুস্থ আছে। বাছা, তোমার সমস্ত মঙ্গল?"

শরতের মাতা। "ভগবান্ জীবিত রাখিয়াছেন; কিন্তু মনের সুখলাভ করিতে পারি নাই। আমার কন্যা কালীতারা আজি কয়েক মাস বিধবা হইয়াছে।"

ব্রাহ্মণ নীরবে একটী অশ্রুবিন্দু ত্যাগ করিলেন, বলিলেন "মা, রোদন করিও না, ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহাই সাধিত হইবে। কে নিবারণ করিতে পারে?"

শরতের মাতা। "সে কথা সত্য। কিন্তু কালীর বিবাহের সময় আমি গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত অনুসারে কার্য্য করিয়াছিলাম। আপনি নিষেধ করিয়াছিলেন, আপনার কথা শুনিলে এ কষ্ট সহ্য করিতে হইত না, বাছা কালীকে এই বয়সে জলে ভাসাইতাম না। সেই সন্তাপ আমার মনে দিবানিশি জ্বলিতেছে।"

ব্রাহ্মণ। "আপনাকে দোষ দিবেন না। এ সমস্ত মনুষ্যের হাত নহে, এ সকল বিষয়ে আমাদের পরামর্শ অতি অকিঞ্চিৎকর। আমরা অনেক পরামর্শ করিয়া, অনেক চিন্তা করিয়া ভাল বুঝিয়াই কাজ করি, মুহূর্ত্তমধ্যে আমাদিগের কল্পনা ও চিন্তা বিফল হইয়া যায়, ভগবান্ আপনার অভীষ্ট অনুসারে কার্য্য করেন।"

শরতের মাতা। "তথাপি সৎপরামর্শ লইয়া করিলে পরে আক্ষেপ থাকে না। পিতা সেই জন্য অদ্য আপনার কাছে আর একটি বিষয়ে সৎপরামর্শ লইতে আসিয়াছি। একটী ক্রিয়া সম্বন্ধে আপনার মত লইতে আসিয়াছি।

ব্রাহ্মণ। "মা, তুমি জানই ত আমি ক্রিয়া কর্ম্মে যাওয়া অনেক বৎসর অবধি বন্ধ করিয়াছি, কোন শাস্ত্রীয় মতামত ও দিতে এখন সমর্থ নহি। আমা অপেক্ষা বিজ্ঞ অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কলিকাতায় ও নবদ্বীপে আছেন,

শাস্ত্র আলোচনা করাই তাঁহাদের ব্যবসা, ক্রিয়া অনুষ্ঠানে তাঁহারা সুদক্ষ, মতামত দিতেও তাঁহারা সুপারগ। আমি সে ব্যবসা অনেক দিন ছাড়িয়া দিয়াছি, কেবল পরকালের সুখের জন্য প্রত্যহ দেব অর্চ্চনা করি, মনের তুষ্টির জন্য একটু ইচ্ছানুসারে শাস্ত্রাদি পাঠ করি। সে অতি সামান্য।"

শরতের মাতা। "পিতা, যদি কেবল একটী ক্রিয়া সম্বন্ধে মত লইবার আবশ্যক হইত তাহা হইলে আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিতাম না, কিন্তু আপনারা আমার স্বামীদেবের বংশানুগত গুরুদেব; আপনি আমার শ্বশুর মহাশয়ের সুহৃদ্ ছিলেন, স্বামী মহাশয়ের গুরু ছিলেন। আমাদের বংশে একটু বিপদ আপদ হইলে আপনার নিকট পরামর্শ লইব না ত কার কাছে লইব? আপনি আমাদের সংসারের জন্য যে টুকু স্নেহ ও মমতা করিবেন, কে সেরূপ করিবে? আমাদের আর কে সহায় আছে?"

ব্রাহ্মণ। "মা রোদন করিও না, আমার যথাসাধ্য আমি তোমাদের জন্য করিব। কিন্তু বৃদ্ধের ক্ষমতা অল্প, বিদ্যাও অল্প।"

শরতের মাতা। "যাঁহারা অধিক বিদ্যার অভিমান করেন, তাঁহাদের পরামর্শ লইতে আমার রুচি হয় না। আপনার কতটুকু বিদ্যা তাহা আমাদের বঙ্গদেশে অবিদিত নাই, তা না হইলে এই ক্ষুদ্র পল্লিতে আপনার ক্ষুদ্র কুটীরে দূরদেশ হইতে বিদ্যার্থীগণ আসিত না। পিতা আপনার কথাই আমার পক্ষে বেদবাক্য।"

ব্রাহ্মণ। "মা, তোমার ভ্রম হইয়াছে, আমার শাস্ত্রজ্ঞান সামান্য। আমাদের শাস্ত্র সমুদ্রতুল্য, আমি গণ্ডুষমাত্র জল গ্রহণ করিয়াছি। সহৃদয় অধ্যায়ীদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে আমার বড় ভাল লাগে, তাহাদিগের জন্য আমার মনে একটু স্নেহ উদয় হয়, সেই জন্যই দুই এক জন আমার নিকট আসেন।"

শরতের মাতা। "পিতা, তবে সেই স্নেহটুকু পাইবার জন্যই আসিয়াছি, কন্যাকে স্নেহ করিয়া একটু পরামর্শ দিন।"

ব্রাহ্মণ। "মা, বল তোমার কি বলিবার আছে, আমি তোমার স্বামীর বংশ বহুকাল অবধি জানি, আমার সামান্য ক্ষমতায় যদি তোমাদের কোনও উপকার সাধন করিতে পারি, সাধ্যানুসারে তাহা করিব।"

শরতের মাতা ধীরে ধীরে কহিলেন,

"পিতা, আমার পুত্র শরতের সহিত একটী বালবিধবার বিবাহের কথা হইতেছে, সেই বিষয়ে আপনার মত, আপনার পরামর্শ. আপনার আশীর্ব্বাদ লইতে আসিয়াছি।"

গুরুদেব শরতের মাতাকে বাল্যকাল হইতে জানিতেন, তাঁহার হিন্দু-ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে প্রগাঢ়মতি জানিতেন, তাঁহার মুখে এই কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। বলিলেন

"মা, বিধবা বিবাহ আমাদিগের রীতি বিরুদ্ধ, প্রচলিত শাস্ত্র বিরুদ্ধ, প্রচলিত ধর্ম্ম বিরুদ্ধ তাহা কি তুমি জান না? এ ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সর্ব্বসম্মত মত, সকলেই আপনাকে এ কথা বলিতে পারিত, এটী জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আমার নিকট আসিয়াছ কি জন্য?"

শরতের মাতা। "ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সর্ব্বসম্মত মত জানিতে চাহি না, এই জন্য আপনার কাছে আসিয়াছি। আপনার মত, আপনার পরামর্শ, জানিতে ইচ্ছা করি এই জন্য আসিয়াছি। শ্রবণ করুণ, আমি নিবেদন করিতেছি।"

তখন শরতের মাতা আপন দুঃখের ইতিহাস আদ্যোপান্ত গুরুদেবের নিকট বিস্তারিত করিয়া বলিলেন। বিন্দুর মাতার কথা, বিন্দু ও হেমের কথা, হতভাগিনী সুধার কথা, তাহাদিগের কলিকাতায় আইসার কথা, শরৎ ও সুধার পবিত্র প্রণয়ের কথা, লোকের লজ্জাবহ অপযশের কথা, নিরাশ্রয় নির্দ্দোষ সুধার অখ্যাতি, অবমাননা, অসহ্য যাতনা ও শরীরের দুরাবস্থার কথা, চিরদুঃখিনী কালীতারার কথা, হতভাগিনী উমার কথা, সমস্ত সবিস্তারে বর্ণন করিলেন। তাহার পর শরতের পরীক্ষার কথা, তাহার শারীরিক দুর্ব্বলতার কথা, তাহার অসহ্য অনন্ত হৃদয়ের যাতনার কথা গুরুদেবকে জানাইলেন। পরে বলিলেন—

"গুরুদেব, আমাদিগের চারিদিকেই দুর্দ্দশা উপস্থিত, এ ঘোর বিপদে পিতার নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিতে আসিলাম। লোকের কথায় মত্ত হইয়া উমার মা উমাকে বড়মানুষের ঘরে বিবাহ দিলেন,—বাল্যকালেই সে উমা যাতনায় প্রাণত্যাগ করিল। গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কথা

শুনিয়া, আপনার সৎপরামর্শ তখন তুচ্ছ করিয়া, আমি বড় কুলে কালীর বিবাহ দিলাম, ভগবান্ সে পাপের শাস্তি আমাকে দিবেন না কেন? বাছা কালীর মুখের দিকে চাহিলে আমার বুক ফেটে যায়। সংসারে আমার আর কেহ নাই, জগতে আমার আর সুখ নাই; বাছা শরৎ ভিন্ন আমার অবলম্বন নাই; আর বাছা বিন্দু ও সুধা আছে। তারাও আমার পেটের ছেলের মত, তাদের অভাগিনী মা মরিবার সময় তাদের আমার হাতে সঁপিয়া দিয়াছিল। গুরুদেব! আপনিই এখন ইহাদের বন্ধু, আপনিই ইহাদিগের অভিভাবক, আপনি এগুলির ভার লউন, যাহা ভাল বিবেচনা করেন করুন;—এ অনাথা বিধবা আর এ ভার বহনে অক্ষম।"

এ কথাগুলি বলিয়া শরতের মাতা ঝর ঝর করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন, পিতৃতুল্য গুরুর নিকট দুঃখের কথা বলিয়া যেন সে ব্যথিত হৃদয় একটু শান্ত হইল।

শরতের মাতার কথা শুনিতে২ বৃদ্ধের চক্ষু অনেকবার অশ্রুতে পূর্ণ হইয়াছিল, এখন নিরাশ্রয় বিধবাকে রোদন করিতে দেখিয়া তাঁহারও নয়ন হইতে দুই শীর্ণ গণ্ডস্থল বহিয়া টস্ টস করিয়া জল পড়িতে লাগিল। বৃদ্ধ ক্ষণেক আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না।

ক্ষণেক পর বলিলেন "মা তোমার কথাগুলি শুনিয়া আমার মন বড় বিচলিত হইয়াছে। এখন কি জিজ্ঞাস্য আছে বল।"

শরতের মাতা। "পিতা, আমার এইমাত্র জিজ্ঞাস্য বিধবাবিবাহ মহাপাপ কি না।"

গুরুদেব। "বাছা, জগদীশ্বরই পাপ পুণ্য ঠিক নিরূপণ করিতে পারেন;—আমরা শাস্ত্রের কথা কিছু কিছু বলিতে পারি।"

শরতের মাতা। "তাহাই আগে বলুন। আমাদের সনাতন হিন্দু শাস্ত্রে কি এ কাজ একেবারে রহিত? লোক-নিন্দার কথা আমাকে বলিবেন না;—আমার অধিক দিন বাঁচিবার নাই, লোক-নিন্দায় আমার বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।"

গুরুদেব। "মা, শাস্ত্র একখানি নয়, সকলগুলি এক সময়ের নয়, সকলগুলিতে এক কথা লিখা নাই। যে সময়ে এই হিন্দু জাতির যেরূপ

আচার ব্যবহার ছিল তাহারই সার ভাগ, উৎকৃষ্ট ভাগটুকুই আমাদের শাস্ত্র।"

শরতের মাতা। "পিতা, আমি স্ত্রীলোক, আমি ও সমস্ত কথা ঠিক বুঝিতে পারি না। কিন্তু আমাদের সনাতন শাস্ত্রে বিধবাবিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ কি না, এই কথাটুকু বলুন"

গুরুদেব। "এখন ও প্রথা নিষিদ্ধ হইয়াছে, অতএব এখনকার শাস্ত্রে ও কার্য্যটী নিষিদ্ধ বৈ কি।"

শরতের মাতা। "পিতা এখনকার শাস্ত্র আর পুরাতন শাস্ত্র আমি জানি না,—আমি মূর্খ অবলা। আপনার পড়িতে কিছু বাকি নাই, যেগুলি আমাদের ধর্ম্মের মূল শাস্ত্র তাহার মর্ম্ম কি এ দরিদ্র অনাথাকে বুঝাইয়া বলুন, আমার মন বড় ব্যাকুল হইয়াছে। শুনিয়াছি কলিকাতার কোন কোন প্রধান পণ্ডিত বলেন যে শাস্ত্রে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ নহে; কিন্তু আপনার মুখে সে কথা না শুনিলে আমি তাহা বিশ্বাস করিব না। আপনার মতই আমার বেদবাক্য।

গুরুদেব অনেকক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষে ধীরে ধীরে কহিলেন—

"মা, তুমি যখন জিজ্ঞাসা করিতেছ আমি কিছুই লুকাইব না, আমার মনের কথা তোমাকে বলিব। তুমি যে পণ্ডিতের কথা বলিতেছ তিনি আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন, তাঁহার প্রগাঢ় শাস্ত্রবিদ্যা আমি জানি, তাঁহার প্রগাঢ় সত্যপ্রিয়তা আমি জানি। মা, এক দিন আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত বিধবাবিবাহ লইয়া অনেক আলোচনা করিয়াছিলাম, অনেক কলহ করিয়াছিলাম, তখন আমি শাস্ত্রবিদ্যাভিমানী ছিলাম। কিন্তু মা, বাল্যকাল হইতে সেই পণ্ডিতশ্রেষ্ঠকে আমি জানি, তিনি ভ্রান্ত নহেন, প্রবঞ্চকও নহেন, তাঁহার কথাটী প্রকৃত। বিধবাবিবাহ সনাতন হিন্দুশাস্ত্রে নিষিদ্ধ নহে। মা, আর কোনও কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না, আর কিছু আমি বলিতে পারিব না।"

শরতের মাতা। "পিতা, আপনার অনাথা কন্যাকে আর একটী কথা বলিতে আজ্ঞা করুন, জগদীশ্বর তজ্জন্য আপনার মঙ্গল করিবেন। আমি

শাস্ত্রের কথা আর জিজ্ঞাসা করিব না, সামাজিক রীতির কথাও জিজ্ঞাসা করিব না। আপনার বিশুদ্ধ জ্ঞানে যেটি বোধ হয় কন্যাকে সেইটী বলুন,—বিধবাবিবাহে পাপ আছে কি না বলুন, যিনি জগতের নিয়ন্তা তাঁহার চক্ষুতে এই বিধবাবিবাহ কার্য্য কি গর্হিত?"

গুরুদেব। "মা, যিনি জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত তিনিও এ কথার উত্তর দিতে অক্ষম, এ হীনবুদ্ধি কিরূপে ইহার উত্তর দিবে? জগদীশ্বরের অভিপ্রায় অণুমাত্রও জানিতে পারে, মনুষ্যের এরূপ ক্ষমতা নাই। তবে যিনি করুণাময়, তিনি বালবিধবাকে চিরবৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, এরূপ আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে অনুভব হয় না।"

দশম পরিচ্ছেদ।

পরিশিষ্ট।

বৈশাখ মাসে তালপুখুর গ্রামে আমরা প্রথমে হেমচন্দ্র ও তাঁহার পরিবারের সহিত আলাপ করিয়াছিলাম। তাহারা আমাদের এক বৎসর মাত্র পরিচিত হইলেও বড় স্নেহের পাত্র। পুনরায় বৈশাখ মাস আসিয়াছে, চল তাঁহাদের সেই তালপুখুর গ্রামের বাটীতে যাইয়া বিদায় লই।

হেমের কিছু হইল না, তাঁহার দারিদ্র ঘুচিল না! তিন বৎসর যাবৎ কলিকাতায় থাকিয়া পুনরায় চাষবাস দেখিবার জন্য ফিরিয়া আসিলেন। চন্দ্রনাথ বাবু তাঁহাকে হাইকোর্টে কোনও একটী কার্য্য দিবার জন্য বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। মার্জ্জিতবুদ্ধি যুবক মাত্রই এমন সুবিধা পাইলে আপনার বিশেষ উন্নতিসাধন করিতে পারিতেন। কিন্তু হেমের বুদ্ধিটা তত তীক্ষ্ণ নহে, বুদ্ধিটা কিছু পাড়াগেঁয়ে, সুতরাং তিনি সে কার্য্য না লইয়া পাড়াগাঁয়ে ফিরিয়া আসিলেন। শরৎ তাঁহাকে কলিকাতায় আর কয়েকমাস

থাকিতে অনেক যেদ করিয়াছিলেন ;—হেম বলিলেন “না শরৎ কলিকাতা নগরী যথেষ্ট দেখিয়াছি, আর দেখিতে বড় রুচি নাই।”

বিন্দু পূর্ব্ববৎ কচিআঁবের অম্বল রাঁধিতে তৎপর, এবং এক্ষণে সে রন্ধন কার্য্যের একটী সুবিধাও হইয়াছিল। বিন্দুর জেঠাইমার উমা ভিন্ন আর সন্তানাদি ছিল না, উমার মৃত্যুর পর তাঁহার জীবনে বিশেষ সুখ না; ছিল তিনি প্রায়ই দুই প্রহরের সময় বিন্দুর বাটীতে আসিতেন। বিন্দুর বাড়ীর রকেতে তিনি পা মেলাইয়া বসিতেন, বিন্দুর ছেলে গুলিকে লইয়া খেলা করিতেন, অথবা সনাতনের গৃহিণীর সহিত বসিয়া বসিয়া গল্প করিতেন, সেও বিন্দুর জেঠাইমার চুলের সেবা করিত। আর বিন্দু, (আমাদের লিখিতে লজ্জা হইতেছে) সমস্ত দুই প্রহর বেলা নাউসাগ কাটিত, সজনে খাড়া পাড়িত অথবা আঁকসি দিয়া কচি আঁব পাড়িত। জেঠাইমা বলিতেন, বিন্দু মেয়েটী ভাল বটে, কিন্তু বুদ্ধিসুদ্ধি কখনও পাকিল না।

তারিণী বাবুর একমাত্র কন্যা মরিয়াছে তাহাতে তিনি একটু শোক পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বিষয়ী লোক শীঘ্রই সে শোক ভুলিলেন। তাঁহার কার্য্যেও বিশেষ উৎসাহ ছিল, বিশেষ বর্দ্ধমান কালেক্টরির সেরেস্তাদারি খালি হইবার সম্ভাবনা আছে, সুতরাং উৎসাহী তারিণীবাবুর জীবন উদ্দেশ্যশূন্য নহে।

শরতের মাতা সাশ্রুনয়নে বধূ সুধাকে ঘরে আনিয়া বৃদ্ধ বয়সে শান্তিলাভ করিলেন। বিবাহটা কলিকাতায়ই হইয়াছিল, কেহ বিবাহে আসিলেন, কেহ বা আসিলেন না। কিন্তু কাজটা তজ্জন্য বন্ধ রহিল না। যাঁহারা কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন তাঁহারাও বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলেন না। শান্ত প্রকৃতি দেবীপ্রসন্ন বাবু একবার আসিবেন আসিবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু একবার বাড়ীর ভিতরে সে কথাটা উত্থাপন করায় বিশেষ হিতকর উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন, তাহার পর আর আসিবার কথাও কহিলেন না। পাড়ার দলপতি সমাজপতি ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ একটা খুব হুলস্থুল করিলেন, খুব গণ্ডগোল করিলেন, কাজটা বাধা দিবারও বিশেষ চেষ্টা করিলেন,—কিন্তু সে কাল গিয়াছে,—সেরূপ বাধা দেওয়ায় এক্ষণে লোকের গুণাগুণ প্রকাশ পায়, কাজ বন্ধ থাকে না। চন্দ্রনাথ সমস্ত ভবানীপুরের

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত সেই বিবাহে নিমন্ত্রণ খাইতে আসিলেন, কলিকাতার অনেক ভদ্রলোক তথায় আসিলেন; আনন্দের সহিত সে শুভকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। পাড়ার সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বিবাহ সমাজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দলের কোন কোন পণ্ডিত আসিবেন বলিয়া সে দিকে বড় ঘেঁষিলেন না; পাড়ার দেশহিতৈষী আর্য্য-সন্তানগণ, যাঁহারা এই অনার্য্য কার্য্যে বাধা দিবার জন্য ঢিল ছুড়িতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা একজন অনার্য্য পুলিসের সার্জ্জনের বিকৃত মুখ দেখিয়া অচিরে (ঢিল পকেটেই রাখিয়া) তথা হইতে অদৃশ্য হইলেন।

শরৎ ও হেম পল্লীগ্রামে আসিলে গ্রামস্থ লোকে প্রথমে তাঁহাদের সহিত আহার বাবহার করিলেন না। কিন্তু তারিণী বাবুর স্ত্রীর অনেক অনুরোধে তারিণী বাবু শেষে সকলকে ডাকাইয়া একটা মীমাংসা করিয়া দিলেন। মীমাংসা হইল যে শরৎ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। কিন্তু শরৎ কলেজের ছেলে—বলিলেন "আমি যে কার্য্যটী করিয়াছি তাহা পাপ বলিয়া মনে করি না, ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিব না।" শেষে শরতের মাতা একদিন ব্রাহ্মণ খাওয়াইয়া দিলেন, তাহাতেই সব মিটে গেল। তারিণী বাবু কিছু রসিক লোক ছিলেন, হাসিয়া শরৎ বাবুকে বলিলেন "ওহে বাবু তোমরা বুঝ না, বৃষ্টির জল যে দিক দিয়েই যাক শেষকালে গিয়া খানায় পড়বেই পড়বে। তোমরা বিধবাই বে কর আর ঘরের বৌকেই বার করে নিয়ে যাও, বামুনদের পেটে কিছু পড়লেই সব চুকে যায়। এই আমাদের সমাজ হয়েছে, তা তোমরা আপত্তি করিলেই কি হবে?" শরৎ উত্তর করিলেন "এইরূপ সমাজ হইয়াছে বলিয়াই সংস্কার অবশ্যম্ভাবী, ন্যায় অন্যায়ের একটু বিচার না থাকিলে সে সমাজও থাকে না।"

সনাতনের স্ত্রী অনেকদিন বাড়ীতে বসে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদিত। বলিত "আমি তখনই বলেছিনু গো কলকেতায় যেও না, কলকেতায় গেলে জাত ধর্ম্ম থাকে না। ও মা সোণার সংসার কি হলো গা? আহা আমার সুধাদিদি, আমার চিনিপাতা দৈ খেতে বড় ভাল বাসিত গো, ও মা তার মনে এত ছিল কে জানে বল? ও মা তখনই বলেছিনু গো, কলেজের ছেলে যেন্ত মানুষের গলায় ছুরি দেয়; ওমা তাই কল্লে গা?" ইত্যাদি ইত্যাদি।

সনাতনের গৃহিণী মনে মনে সুধাকে অনেক তিরস্কার করিত, কিন্তু মায়া কাটাতে পারলে না, আবার লুকাইয়া লুকাইয়া চিনিপাতা দৈ শরৎ বাবুর বাড়ী লইয়া যাইত। ক্রমে উভয় পক্ষের মধ্যে পূর্ব্ববৎ সদ্ভাব স্থাপিত হইল।

শরতের মাতা পূর্ব্ববৎ ধর্ম্ম কর্ম্মে সমস্ত দিন মন দিতেন, সংসারের কিছু দেখিতেন না! কালীতারা সংসারের গৃহিণী, এত দিন পর জীবনের শান্তি কাহাকে বলে তিনি জানিতে পারিলেন। তিনি ভাঁড়ার রাখিতেন, রন্ধনাদি করিতেন, সমস্ত গৃহটী পরিপাটী রাখিতেন, সংসার চালাইতেন। সুধা শরতের মাতাকে ভক্তিভাবে পূজা করিত, কালী দিদিকে স্নেহ করিত, কালীদিদি যাহা বলিত তাহা করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিত। ঘর ঝাঁট দিত, উঠান ঝাঁট দিত, পুখুর হইতে জল আনিত, বাটনা বাটিত, কুটনো কুটিত, দুদ জাল দিত, আর পুখুরে গিয়ে বাসন মাজিতে বড় ভাল বাসিত। পুখুরধারে আঁব গাছ ছিল, কাঁঠাল গাছ ছিল, অন্যান্য ফলের গাছ ছিল, সুধা সেই খানেও ঘুরিত, যে ফলটী পাকিত, কালীদিদির কাছে আনিয়া দিত।

এক দিন সন্ধ্যার সময় সুধা সেই গাছগুলির মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে, কি একটা মনে ভাবিতেছে এমন সময়ে শরৎ পশ্চাৎ হইতে আসিয়া বলিল "কি ভাবিতেছ।"

সুধা একটু লজ্জিত হইয়া মুখ ঢাকিরা বলিল "বলবো না।"

শরৎ "হেঁ বলবে বৈ কি, বল না।"

শরৎ ধীরে ধীরে সেই কুসুম-স্তবকতুল্য দেহখানি হৃদয়ে ধারণ করিয়া সেই লজ্জাবনতমুখীর প্রস্ফুটিত ওষ্ঠদ্বয়ে গাঢ় চুম্বন করিলেন। সে স্পর্শে সুধার সর্ব্ব শরীর কন্টকিত হইল। লজ্জায় অভিভূত হইয়া সুধা বলিল

"ছি! ছেড়ে দাও।"

শরৎ ছাড়িয়া দিলেন, বলিলেন "তবে বল।"

সুধা একটু হাসিয়া বলিল, "ছেলে বেলায় তোমাদের বাড়ীতে আসিতাম, হখন এই পেয়ারা গাছের পেয়ারা তুমি আমাকে পাড়িয়া দিতে তাই মনে করিতেছিলাম।"

শরৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "সেই আমাদের প্রথম প্রণয় এখনও

ভুলিতে পারি নাই?" আমাদের লিখিতে লজ্জা বোধ হইতেছে শরৎ গাছে চড়িলেন, সুধা নীচে পেয়ারা কুড়াইতে লাগিল। এমন সময় ঘাটের নিকট একটা শব্দ হইল, কালীদিদি ঘাটে আসিতেছেন। সুধা লজ্জিতা ও ভীতা হইল, এবার শরৎ বাবু কোন পথ দিয়া পলাইবেন? কিন্তু সুধা স্বামীর সমস্ত ক্ষমতা ও গুণ জানিতেন না, শরৎ সেই গাছ থেকে এক লাফে বেড়া ডিঙ্গিয়ে গিয়ে পড়িলেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য হইলেন।

শরৎ সে বৎসর সম্মানের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, তিনি লেখা পড়াও বিলক্ষণ শিখিলেন; কিন্তু বিন্দু দিদি আক্ষেপ করিতেন, তাঁর গাছে চড়া অভ্যাসটা গেল না।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

গ্রন্থ সমাপ্ত।

সীতারাম।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

সীতারাম, তখন সিপাহীদিগকে দুর্গ প্রাকারস্থিত তোপ সকলের নিকট, এবং অন্যান্য উপযুক্ত স্থানে অবস্থিত করিয়া, এবং মৃণ্ময়ের সম্বন্ধে সম্বাদ জানিবার জন্য লোক পাঠাইয়া, স্বয়ং স্নানাহ্নিকে গমন করিলেন। স্নানাহ্নিকের পর, চন্দ্রচূড় ঠাকুরের সঙ্গে নিভৃতে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রচূড় বলিলেন,

"মহারাজ! আপনি কখন আসিয়াছেন, আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই। একাই বা কেন আসিলেন? আপনার অনুচর বর্গই বা কোথায়? পথে কোন বিপদ ঘটে নাই ত?"

সীতা। সঙ্গীদিগকে পথে রাখিয়া আমি একা আগে আসিয়াছি। আমার অবর্ত্তমানে নগরের কিরূপ অবস্থা, তাহা জানিবার জন্য ছদ্মবেশে একা রাত্রিকালে আসিয়াছিলাম। দেখিলাম, নগর সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত। কেন, তাহা এখন কতক কতক বুঝিয়াছি। পরে দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিতে গিয়া, দেখিলাম ফটক বন্ধ। দুর্গে প্রবেশ না করিয়া, প্রভাত নিকট দেখিয়া তীরে গিয়া দেখিলাম, মুসলমান সেনা নৌকায় পার হইতেছে। দুর্গ রক্ষকেরা রক্ষার কোন উদ্যোগই করিতেছেনা, দেখিয়া আপনার যাহা সাধ্য তাহা করিলাম।

চন্দ্র। যাহা করিয়াছেন, তাহা আপনারই সাধ্য, অপরের নহে। এত গোলা বারুদ পাইলেন কোথা?

সীতা। এক দেবী সহায় হইয়া আমাকে গোলা বারুদ, এবং গোলন্দাজ সিপাহিগণকে আনিয়া দিয়াছিলেন।

চন্দ্র। দেবী? আমিও তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলেম। তিনি এই পুরীর রাজলক্ষ্মী। তিনি কোথায় গেলেন?

সীতা। তিনি আমাকে গোলা বারুদ এবং গোলন্দাজ দিয়া অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন। এক্ষণে এ কয় মাসের সম্বাদ আমাকে বলুন।

তখন চন্দ্রচূড় সকল বৃত্তান্ত, যতদূর তিনি জানিতেন, আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন। শেষে বলিলেন,

"এক্ষণে যে জন্য দিল্লী গিয়াছিলেন, তাহার সুসিদ্ধির সম্বাদ বলুন।"

সীতা। কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে। বাদশাহের আমি কোন উপকার করিতে পারিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া দ্বাদশ ভৌমিকের উপর আধিপত্য প্রদান করিয়া মহারাজাধিরাজ নাম দিয়া সনন্দ দিয়াছেন। এক্ষণে বড় দুর্ভাগ্যের বিষয় যে ফৌজদারের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। কেন না ফৌজদার, সুবাদারের অধীন, এবং সুবাদার বাদশাহের অধীন। অতএব ফৌজদারের সঙ্গে বিরোধ করিলে, বাদ-শাহের সঙ্গেই বিরোধ করা হইল। যিনি আমাকে এতদূর অনুগৃহীত করিয়াছেন, তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা নিতান্ত কৃতঘ্নের কাজ। আত্ম-রক্ষা সকলেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য ভিন্ন ফৌজদারের সঙ্গে

যুদ্ধ করা আমার অকর্ত্তব্য। অতএব এ বিরোধ আমার বড় দুরদৃষ্ট বিবেচনা করি।

চন্দ্র। ইহা আমাদিগের শুভাদৃষ্ট—হিন্দুমাত্রেরই শুভাদৃষ্ট; কেন না আপনি মুসলমানের প্রতি সম্প্রীত হইলে, মুসলমান হইতে হিন্দুকে রক্ষা করিবে কে? হিন্দুধর্ম্ম আর দাঁড়াইবে কোথায়? ইহা আপনারও শুভাদৃষ্ট, কেননা যে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিবে, সেই মনুষ্য মধ্যে কৃতী ও সৌভাগ্যশালী।

সীতা। মৃণ্ময়ের সম্বাদ না পাইলে, কি কর্ত্তব্য কিছুই বলা যায় না।

সন্ধ্যার পর মৃণ্ময়ের সম্বাদ আসিল। পীর বকশ খাঁ নামে ফৌজদারী সেনাপতি অর্দ্ধেক ফৌজদারী সৈন্য লইয়া আসিতেছিলেন, অর্দ্ধেক পথে মৃণ্ময়ের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ ও যুদ্ধ হয়। মৃণ্ময়ের অসাধারণ সাহস ও কৌশলে তিনি সসৈন্যে পরাজিত ও নিহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে শয়ন করেন। বিজয়ী মৃণ্ময় সসৈন্যে ফিরিয়া আসিতেছেন।

শুনিয়া চন্দ্রচূড়, সীতারামকে বলিলেন, মহারাজ! আর দেখেন কি? এই সময়ে বিজয়ী সেনা লইয়া নদী পার হইয়া গিয়া ভূষণা দখল করুন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

জয়ন্তী বলিল, "শ্রী! আর দেখ কি? এক্ষণে স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর।"

শ্রী। সেইজন্য কি আসিয়াছি!

জয়ন্তী। তোমাকে পাইলে তিনি যতদূর সুখী হইবেন, এত আর কিছুতেই না। তবে, তাঁহাকে তুমি সুখী না করিবে কেন?

শ্রী। তুমি ত আমাকে শিখাইয়াছ যে ইন্দ্রিয়াদির নিরোধই যোগ।

জয়ন্তী। ইন্দ্রিয় সকলের আত্মবশ্যতাই যোগ। তাহা কি তুমি লাভ করিতে পার নাই?

শ্রী। আমার কথা হইতেছে না।

জয়ন্তী। যাঁহার কথা হইতেছে, তাঁহাকে তুমি এই পথে আনিতে পারিবে। সেইজন্যই সাক্ষাতের বিশেষ প্রয়োজন। যত প্রকার মনুষ্য আছে, রাজর্ষিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রাজাকে রাজর্ষি কর না কেন।

শ্রী। আমার কি সাধ্য?

জয়ন্তী। আমি বুঝি, যে তোমা হইতেই এই মহৎ কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। অতএব যাও, শীঘ্র গিয়া রাজা সীতারামকে প্রণাম কর।

শ্রী। জয়ন্তি! সোলা জলে ভাসে বটে, কিন্তু খাটো দড়িতে পাথরে বাঁধিয়া দিলে সোলাও ডুবিয়া যায়। আবার কি ডুবিয়া মরিব?

জয়ন্তী। কৌশল জানিলে মরিতে হয় না। ডুবুরিয়া সমুদ্রে ডুব দেয়—কিন্তু মরে না, রত্ন তুলিয়া আনে।

শ্রী। আমার সে সাধ্য আছে, আমার এমন ভরসা হইতেছে না। অতএব এক্ষণে আমি রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব না। কিছুদিন না হয় এইখানে থাকিয়া আপনার মন বুঝিয়া দেখি। যদি দেখি, আমার চিত্ত এখন অবশ, তবে সাক্ষাৎ না করিয়াই এ দেশ ত্যাগ করিয়া যাইব স্থির করিয়াছি।

জয়ন্তী। আমি যে রাজার কাছে প্রতিশ্রুত আছি, যে তোমাকে দেখাইব।

শ্রী। কিছুদিন এইখানে থাকিয়া বিচার করিয়া দেখা যাক্, দুই দিক বজায় রাখা যায় কি না।

অতএব শ্রী, রাজাকে সহসা দর্শন দিল না।

কৃষ্ণচরিত্র।

তার পর শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্মকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের যেরূপ ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে—এখানেও ঠিক সেইরূপ। এইরূপ মহাভারতে ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া

যায়, যে গীতোক্ত ধর্ম্ম, এবং মহাভারতের অন্যত্র কথিত কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম এক। অতএব গীতোক্ত ধর্ম্ম যে কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম, সে ধর্ম্ম যে কেবল কৃষ্ণের নামে পরিচিত এমন নহে—যথার্থই কৃষ্ণপ্রণীত ধর্ম্ম, ইহা এক প্রকার সিদ্ধ। কৃষ্ণ সঞ্জয়কে আরও অনেক কথা বলিলেন। দুই একটা কথা তাহার উদ্ধৃত করিব।

ইউরোপীয়দিগের বিবেচনায় পররাজ্যাপহরণ অপেক্ষা গৌরবের কর্ম্ম কিছুই নাই। উহার নাম "Conquest," "Glory" "Extension of Empire" ইত্যাদি ইত্যাদি। যেমন ইংরাজিতে, ইউরোপীয় অন্যান্য ভাষাতেও ঠিক সেইরূপ পররাজ্যাপহরণের গুণানুবাদ। শুধু এক "Gloire" শব্দের মোহে মুগ্ধ হইয়া প্রুষিয়ার দ্বিতীয় ফেড্রীক তিনবার ইউরোপে সমরানল জ্বালিয়া লক্ষ লক্ষ মনুষ্যের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছিলেন। ঈদৃশ রুধিরপিপাসু রাক্ষস ভিন্ন অন্য ব্যক্তির সহজেই ইহা বোধ হয়, যে এইরূপ "Gloire" ও তস্করতাতে প্রভেদ আর কিছুই নাই—কেবল পররাজ্যাপহারক বড় চোর, অন্য চোর, ছোট চোর।* কিন্তু এ কথাটা বলা বড় দায়, কেননা দিগ্বিজয়ের এমনই একটা মোহ আছে, যে আর্য্য ক্ষত্রিয়েরাও মুগ্ধ হইয়া অনেক সময়ে ধর্ম্মাধর্ম্ম ভুলিয়া যাইতেন। Diogenes মহাবীর আলেকজণ্ডরকে বলিয়াছিলেন, "তুমি একজন বড় দস্যু মাত্র।" ভারতবর্ষেও শ্রীকৃষ্ণ পররাজ্যলোলুপ রাজাদিগকে তাই বলিয়াছেন,—তাঁহার মতে ছোট চোর লুকাইয়া চুরি করে, বড় চোর প্রকাশ্যে চুরি করে। তিনি বলিতেছেন,

"তস্কর দৃশ্য বা অদৃশ্য হইয়া হঠাৎ যে সর্ব্বস্ব অপহরণ করে, উভয়ই নিন্দনীয়। সুতরাং দুর্য্যোধনের কার্য্যও এক প্রকার তস্কর-কার্য্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে।"

এই তস্করদিগের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষা করাকে কৃষ্ণ পরম ধর্ম্ম বিবেচনা করেন। আধুনিক নীতিজ্ঞদিগেরও সেই মত। ছোট চোরের

---

* তবে যেখানে কেবল পরোপকারার্থ পরের রাজ্য হস্তগত করা যায়, সেখানে নাকি ভিন্ন কথা হইতে পারে। সেরূপ কার্য্যের বিচারে আমি সক্ষম নহি—কেননা রাজনীতিজ্ঞ নহি।

হাত হইতে নিজস্ব রক্ষার ইংরেজির নাম Justice ; বড় চোরের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষার নাম Patriotism ; উভয়েরই দেশীয় নাম স্বধর্ম্মপালন। কৃষ্ণ বলিতেছেন,

"এই বিষয়ের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাও শ্লাঘনীয়। তথাপি পৈতৃক রাজ্যের পুনরুদ্ধারণে বিমুখ হওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে।

কৃষ্ণ সঞ্জয়ের ধর্ম্মের ভণ্ডামি শুনিয়া সঞ্জয়কে কিছু সঙ্গত তিরস্কারও করিলেন। বলিলেন, "তুমি এক্ষণে রাজা যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছ, কিন্তু তৎকালে (যখন দুঃশাসন সভামধ্যে দ্রৌপদীর উপর অশ্রাব্য অত্যাচার করে) সভামধ্যে দুঃশাসনকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান কর নাই।" কৃষ্ণ সচরাচর প্রিয়বাদী, কিন্তু যথার্থ দোষকীর্ত্তনকালে বড় স্পষ্টবক্তা। সত্যই সর্ব্বকালে তাঁহার নিকট প্রিয়।

সঞ্জয়কে তিরস্কার করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ করিলেন, যে উভয় পক্ষের হিত সাধনার্থ স্বয়ং হস্তিনা নগরে গমন করিবেন। বলিলেন, "যাহাতে পাণ্ডবগণের অর্থহানি না হয়, এবং কৌরবেরাও সন্ধি সংস্থাপনে সম্মত হন, এক্ষণে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিতে হইবে। তাহা হইলে, সুমহৎ পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, এবং কৌরবগণও মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন।"

লোকের হিতার্থ, অসংখ্য মনুষ্যের প্রাণ রক্ষার্থ, কৌরবেরও রক্ষার্থ, কৃষ্ণ এই দুষ্কর কর্ম্মে স্বয়ং উপযাচক হইয়া প্রবৃত্ত হইলেন। মনুষ্য শক্তিতে দুষ্কর কর্ম্ম, কেননা এক্ষণে পাণ্ডবেরা তাঁহাকে বরণ করিয়াছে; এজন্য কৌরবেরা তাঁহার সঙ্গে শত্রুবৎ ব্যবহার করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু লোকহিতার্থ তিনি নিরস্ত্র হইয়া শত্রুপুরীমধ্যে প্রবেশ করাই শ্রেয় বিবেচনা করিলেন।

এইখানে সঞ্জয়যান পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত। সঞ্জয়যান পর্ব্বাধ্যায়ের শেষ ভাগে দেখা যায় যে কৃষ্ণ হস্তিনা যাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন, এবং বাস্তবিক তাহার পরেই তিনি হস্তিনায় গমন করিলেন বটে। কিন্তু সঞ্জয়যান পর্ব্বাধ্যায় ও ভগবদ্‌যান পর্ব্বাধ্যায়ের মধ্যে আর তিনটি পর্ব্বাধ্যায় আছে; "প্রজাগর" "সনৎসুজাত" এবং "যানসন্ধি।" প্রথম দুইটি প্রক্ষিপ্ত তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ

নাই। উহাতে মহাভারতের কথাও কিছুই নাই—অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম ও নীতি কথা আছে। কৃষ্ণের কোন কথাই নাই, সুতরাং ঐ দুই পর্ব্বাধ্যায় আমাদের কোন প্রয়োজন নাই।

যানসন্ধি পর্ব্বাধ্যায়ে সঞ্জয় হস্তিনায় ফিরিয়া আসিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে যাহা যাহা বলিলেন, এবং তচ্ছ্রবণে ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন এবং অন্যান্য কৌরবগণে যে বাদানুবাদ হইল, তাহাই কথিত আছে। বক্তৃতা সকল অতি দীর্ঘ, পুনরুক্তির অত্যন্ত বাহুল্যবিশিষ্ট এবং অনেক সময়ে নিষ্প্রয়োজনীয়। ইহার কিয়দংশ মৌলিক সন্দেহ নাই, সকলই যে মৌলিক, এমন বোধ হয় না। কৃষ্ণের প্রসঙ্গ, ইহার দুই স্থানে আছে।

প্রথম, অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে। ধৃতরাষ্ট্র অতিবিস্তারে অর্জ্জুনবাক্য সঞ্জয় মুখে শুনিয়া, আবার হঠাৎ সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "বাসুদেব ও ধনঞ্জয় যাহা কহিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছি, অতএব তাহাই কীর্ত্তন কর।"

তদুত্তরে, সঞ্জয়, সভাতলে যে সকল কথাবার্ত্তা হইল, তাহার কিছুই না বলিয়া, এক আষাঢ়ে গল্প আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, যে তিনি পাটিপি পাটিপি—অর্থাৎ চোরের মত, পাণ্ডবদিগের অন্তঃপুরমধ্যে অভিমন্যু প্রভৃতিরও অগম্য স্থানে গমন করিয়া কৃষ্ণার্জ্জুনের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। দেখেন কৃষ্ণার্জ্জুন মদ খাইয়া উন্মত্ত। অর্জ্জুন, দ্রৌপদী ও সত্যভামার পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া আছেন। কথাবার্ত্তা নূতন কিছুই হইল না। কৃষ্ণ কেবল কিছু দম্ভের কথা বলিলেন,—বলিলেন "আমি যখন সহায় তখন অর্জ্জুন সকলকে মারিয়া ফেলিবে।"

তার পর অর্জ্জুন কি বলিলেন, সে কথা এখানে আর কিছু নাই, অথচ ধৃতরাষ্ট্র, তাহা শুনিতে চাহিয়াছিলেন। অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের শেষে আছে "অনন্তর মহাবীর কিরীটি তাঁহার (কৃষ্ণের) বাক্য সকল শুনিয়া লোমহর্ষণ বচন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন" এই কথায় পাঠকের এমন মনে হইবে, যে বুঝি উনষষ্টিতম অধ্যায়ে অর্জ্জুন যাহা বলিলেন, তাহাই কথিত হইতেছে। সে দিগ দিয়া উনষষ্টিতম অধ্যায় যায় নাই। উনষষ্টিতম অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে কিছু অনুযোগ করিয়া সন্ধি স্থাপন করিতে

বলিলেন। ষষ্টিতম অধ্যায়ে দুর্য্যোধন প্রত্যুত্তরে বাপকে কিছু কড়া কড়া শুনাইয়া দিল। একষষ্টিতম অধ্যায়ে কর্ণ আসিয়া মাঝে পড়িয়া কিছু বক্তৃতা করিলেন। ভীষ্ম তাঁহাকে উত্তম মধ্যম রকম শুনাইলেন। কর্ণে ভীষ্মে বাধিয়া গেল। দ্বিষষ্টিতমে দুর্য্যোধনে ভীষ্মে বাধিয়া গেল। ত্রিষষ্টিতমে ভীষ্মের বক্তৃতা, চতুঃষষ্টিতমে বাপ্ বেটায় আবার বাধিল। পরে, এত কালের পর আবার হঠাৎ ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন যে অর্জ্জুন কি বলিলেন? তখন সঞ্জয় সেই অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের ছিন্ন সূত্র যোড়া দিয়া অর্জ্জুনবাক্য বলিতে লাগিলেন। বোধ করি কোন পাঠকেরই এখন সংশয় নাই, যে ৫৯।৬০ ৬১।৬২।৬৩।৬৪ অধ্যায়গুলি প্রক্ষিপ্ত। এই কয় অধ্যায়ে মহাভারতের ক্রিয়া একপদও অগ্রসর হইতেছে না। এই অধ্যায় গুলি বড় স্পষ্টতঃ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ইহার উল্লেখ করিলাম।

যে সকল কারণে এই ছয় অধ্যায়কে প্রক্ষিপ্ত বলা যাইতে পারে, অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়কেও সেই কারণে প্রক্ষিপ্ত বলা যাইতে পারে—পরবর্ত্তী এই অধ্যায় গুলি প্রক্ষিপ্তের উপর প্রক্ষিপ্ত। অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সম্বন্ধে আরও বলা যাইতে পারে, যে ইহা যে কেবল অপ্রাসঙ্গিক এবং অসংলগ্ন এমন নহে, পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণবাক্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। বোধ হয়, কোন রসিক লেখক, অসুরনিপাতন শৌরি; এবং সুরনিপাতিনী অসুরা, উভয়েরই ভক্ত; একত্রে উভয় উপাস্যকে দেখিবার জন্য এই ক্ষুদ্র অধ্যায়টি প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন।

যানসন্ধি পর্ব্বাধ্যায়ে এই গেল কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় প্রথম প্রসঙ্গ। দ্বিতীয় প্রসঙ্গ, সপ্তষষ্টিতম হইতে সপ্ততিতম পর্য্যন্ত চারি অধ্যায়ে এখানে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের জিজ্ঞাসা মতে কৃষ্ণের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। সঞ্জয় এখানে পূর্ব্বে যাঁহাকে মদ্য পানে উন্মত্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকেই জগদীশ্বর বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। বোধ হয় ইহাও প্রক্ষিপ্ত। প্রক্ষিপ্ত হউক না হউক, ইহাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। যদি অন্য কারণে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে আমাদের বিশ্বাস থাকে, তবে সঞ্জয় বাক্যে আমাদের প্রয়োজন কি? আর যদি সে বিশ্বাস না থাকে, তবে সঞ্জয় বাক্যে এমন কিছুই নাই, যে তাহার বলে আমাদিগের সে বিশ্বাস হইতে পারে। অতএব সঞ্জয়বাক্যের সমালোচনা আমাদের নিষ্প্রয়োজনীয়। কৃষ্ণের মানুষ

চরিত্রের কোন কথাই তাহাতে আমরা পাই না। তাহাই আমাদের সমালোচ্য।

এইখানে বামনভিক্ষা পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত হইল। এইখানে আমরা কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম খণ্ড সমাপ্ত করিলাম। ইহার পর ভগবদ্‌যান পর্ব্বাধ্যায়। সে অতি বিস্তৃত কথা—দ্বিতীয় খণ্ডে তাহার সমালোচনা আরম্ভ করিব। যতদূর আমরা আসিয়াছি, ততদূরে বোধ হয় তিনটি কথা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকিবে।

১। কৃষ্ণ মানুষী শক্তি ভিন্ন দৈব শক্তিকে আশ্রয় করিয়া কর্ম্ম করেন নাই।

২। মানুষ চরিত্রে তিনি সর্ব্বগুণের আধার, এবং সর্ব্বকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা—অথচ স্বয়ং নিষ্কাম ও নির্লিপ্ত।

৩। ঈদৃশ পুরুষই আদর্শপুরুষ। অতএব শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ মনুষ্য।

আদর্শমনুষ্যত্ব ঈশ্বরাবতার ভিন্ন অন্য মনুষ্যে সম্ভবে কি না, এ কথাটার বিচার পাঠক নিজে করিবেন।

গোময়ের সদ্ব্যবহার।

যাহা আছে তাহার কখনও অভাব হয় না এবং যাহা নাই, তাহার অস্তিত্ব কখনও সম্ভবে না, হিন্দুদের দর্শন শাস্ত্রে এই রকম কথা আছে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আজ কাল সেই কথার সত্যতা সপ্রমাণ করিয়াছেন। পদার্থের বিনাশ নাই, এবং এই বিশ্বের পদার্থ সমূহের ভিতর যে পরিমাণ শক্তি নিহিত রহিয়াছে তাহারও হ্রাস-বৃদ্ধি নাই—বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ আজ কাল এই সত্য সাধারণের চক্ষের উপর ধরিয়া দিতেছেন। কাঠে আগুণ দিলাম কাঠ জ্বলিয়া গেল, সাধারণে মনে করিতে পারেন যে, যে ওজনের কাঠ পোড়াইলাম তাহার অধিকাংশই ত ধ্বংস হইয়া গেল,

কিন্তু বিজ্ঞানে ইহা দেখাইয়া দেয় যে বাস্তবিক কাঠের পদার্থের ধ্বংস কিছু মাত্র হয় নাই; কতক পদার্থ ধুঁয়ার আকারে বাতাসে মিশাইয়া রহিল, কতক পদার্থ ভস্মরূপে পড়িয়া রহিল; ঐ ভস্ম ও ধুঁয়া প্রভৃতি একত্রে মিশাইয়া ওজন করিলে কাঠের ওজনের সঙ্গে ঠিক সমান হয়। এইরূপে তাঁহারা দেখাইয়া দেন যে ধ্বংস বলিয়া কথা নাই—তবে এক পদার্থ আজ এক প্রকার অবস্থায় আছে কাল তাহা অন্য অবস্থায় পরিণত হইয়া থাকে, এইরূপে পদার্থের বিকার ঘটিয়া থাকে কিন্তু হ্রাস বর্দ্ধন বা বিনাশ কখনও সম্ভবে না।

পদার্থ সকল এক প্রকার অবস্থা হইতে যে অন্য প্রকার অবস্থায় পরিণত হয় সেই পরিণামও প্রকৃতির একটী চমৎকার নিয়মের বশে চলিতেছে। হিন্দু দর্শনশাস্ত্রে এই নিয়মটীকে পরিণাম চক্র বলিয়া উল্লেখ করা আছে, ইংরাজী বিজ্ঞান ইহাকে Cyclic change বলা হয়। এই পরিণাম চক্র কিরূপ তাহা একটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইতে চাই। সমুদ্রের জল উত্তপ্ত হইয়া বাষ্পাকারে উপরে উঠিয়া মেঘ হয়, সেই মেঘ হইতে উত্তাপের হ্রাস হইয়া বৃষ্টি হয়, সেই বৃষ্টি মাটিতে পড়িয়া নদী প্রভৃতিতে পড়িয়া পুনরায় সমুদ্রে আসিয়া সমুদ্রের জলরূপে পরিণত হয়। সমুদ্রের জলীয় পদার্থের অবস্থার পরিবর্ত্তনে কখন বাষ্প কখন মেঘ কখন বৃষ্টি কখনও নদীর জলের আকার পাইয়া অবশেষে উহার পূর্ব্বাবস্থাই প্রাপ্ত হয়। এইরূপ প্রকৃতির বশে জগতে পদার্থের যা কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে সকলেই চক্র পথে ঘুরিতেছে। কি জড় জগৎ কি জৈব জগৎ যেখানেই দেখ সেইখানেই প্রকৃতির পরিণামচক্র নিয়মানুযায়ী খেলা দেখিতে পাইবে। পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগণ সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে, চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে; আবার সূর্য্য এই সমস্ত গ্রহাদি সঙ্গে লইয়া কোন নক্ষত্রের চারিদিকে ঘুরিতেছে। চাকার ভিতর চাকা আবার তাহার ভিতর চাকা এইরূপ চাকার পাকে কি অণু, কি পরমাণু কি শৈল কি নদী কি সাগর কি মহাসাগর কি দ্বীপ কি দেশ কি বৃক্ষ কি কীট কি পতঙ্গ কি মনুষ্য কি সমাজ কি সাম্রাজ্য সমস্তই ঘুরপাক খাইতেছে। আজ এ অভ্রভেদী দেবাত্মা ভীষণ-

দর্শন হিমাদ্রীকে অচল অটল দুর্ভেদ্য গগণস্পর্শী বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু এমন কাল আসিবে যখন প্রকৃতির পরিণাম চক্র নিয়মানুযায়ী খেলায় গিরিরাজের ভীম কলেবর সমুদ্র তটস্থ শীলাখণ্ডে পরিণত হইবে, পরে তাহাও থাকিবে না, নদীতটস্থ বালুকাকণার সহিত মিশিয়া যাইবে আবার কালচক্র যেমন ঘুরিবে সেই সঙ্গে ঐ ধূলারাশি আবার একত্রিত হইয়া ক্রমে ক্রমে শৈলাকারে পরিণত হইবে। এই শৈল যখন আবার গগনভেদী হইয়া উঠিবে তখন বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে হিমাদ্রি সম্বন্ধীয় একটি চক্র পূর্ণ হইবে।

জীবের জীবনে, জন্ম বর্দ্ধন ও মৃত্যুতে এই পরিণাম চক্রের খেলা সুস্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে। মৃত্যুকে আমরা পঞ্চত্বপ্রাপ্তি বলি—এই পঞ্চত্ব প্রাপ্তি কথাটির অর্থ বুঝিলে চক্র তত্ত্বের ভিতরের কথাটি বেশ বুঝিতে পারা যায়। মাটি জল বায়ু প্রভৃতি পদার্থ সকল যাহা ভূমণ্ডলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, প্রাণী শরীরে উপাদান সকল সেই সেই পদার্থ হইতে আহৃত হইয়া একত্রে যখন সমাবিষ্ট থাকে তখন প্রাণীর জীবিতাবস্থা, আর এই একত্ব ঘুচিয়া যখন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় তখন প্রাণীর মৃত্যু অবস্থা; মৃত্যু অর্থে মহাজনের ধার সব শোধ দিয়া তাহাদের সঙ্গে ফারখতি লওয়া। মাটি থেকে যাহা লইয়া বাঁচিয়া আছি মরিবার সময় তাহা মাটিতে ফিরিয়া যায়, জলীয় ভাগ জলে মেশে, বায়ু থেকে যাহা লইয়াছি তাহা বায়ুতে মিশিয়া যায় এইরূপ যেখানকার পদার্থ সেইখানে চলিয়া যায়, মাঝে থেকে জবের জীবন চক্রখানি একবার ঘুরিয়া পড়ে।

জীবন চক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে প্রাণীগণ কেবল ধার করিতেছে, আর ধার শুধিতেছে। আমরা যে প্রত্যহ আহার করি ইহার ভিতরে যে কি চমৎকার লেন দেনের ব্যাপার রহিয়াছে তাহা হয়ত অনেকে জানেন না। উদ্ভিদগণ আমাদের জন্য আহারের উপযোগী পদার্থ সকল যোগাইয়া দেয়, আমরা সেই সকল পদার্থ অন্নরূপে গ্রহণ করি এবং সেই অন্ন আমাদের শরীরে অঙ্গারক বাষ্পরূপে পরিণত হইয়া নিশ্বাসের সহিত বাহিরের বাতাসে মিশে; এই অঙ্গারক বাষ্প হইতে উদ্ভিদে। আবার তাহাদের শরীর ধারনোপযোগী পদার্থ সকল আহরণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে। আজ মাঠে যে ধান।

শীষগুলি দেখিতেছ ঐ গুলি আমাদের জঠরানলে দগ্ধ হইয়া এক প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়, উহাই রক্ত রূপে পরিণত হয়, উহাই আবার নিশ্বাসের সহিত বাষ্পাকারে বাহির হইয়া বাতাসে মিশে, পরে উহাই আবার উদ্ভিদ্‌ জীবনের উপযোগী পদার্থ হইয়া উদ্ভিদ্‌জীবন রক্ষা করে, এইরূপ এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে পরিণত হইয়া ধান্যস্থ পদার্থ পুনরায় যখন ধান্যেই পরিণত হয় তখন ঐ পদার্থের একটি চক্র পূর্ণ হয়। প্রাণীগণ যখন স্বভাবের অধীন হইয়া কার্য্য করে তখন ইহাই দেখা যায় যে তাহারা উদ্ভিদ্‌গণ হইতে যে সকল পদার্থ ধার করে মলমূত্র প্রশ্বাস ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া উদ্ভিদ্‌গণের ধার শোধ দিয়া থাকে। প্রাণীগণ উদ্ভিদ্‌গণ হইতে তাহাদের জীবন ধারণোপযোগী পদার্থ আহরণ করে উদ্ভিদ্‌গণ আবার প্রাণীশরীর নিঃসৃত মল মূত্র বায়ু ও তাপ হইতে তাঁহাদের জীবনের উপযোগী পদার্থ ও শক্তি সংগ্রহ করিয়া থাকে। প্রকৃতি প্রাণীজগৎ ও উদ্ভিদ্‌জগতের মধ্যে পরস্পরের এই লেন দেন সম্বন্ধ সুচারুরূপে বজায় রাখিতে সদাই ব্যস্ত।

মানুষের কি কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য—পদার্থ সম্বন্ধে কোনটি সদ্ব্যবহার কোনটিই বা অসদ্ব্যবহার এইটি ঠিক বুঝিতে গেলে কোনটি প্রকৃতি-সুন্দরীর অভিমতানুযায়ী কার্য্য কোনটিই বা তাঁহার অভিমতানুযায়ী নহে সেইটি বুঝা কর্ত্তব্য।

হিন্দুদের মধ্যে গোজাতি ও গোজাত দ্রব্য সমূহের যেরূপ আদর পৃথিবীর কুত্রাপি আর সেরূপ নাই; আমরা গাভীগুলিকে ভগবতীস্বরূপ পূজা করি, যে বাড়ীতে গরুর যত্ন থাকে লক্ষ্মী সেইখানে বাস করেন এইরূপ কথা আমরা বলিয়া থাকি। গরুর দুগ্ধ হিন্দুর কাছে পবিত্র আহার বলিয়াই যে কেবল আমাদের কাছে গরুর এত আদর তাহা ঠিক নহে। গোমূত্র এবং গোময় ও আমাদের কাছে পবিত্র পদার্থ। কবিরাজগণ ঔষধাদি প্রস্তুত করিতে যে সকল পদার্থ ব্যবহার করেন তাহাদের শোধন করিবার জন্য অনেক সময় গোমূত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কোন অন্যায় কার্য্য করিয়া কেহ যদি অশুচি হয় তবে সে ব্যক্তি গোময় ভক্ষণ করিলেই পবিত্রতা ফিরিয়া পায়। ঘর দুয়ার দেয়াল পবিত্র রাখিবার জন্য প্রত্যহ গোময় লেপন করিয়া থাকি। গোময় ও গোমূত্র মাহাত্ম্য মহাভারতে এইরূপ কীর্ত্তিত।

"যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কি রূপে গোময়ে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান হইল তদ্বিষয়ে আমি নিতান্ত সংশয়ারূঢ় হইয়াছি অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।"

"ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে গোলক্ষ্মী সংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন * করিতেছি শ্রবণ কর। একদা লক্ষ্মী মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গো সমূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। গো সমুদায় তাঁহার অলৌকিক রূপ সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, দেবি তুমি কে? কোথা হইতে এস্থানে উপস্থিত হইলে এবং কোন স্থানেই বা গমন করিবে আমরা তোমার অসামান্য রূপ দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি। অতএব তুমি ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তার কীর্ত্তন কর।

তখন লক্ষ্মী কহিলেন, হে গো সমুদায়, আমি লোককান্তা শ্রী; দৈত্যগণ মৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া চিরকাল কষ্ট ভোগ ও দেবগণ মৎকর্ত্তৃক সমাশ্রিত হইয়া চিরকাল সুখভোগ করিতেছে। * * * *

এক্ষণে আমি তোমাদিগের দেহে বাস করিতে বাসনা করিতেছি তোমরা আমার সহিত সমবেত হইয়া পরম সুখে কালযাপন কর।

ধেনুগণ কহিলেন, দেবি, তুমি অতিশয় চঞ্চলা ও বহুজনভোগ্যা, এই নিমিত্ত তোমাকে আশ্রয় করিতে আমাদের অভিলাষ নাই। আমরা স্বভাবতঃই রূপ সম্পন্ন রহিয়াছি সুতরাং তোমারে আশ্রয় করা কিছুতেই আবশ্যক বোধ হইতেছে না অতএব তুমি যথা ইচ্ছা প্রস্থান কর।

* * * * * *

শ্রী কহিলেন, ধেনুগণ! আমি তোমাদিগকে শরণ্য মহাভাগ ও সর্ব্বলোকের মানদাতা জানিয়া তোমাদিগের শরণাপন্ন হইয়াছি; আমারে প্রত্যাখ্যান করিয়া অপমান করা তোমাদিগের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। অতএব তোমরা প্রসন্ন হইয়া আমার সম্মান রক্ষা কর। আজি তোমরা আমার অপমান করিলে আমি সর্ব্বলোকের অবজ্ঞাত হইব। তোমাদিগের অঙ্গের মধ্যে কোন কুৎসিত প্রদেশ থাকিলেও তাহাতে বাস করিতে আমার অসম্মতি ছিল না।

* কালীপ্রসন্ন সিংহ কৃত অনুবাদ, অনুশাসনিক পর্ব্বাধ্যায়।

কিন্তু তোমাদের কোন অঙ্গই কুৎসিৎ নহে। তোমরা পরম পবিত্র ও মঙ্গলের আধার, এক্ষণে আমি তোমাদিগের দেহের কোন্ অংশে অবস্থান করিব তাহা আদেশ কর।

লক্ষ্মী এইরূপ বিনয় প্রদর্শন করিলে দয়াপরায়ণ ধেনুগণ তাঁহারি প্রতি প্রসন্ন হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন দেবি! তোমার সম্মান রক্ষা করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য অতএব আমরা তোমায় অনুমতি করিতেছি তুমি আমাদিগের পরম পবিত্র মূত্রপুরীষে অবস্থান কর।

গো সমুদয় এই কথা কহিলে লক্ষ্মী যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধেনুগণ! তোমরা প্রসন্ন হইয়া আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে, এক্ষণে তোমাদের মঙ্গল হউক।"

গোময় ও গোমূত্রের যথার্থ সদ্ব্যবহারে চঞ্চলা লক্ষ্মী অচলা হইয়া বাস করেন এ কথাটী বড়ই সত্য। ভাবুক ঋষিগণ ইহা বুঝিয়াছিলেন এবং আজ কালকার লোকে এই সত্যটি ঠিক বুঝিতে পারিলেই দেশের পূর্ব্ব লক্ষ্মীশ্রী ফিরিয়া আসিবে এই আশা করা যায়।

যাহা মহৎ কার্য্যে ব্যবহারের জন্য অভিপ্রেত তাহাকে যদি সামান্য কার্য্যে প্রয়োগ করা যায়, তবে তাহার যে অনাদর করা হয় এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমরা আজ কাল সচরাচর গোময়ের যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি—উহা অপব্যবহার—গোময়ের অনাদর। গোময় কৃষিক্ষেত্রের সারস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং ঘুঁটের আকারে জ্বালানি কাঠের কার্য্যও করিয়া থাকে। যে রাশি রাশি গোময় জ্বালানি কাঠের কাজ করে উহার তুলনায় যে টুকু সারস্বরূপ ব্যবহৃত হয় উহা অতি সামান্য। ঘর দ্বার লেপিবার জন্য ও অন্যান্য কাজে অতি সামান্য গোময়ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমরা এই প্রবন্ধে দেখাইতে চাই যে গোময় সারস্বরূপ ব্যবহৃত না হইয়া ইন্ধনে পরিণত হইলে উহার বড়ই অসদ্ব্যবহার করা হইল। একমাত্র কৃষিক্ষেত্রের সারস্বরূপ ব্যবহারই গোময়ের প্রকৃত সদ্ব্যবহার—প্রকৃতি সুন্দরীর অভিপ্রেত।

ক্রমশঃ—

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ রায়।

ফুলের হাসি।

আঁধারে আজি ফুল, ফুটিলি কেন বল,
কি সুখ প্রাণে তোর লুকায়ে পরিমল!
তোর এ রূপরাশি, তোর এ সুধা-হাসি,
আঁধারে মিশাইয়ে লভিলি কোন্ ফল—
আঁধারে আজি ফুল ফুটিলি কেন বল্!

তুই ফুটিবি ব'লে প্রবাসে যেতে যেতে,
সাঁঝের রবিখানি আপনি আড়ি পেতে,
মেঘের আড়ে থেকে চাহিল তোর পানে,
চাহিল কত বার লোহিত দু নয়ানে।
সোণার কর দিয়ে অতুল সুষমায়,
সাজা'লে কভু সাধে আপনি তোর কায়,
বিষাদে কত বার করিয়ে কত ভাণ,
গাছের আড়ে গিয়ে জানা'লে অভিমান।
তুষিতে তার প্রাণ, তবু ত উঠিলি না—
কই রে, ফুলবালা, তুই ত ফুটিলি না।

চুমিছে পরিমল, আকুল অলিদল
কত-না আশা ক'রে এখানে এসেছিল,
পাখিরা নেচে নেচে, পাখিরা গেয়ে গেয়ে;
ঘুরিয়ে তোর পাশে সকলে ফিরে গেল।
নদীতে ছুটে ছুটে আকুল ঢেউ গুলি,
ধরিতে হাসি তোর আসিল মুখ তুলি'।
চাহিয়ে তোর পানে কত-না আশা ক'রে,
হতাশে চ'লে গেল মিশিতে পারাবারে।

পবন ছুঁয়ে তোকে ঠেলিল কত বার,
সে কানে, শুনিলি-না তুই ত কথা তার।
সোহাগে কত বার গেল সে মুখ চুমে,
রহিলি তবু তুই অঘোর হ'য়ে ঘুমে।
কাতর সে সবারে ভাল ত বাসিলি না—
কই রে, ফুলবালা, তুই ত হাসিলি না!

তিমিরে বসুমতী হইলে নিমগন,
সকলে চ'লে গেল—গেল না সমীরণ।
শীতল জল-কণা যতনে আনি' ছুটি'
মুছা'য়ে দিল তোর অলস আঁখি দুটি।
অমনি ধীরে ধীরে দেখিলি তুই চেয়ে,
ঝরিল সুধাহাসি অধর তোর বেয়ে।
খেলিলি বায়ু সনে মরমে ফিরে ঘুরে,
কখনো কাছে তার, কভু বা গিয়ে দূরে।
শ্যামল-কিসলয় তোর সে কেশ-ভার,
লুকা'লি তার মাঝে মু'খানি কত বার।
হাসিয়া সমীরণ আসিয়া পুন তুলে,
সোহাগে চুমি' তবে ঘোমটা দিলে খুলে।
অমনি হেসে তুই হইলি ঢল্ ঢল্
আঁধারে আজি, ফুল, ফুটিলি কেন বল্!

ভালবাসা।

শি। এই জগতের পদার্থ সমূহ দুই ভাগে বিভক্ত; চেতন জীব এবং জড় পদার্থ। যে সকল ভিন্ন ভিন্ন শক্তির বশে জগৎ চক্র ঘুরিতেছে তাহা-

দিগকে প্রধান তিন ভাগে ভাগ করিতে পারা যায়; যে শক্তিসূত্রে একটি জড় পদার্থ অন্য জড় পদার্থের সহিত বাঁধা থাকে তাহার নাম জড় শক্তি; যে শক্তি নিবন্ধন চেতন জীব জড় বিষয়ে আকৃষ্ট হয় তাহার নাম বিষয়াশক্তি এবং জীবের সহিত জীবের যে আকর্ষণ সম্বন্ধ তাহার নাম ভালবাসা।

যে ভাব নিবন্ধন আমরা সুখ দুঃখ বুঝিতে পারি তাহাই চেতন ভাব অর্থাৎ জীব-ভাব। আমার দেহ আছে, রক্ত আছে অস্থি আছে রূপ আছে ইন্দ্রিয় আছে কিন্তু ইহারা চেতন পদার্থ নহে। যে পদার্থের অস্তিত্ব নিবন্ধন আমি সুখ দুঃখ বুঝিতে পারি সেই টুকুই আমার চেতনত্বের কারণ, হিন্দু দার্শনিকগণ এইরূপ কথা বলিয়া থাকেন। আমার রক্তের সহিত আর একজনের রক্তের যে আকর্ষণ সম্বন্ধ তাহা জড় সম্বন্ধ; একজনের রূপ শব্দ প্রভৃতির সহিত আমার সুখ দুঃখের যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধমূলক যে অনুরাগ তাহার নাম বিষয়ানুরাগ; একজনের সুখ দুঃখের সহিত আমার সুখ দুঃখের যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধমূলক আকর্ষণের নাম ভালবাসা বা প্রণয়। যিনি অপর একজনের সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখী তিনিই যথার্থ প্রণয়ী। সাংখ্যকার বলেন যে প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী; এই গুণ কথাটির অর্থ বন্ধনরজ্জু—টীকাকারগণ এইরূপ অর্থ করেন। এই তিনটি গুণের নাম সত্ত্ব রজ ও তম গুণ। চেতনের সহিত চেতনের যে সম্বন্ধ তাহা সাত্বিক সম্বন্ধ, চেতন জীবের সহিত জড় পদার্থের যে সম্বন্ধ তাহা রাজসিক সম্বন্ধ এবং জড়ের সহিত জড়ের যে সম্বন্ধ তাহা তামসিক সম্বন্ধ।

শক্তি তত্ত্ব আলোচনা করাই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ-গণ কেবল জড়জাতীয় শক্তিতত্ত্বই আলোচনা করিতেছেন এবং আর্য্য-বিজ্ঞানে কেবল চেতন জাতীয় শক্তিতত্ত্বই সমালোচনা করা আছে। ইহাই পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বিজ্ঞানের মধ্যে প্রধান প্রভেদ। সাত্বিক ও রাজসিক শক্তিকে চেতন জাতীয় শক্তি বলিতেছি।

জড় জগতে শক্তির ক্রিয়া দুই প্রকার লক্ষিত হয়,, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ। রাজসিক শক্তির ক্রিয়াও প্রধানতঃ দুই প্রকার দেখা যায়, রাগ ও দ্বেষ।

এই রাগের অপর নাম কাম। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন "কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভব।" রজোগুণ সম্ভূত বিষয়াশক্তির নাম কাম এবং সত্বগুণ সম্ভূত আসঙ্গ লিপ্সাকেই প্রকৃত ভালবাসা বলা যায়।

এইবারে সকাম কর্ম্ম কাহাকে বলে এবং নিষ্কাম কর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা বলি শুন। চিত্তে রজোভাব অর্থাৎ বিষয় সুখভোগেচ্ছা প্রবল হইলে যখন সেই সুখ প্রাপ্তি জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তখন সেই কর্ম্মকে সকাম কর্ম্ম বলা যায়; কিন্তু সাত্বিক ভাবের প্রাবল্য নিবন্ধন যখন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তখন সেই কর্ম্মকে নিষ্কাম কর্ম্ম বলে।

চিত্তের সাত্বিক ভাব রাজসিক ভাব ও তামসিক ভাব কিরূপ তাহা একটু পরিষ্কার করিয়া বলি শুন। চিত্তের যে অবস্থায় মনুষ্য একজনের সুখ অন্বেষণেই ব্যাস্ত, যাহাতে সেই অন্য ব্যক্তি সুখী হয় সেই কার্য্য করিতেই স্বতঃ প্রবৃত্ত হয় তখন তাহার অন্তরে সাত্বিক ভাব উদয় হইয়াছে; অর্থাৎ যথার্থ যাহাকে ভালবাসা বলা যায় সেই ভালবাসার ভাব যাঁহার চিত্তে বিরাজমান তাঁহার চিত্তের অবস্থাকে সাত্বিক ভাব বলা যায়। আকর্ষণের চরম ফল দুটিতে মিশিয়া এক হইয়া যাওয়া, ভালবাসার ও চরম উদ্দেশ্য দুটি মিশিয়া এক হইয়া যাওয়া অর্থাৎ দুজনের সুখ দুঃখ মিশিয়া যাওয়া। সাত্বিক ভাব প্রবল হইলে মনুষ্য এমন একজনকে খুঁজিতে থাকে যাহার সুখ দুঃখের সহিত তিনি নিজের সুখ দুঃখ মিশাইতে পারেন, যাহার সুখ সাধনের উপায় চিন্তা করিতে গিয়াই যাহার সুখ সাধনোদ্দেশে কর্ম্ম করিয়াই তিনি সুখী হইতে পারেন। রাজসিক ভাব প্রবল হইলে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ প্রভৃতি বিষয়ে চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া থাকে, এই অবস্থায় যে বিষয় ভোগেচ্ছা জন্মে তাহার নাম কাম; যদি কেহ কাম্য বস্তু লাভের প্রতি-কূলতা চরণ করে তবে তাহার প্রতি ক্রোধের সঞ্চার হয়।

চিত্তের যে অবস্থায় মনুষ্য জড় ভাব প্রাপ্ত হয় (যেমন আলস্য নিদ্রা অবস্থা) তাহাই চিত্তের তামসিক অবস্থা।

এইবার তুমি কাম ও প্রেম এই দুইটি কথার অর্থ বোধ হয় অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছ এই দুইএর প্রভেদট ঠিক বুঝিতে পারা বড় প্রয়োজনীয় কেন না মনুষ্য জীবনে অনেক সময় এইরূপ ঘটে যে যাহা প্রকৃত পক্ষে

রাজসিক ভাব যাহা কাম তাহাকেই আমরা বিশুদ্ধ প্রেম বলিয়া বুঝিয়া প্রকৃত প্রেমের রসাস্বদনে বঞ্চিত হইয়া পড়ি।

প্রকৃত প্রণয়ের সাহায্যে কাম দমন করিতে হয়, নচেৎ জোর জবরদস্তি করিয়া যাঁহারা কাম দমন করিতে চান তাঁহারা ভুল পথে চলিয়া থাকেন। সত্বগুণের আধিক্য উপস্থিত না হইলে রজোগুণের প্রাদুর্ভাব কমে না। যদি নিষ্কাম কর্ম্ম কি তাহা বুঝিতে চাও তবে প্রকৃত ভালবাসা অভ্যাস করিতে শিখ। ক্রমাগত আত্ম পরীক্ষা দ্বারা নিজের কর্ম্ম সকলের মধ্যে কোনগুলি রজোগুণ সমুদ্ভব আর কোন্ গুলিই বা সত্ত্ব গুণ সমুদ্ভব তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিবে এবং সত্বগুণের প্রাবল্য উপস্থিত হইলে চিত্তে যে ভাব উদয় হয়, স্মৃতি বৃত্তির সাহায্যে সেই ভাব চিত্তে সতত জাগরুক রাখিবার চেষ্টা করিবে, এইরূপ ক্রমাগত অভ্যাস দ্বারা রাজসিক বৃত্তি সমূহ ক্ষীণ হইয়া যায়। ঈশ্বর ভক্ত যে সময় ঈশ্বরের উপাসনা করেন সাত্ত্বিক ভাবের প্রাধান্য উপস্থিত করাই সেই উপাসনার উদ্দেশ্য।

ভালবাসা তত্ত্ব সম্যক আলোচনা করিয়া ভাল বাসিতে শিখিয়া জগৎশুদ্ধ সকলকে ভাল বাসিতে শিখ তবেই ক্রমে ঈশ্বর সাক্ষাৎ লাভ করিতে সমর্থ হইবে। প্রথমে একজনকে ভাল বাসিতে শিখ তাহার পর পৃথিবীস্থ সমস্ত মনুষ্য সমষ্টিকে তোমার ভালবাসার আধার পদার্থ বুঝিয়া সেই পদার্থে তোমার ভালবাসা ন্যস্ত করিতে শিখ।

যে ভাবে জগৎকে ভাল বাসিবে সেই ভাবটি সম্যক্ না বুঝিয়া যদি "আত্মবৎ সর্ব্বভুতেষু" দেখিতে যাও তবে প্রচারের "গ্রাম্য কথায়" সেই যে বালকের বিদ্যার পরিচয় দেওয়া আছে তোমার বিদ্যাও সেই ধরণের হইয়া দাঁড়াইবে।

ভালবাসা রহস্য আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহা বুঝিতে পারিবে যে জোর জবরদস্তি করিয়া ভালবাসা জন্মে না। যাহাকে সুন্দর বলিয়া বুঝি তাহারই সুখ দুঃখে নিজের সুখ দুঃখ মিশাইতে প্রবৃত্তি জন্মে। যে চিত্ত উন্নত তাহাই সুন্দর; যাহা যথার্থ সুন্দর নহে মোহবশতঃ তাহাকেই সুন্দর জ্ঞান করিয়া আপনা হারা হইও না তাহা হইলে তোমার ভালবাসা চিরস্থায়ী হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কেন না যাহাকে আজি ভ্রম বশতঃ সুন্দর

বলিয়া বুঝিয়াছ, কিছুকাল মিলনের পর সেই মোহ ভাঙ্গিয়া যাইবে তখন নিজের ভ্রান্তি বুঝিয়া দারুণ দুঃখে পতিত হইতে হইবে। মোহবশতঃ যে ভালবাসা তাহা চিরস্থায়ী হয় না।

জ্ঞানালোকে মোহ দূর হয় সুতরাং জ্ঞানালোকের সাহায্যে প্রকৃত সৌন্দর্য্য কি তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়া ভাল বাসিতে শিখিবে। ভালবাসা রহস্য সম্বন্ধে আমার উপদেষ্টা এইরূপ কথা বলেন যে "প্রেম বুদ্ধিবৃত্তিমূলক"। কি ভাল কি মন্দ, কি সুন্দর কি সুন্দর নয় ইহা সম্যক বিচার করা বুদ্ধিবৃত্তির কাজ। কিন্তু মনুষ্যগণ মায়ার বশে থাকায় জ্ঞানের আলোক সম্যক প্রস্ফুরিত হয় না এবং সেই জন্যই এ পৃথিবীতে এত গোলমাল; যে সৌন্দর্য্য সূত্রে জীব সকল গাঁথা রহিয়াছে সেই সূতা গাছটিতে যেন জোট পড়িয়া রহিয়াছে; সূতাটির কুড় খুঁজে পাওয়া দায় হইয়া উঠিয়াছে।

'Tis distance lends enchantment to the view' ইংরাজী এই enchantment কথাটি আর আমাদের "মায়ার মোহ" কথাটি একার্থ-বোধক বলিয়া বুঝি। এই মায়ার মোহ বসে যাহাকে আজ সুন্দর বলিয়া মনে হয় কিছু দিন মিলনের পর আর সেখানে সে সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই না এই জন্যই পৃথিবীতে নূতনের আদর পুরাতনের আদর নাই। কিন্তু যিনি যথার্থ প্রেমিক তাঁহার কাছে নূতন পুরাতন দুইই সমান। কেননা ভাল বাসার আধারে কোন অংশটুকু প্রকৃত সুন্দর এবং কোন অংশ সুন্দর নয় সেই সত্য পূর্ব্বে সম্যক্ বুঝিয়াই তিনি ভাল বাসিয়া থাকেন। পূর্ব্বে বলি-য়াছি যে দুটি চিত্ত মিশিয়া এক হইয়া যাওয়াই ভালবাসার চরমফল কিন্তু মনের মতন সৌন্দর্য্য এই পৃথিবীতে খুঁজিয়া মেলা ভার সেই জন্য যিনি প্রকৃত ভালবাসা কি তাহা বুঝিয়াছেন তিনি মনের মতন সৌন্দর্য্য গড়িয়া সেই ভবিষ্যৎ সুন্দরের চিত্তে চিত্ত অর্পণ করিয়া আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। এইরূপ সুন্দর চিত্তের সুখ দুঃখে নিজের সুখ দুঃখ মিশাইবার অভিপ্রায়ে যিনি কোন এক আধার অবলম্বন করিয়া সৌন্দর্য্য গঠন কার্য্যে তৃপ্তিলাভ করেন. তাঁহার কর্ম্মকেই নিষ্কাম কর্ম্ম বলি।

যিনি ভালবাসা অভ্যাস করিতে চান তাঁহাকে কি কি অভ্যাস করিতে হইবে তাহা বলি শুন।

১ম। চিত্তে সাত্বিক ভাবের আধিক্য যাহাতে জন্মে সেই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, ক্রমে চিত্তের এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইবে যে অন্য একটি চেতন জীবের সুখ দুঃখের সহিত নিজের সুখ দুঃখ মিশাইবার জন্য অন্তরে একটা ব্যগ্রতা উপস্থিত হইবে।

২য়। বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে প্রকৃত সুন্দর ও উন্নত চিত্তের ভাব কিরূপ ক্রমাগত চিন্তাদ্বারা তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে শিখিতে হইবে।

৩য়। নিজের চিত্তে চিত্রিত সুন্দরের সৌন্দর্য্যে অপর একজনকে ভূষিত করিবার জন্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে হইবে।

৪র্থ। এইরূপ কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকার সময় কোন কর্ম্মের কিরূপ ফল ফলে তাহা সবিশেষ স্মরণ করিয়া রাখিবে।

৫ম। এই সুন্দর গঠন কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া অল্প দিনের মধ্যেই যে উদ্দেশ্য সফল হইবে এরূপ প্রত্যাশা করিও না। যদিও এই এক জন্মে তোমার উদ্দেশ্য সফল না হয় এই সুন্দর গঠন কার্য্যে তোমার চিত্ত যে উন্নত দশা প্রাপ্ত হইবে পর জন্মে সেই উন্নত চিত্ত লইয়া তুমি জন্ম গ্রহণ করিবে এবং সে জন্মে তোমার উদ্দেশ্য সফল হওয়া সুকর হইয়া উঠিবে।

৬ষ্ঠ। যদি তোমার মনের মানুষ গড়িয়া লইতে সক্ষম হও তবে তাহার সুখ দুঃখে নিজের সুখ দুঃখ মিশাইয়া নিজের অহংজ্ঞান ঘুচাইতে শিখিবে। এই অবস্থায় উপনীত হইলে তোমার ভালবাসার শিক্ষা সমাপ্ত হইল।

৭ম। তাহার পর যেমন একজনকে সুন্দর করিয়াছ সেইরূপ এই সমস্ত পৃথিবীকে তোমার ভালবাসার আধার বুঝিয়া মনুষ্য সমষ্টিকে সুন্দর ও উন্নত করিতে যত্নবান হইবে। যিনি এইরূপ কার্য্যে ব্রতী ঐশ্বরিক শক্তি তাঁহাতে আবির্ভূত হয়। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেবকে ঈশ্বরের অবতার বলা হইয়া থাকে।

ছা। কি উপায় অবলম্বনে চিত্তে সাত্বিক ভাবের আধিক্য জন্মে সে বিষয়ে কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি। মনে করুন একজন রূপের সৌন্দর্য্য-প্রাথী, যেখানে তিনি সেই রূপের সৌন্দর্য্য দেখেন তাঁহার ভালবাসা সেই-খানেই গিয়া পড়ে তিনি কি উপায় অবলম্বন করিলে তাঁহার রূপতৃষ্ণা দূর হইয়া অন্তরে সাত্বিকভাবের আধিক্য জন্মিতে পারে?

শি। সুন্দরকে ভালবাসা আর সৌন্দর্য্য তৃষ্ণা এ দুটি কথায় বড় প্রভেদ সেটি স্মরণ রাখিও। যাঁহার রূপ তৃষ্ণা প্রবল তিনি রূপ উপভোগ করিবার জন্য ব্যগ্র হন কিন্তু যিনি যথার্থ সুন্দর রূপ ভাল বাসেন তিনি সেই সৌন্দর্য্য গ্রাহী হইয়াও রূপ উপভোগের কামনা করেন না। উপভোগে সুন্দরের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় কিন্তু যিনি প্রকৃত সৌন্দর্য্য-গ্রাহী সুন্দরের সৌন্দর্য্য যাহাতে চিরস্থায়ী করা যাইতে পারে তিনি সেই বিষয়ে সচেষ্ট থাকেন।

"সোনার বিগ্রহ করি পূজ এক দিন
সেও রে পরশ দোষে হয়রে মলিন" হেমচন্দ্র।

উপভোগে সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় সুতরাং যিনি যথার্থ রূপের সৌন্দর্য্য ভালবাসেন তিনি কখন ও সেইরূপ উপভোগ করিতে গিয়া রূপবান্ বা রূপবতীর রূপ নষ্ট করিতে চান না। যিনি রূপতৃষ্ণা দূর করিতে চান তিনি যেন রূপ ভাল বাসিতে শিখেন। যিনি রূপ তৃষ্ণা দূর করিতে চান তিনি রূপবান্ বা রূপবতীকে রূপের আভায় উজ্জ্বলতর করিতে যত্নবান হউন, যেখানে কেবল রূপের সৌন্দর্য্য আছে সেইখানে যাহাতে গুণের সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইয়া মুখকান্তি অধিকতর দীপ্তিশালী হইতে পারে সেই বিষয়ে সচেষ্ট থাকুন, এবং এইরূপ কর্ম্মেই তৃপ্তিলাভ করিতে শিখুন তবেই তাঁহার রূপভোগ তৃষ্ণা ক্রমেই কমিয়া যাইবে।

চেতন জীব প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত পুরুষ ও স্ত্রী। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে একটি স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে, এই সম্বন্ধটি কি তাহা সম্যক্ না বুঝিয়া পুরুষ, স্ত্রী উপভোগের জন্য তৃষ্ণাতুর হইয়া বেড়ায়। এই তৃষ্ণা হইতে পৃথিবীতে দ্বেষ, ঈর্ষা, ক্রোধ, বিবাদ বিসম্বাদ প্রভৃতি যত কিছু অসুখের কারণ জন্মিয়াছে। পুরুষ যবে স্ত্রীলোককে এবং স্ত্রীলোক যবে পুরুষকে যথার্থ ভাল বাসিতে শিখিবে সেই দিন এই পৃথিবী রম্যস্থান হইয়া উঠিবে। যে পুরুষ স্ত্রীকে উন্নত করিতে পারিলেই আপনাকে সুখী জ্ঞান করেন তিনিই যথার্থ স্ত্রীকে ভাল বাসিতে শিখিয়াছেন। কিন্তু স্ত্রীলোককে উন্নত করিবার অভিপ্রায় যাঁহার অন্তরে কখনও স্থান পায় না অথচ যিনি স্ত্রী সঙ্গ কামনা করেন তিনি কামুক তাঁহার ভালবাসা এবং ব্যাঘ্রের হরিণ শিশুকে ভালবাসা অনেকটা এক রকম।

মানুষ নিজে আপনার মুখ দেখিতে পায় না, সেই জন্য নিজের মুখ দেখিবার জন্য দর্পণের প্রয়োজন হয়; মানুষ তাহার নিজের মন সুন্দর কি কুৎসিৎ সেইটি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না, কিন্তু সেটি না বুঝিয়াও স্থির থাকিতে পারে না; যত দিন সেইটি বুঝিতে না পারে তত দিন এক একখানি দর্পণের প্রয়োজন হয়। স্ত্রী-চিত্ত পুরুষের পক্ষে এবং পুরুষের চিত্ত স্ত্রীর পক্ষে সেই দর্পণ।

দর্পণ নির্ম্মল না হইলে তাহাতে যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাহা সত্যের অনুরূপ হয় না; যে চিত্তে একেবারে কপটতা নাই তাহাই নির্ম্মল কিন্তু এরূপ নির্ম্মল দর্পণ সহজে খুজিয়া মেলে না। হীরক সুবর্ণ প্রভৃতি মহামূল্য রত্ন যখন মাটির ভিতর থাকে তখন তাহারা সমল থাকে পরে ঘসিয়া মাজিয়া, কাহাকে বা আগুনে পুড়াইয়া নির্ম্মল করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ পুরুষরত্ন বা স্ত্রীরত্ন হৃদয়ে ধারণ করিবার ইচ্ছা থাকিলে উহাদিগকে ঘসিয়া মাজিয়া, প্রয়োজন মতে আগুনে পুড়াইয়া নির্ম্মল করিয়া লইতে হয়।

সমল চিত্তকে নির্ম্মল করিবার, কুৎসিতকে সুন্দর করিবার আগ্রতাকে প্রেম প্রণয় ভালবাসা ভক্তি বা স্নেহ নাম দেওয়া যায়। সমলকে নির্ম্মল করিবার অভিপ্রায় যদি না থাকে তবে পুরুষ ও স্ত্রীর পরস্পর যে সঙ্গ লালসা তাহাকে ভালবাসা বলিতে চাই না।

ভালবাসার ভাব তিন প্রকার,—ভক্তিভাব, প্রেমভাব এবং স্নেহভাব। যিনি আমাকে উন্নত করিতে পারিলেই আনন্দিত হন তাঁহার প্রতি আমার যে ভাব তাহার নাম ভক্তি। এই ভক্তি নিবন্ধন ভক্ত ভক্তির পাত্রের আজ্ঞানু-পালনে তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। সৎপাত্র বুঝিয়া যাহাকে উন্নত করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছি তাহার প্রতি আমার যে ভাব দাঁড়ায় তাহার নাম স্নেহ। যেখানে পরস্পর পরস্পরকে উন্নত করিবার জন্য সচেষ্ট সেইখানকার ভাবের নাম প্রেম।

ভক্তির পাত্রে ভক্তি স্নেহের পাত্রে স্নেহ এবং প্রেমের পাত্রে প্রেম ন্যস্ত করিয়া আনন্দের উদ্দেশে সতত অগ্রসর হইতে শিখ।

প্রবোধ।

শীতল চাঁদের আলো
পড়েছে ভুবন ময়,
হাসেরে প্রাণের হাসি
লতা পাতা ফুল চয়।

বিমল চাঁদের আলো
প্রাণেতে পড়েনি ব'লে,
তাই কি পরাণ আজি
উঠিতেছে জ্বলে জ্বলে?

কোন পথে গেছি আমি
আমার আমাকে লয়ে,
সেথায় নাহিক আলো
বিষাদ রহেছে ছেয়ে।

কত কি আমার ছিল
কিছুই নাহিক আর,
জন শূন্য প্রাণ প'ড়ে,
করিতেছে হাহাকার।

অন্ধ কারাগার হ'তে
বার হয়ে আয় প্রাণ
আগেকার মত আজ
বারেক গাহিরে গান।

চাঁদের কিরণে দ্যাখ্
ধরাতল গেছে ভেসে,

যাতি যূথী শেফালিকা
স্বপনে উঠিছে হেসে।

শিহরি উঠিছে বায়ু
পরশি হরষ কায়
আঁধারে ঢাকিয়া তনু
বসে কেন তুই হায়?

ফুলের হাসির মত
বারেক হাসিয়া ওঠ্,
শিশির সিঞ্চন করি,
ফোটারে আঁধার ঠোঁট।

বিমল চাঁদের আলো
কত ভালবাসা ময়,
এ দেখে কি ভালবাসা
প্রাণে নাহি উথলয়?

মিশে যারে অশ্রু জল
বিমল শিশির সনে,
আনন্দ লহরী মালা
উথলি উঠুক মনে।

স্নেহ শিশু গুলি আহা
জন্ম লভি পুনরায়
বেড়াক হৃদয়ে ছুটে
বসন্ত সমীর প্রায়।

অমিয় জড়িত ভাবে
আয় আয় আয় বলি
ডাকিয়ে তাদের চাঁদে
হোক্ তারা কুতুহলী

কত টুকু ভাল বাসা
তোর মনে ছিল প্রাণ
একজনে দিয়ে তাহা
হ'ল তার অবসান ?

হাসে চন্দ্র ভাসে দিক্
উথলি কৌমুদী রাশি
শূন্যে শূন্যে ছুটে গিয়ে
ছড়ায় বিমল হাসি।

চাঁদের মতন আজি
স্থাপি মনে ভালবাসা,
বসন্ত মুকুল সম
লইয়ে শতেক আশা।

অবিশ্রান্ত ভাল বাসা
জগ-জনে বিতরণ
করিয়ে চাঁদের মত
হ' দেখিয়ে ফুল্লানন ?

যে চাবে রে ভালবাসা
করিবি তাহারে দান,
যে ভাল বাসেরে ভাল
তার তত বাড়ে মান।

দান ক'রে ভালবাসা
ফুরাইয়ে যায় যা'র,
হৃদয়ের ভাল বাসা
নহে তার আপনার।

যে ভাল বাসিলে পরে
মানুষে দেবতা হয়,

সেই ভালবাসা আজ
শিক্ষা কর রে হৃদয়।

কালিদাসের উপমা।

আজকাল ইংরেজি সাহিত্য বড় নেড়া রকম—অলঙ্কারশূন্য। পুর্ব্বতন ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যের তুলনা করিলেই ইহা বুঝা যায়। বর্কের বক্তৃতায় এবং গ্লাড্ষ্টোনের বক্তৃতায় তুলনা কর। বর্কের কথা কেমন রসময়ী—অলঙ্কৃতা, নানা রত্নে বিভূষিতা, কাব্যের সপত্নী। গ্লাডষ্টোনের সে সব কোথায়? হব্সের দর্শনশাস্ত্র এবং স্পেন্সারের দর্শনশাস্ত্র তুলনা কর। হব্সের লিপি-প্রণালী—নানাবিধ অলঙ্কারে সুভূষিতা, স্পেন্সরের রচনা "শুষ্ককাষ্ঠস্তিষ্ঠত্যগ্রে"। বেকনের সন্দর্ভ এবং আর্থর হেল্পসের সন্দর্ভ তুলনা কর, এ তুলনা সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা যাইতে পারে। মিল্টনের আরিওপেজিটিকা এবং মিলের লিবর্টি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ তুলনা করিলেও ঐরূপ প্রভেদ দেখা যায়। আর প্রাচীন ইংরেজি কবিদিগের সঙ্গে আধুনিক ইংরেজি কবিদিগের তুলনাই করা যায় না। প্রাচীনদিগের তুলনায় আধুনিকেরা অত্যন্ত ক্ষুদ্রজীবী।

আমরা বাঙ্গালী, ইংরেজের অনুকারী; বাঙ্গালা সাহিত্যও ইংরেজি সাহিত্যের অনুকরণে চলিতেছে, কাজেই আমাদেরও সেই রোগে ধরিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যও সচরাচর বড় অলঙ্কারশূন্য। অলঙ্কারশূন্য বলায় আমার, এমন বলিবার অভিপ্রায় নয় যে, বাঙ্গালা সাহিত্য শব্দাড়ম্বরশূন্য। ইংরেজি সাহিত্যে অন্য অলঙ্কার আজকাল না থাকুক, শব্দাড়ম্বর কিছু আছে; আর বাঙ্গালিরা ভিক্টর হিউগো প্রভৃতি কতকগুলি ফরাসি লেখকের গ্রন্থের অনুবাদও পাঠ করিয়া থাকেন, সুতরাং শব্দাড়ম্বরের আদর্শের তাঁহাদের

অভাব নাই। অতএব বাঙ্গালি লেখকের সে গুণে ঘাট নাই। মশা মারিতে সচরাচর কামানই পাওয়া হইয়া থাকে। যাঁহাকে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবি বলা হইয়া থাকে, সেই মাইকেল মধুসূদনের গ্রন্থেও একটা ইঁদুর নড়িলেই পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে, সমুদ্র গর্জ্জিয়া উঠে, রুদ্রবায়ু সকল পর্ব্বত-গহ্বর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া হুহুঙ্কারে সমুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়— পর্ব্বতশৃঙ্গ খসিয়া পড়ে, লোকালয়ে হুলস্থূল উপস্থিত হয়। * মাইকেল মধুসূদনের গ্রন্থে যা, একখানি ক্ষুদ্র সম্বাদপত্রেও তাই দেখিতে পাই। কিন্তু বিশুদ্ধ— যথার্থ মনোহর—অলঙ্কারের আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে সচরাচর বিশেষ অভাব।

দুঃখের বিষয় এই যে বিশুদ্ধ এবং যথার্থ মনোহর অলঙ্কারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শ দেশীয় সাহিত্যে থাকিতেও বাঙ্গালি লেখকেরা তাহার অনুবর্ত্তী হয় না। সংস্কৃত লেখকদিগের ন্যায় বিশুদ্ধ অলঙ্কার প্রয়োগপটু লেখক-জাতি আর কোন দেশেই জন্মগ্রহণ করেন নাই। বেদপ্রণেতা ঋষিগণ হইতে ঈশ্বর গুপ্ত পর্য্যন্ত সকলেই বিশুদ্ধ অলঙ্কারপ্রয়োগপটু। একা মহাভারতেই যে অলঙ্কারচ্ছটা আছে ইংলণ্ডের সমস্ত সাহিত্য একত্র করিলে তাহার তুলনীয় হইবে কি না সন্দেহ। কিন্তু হিন্দু লেখকদিগের মধ্যে অলঙ্কার প্রয়োগে কালিদাসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অলঙ্কার প্রয়োগ-শক্তি থাকিলেই যে শ্রেষ্ঠ কবি হয়, এমন নহে। কিন্তু যে সকল শক্তি থাকিলে কবি শ্রেষ্ঠকবি হয় কালিদাসের তাহার কিছুরই অভাব ছিল না, প্রায় সকলই পূর্ণ মাত্রায় ছিল। ইউরোপীয়েরা কালিদাসে বুঝিতে পারেন না, এবং মাক্ষমূলরের ন্যায় কেবল ঋগ্বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা কালিদাসকে কেবল "Mere prettinesses" দেখেন। যাঁহারা কালিদাসকে বুঝিতে পারেন তাঁহারা তাঁহাকে পৃথিবীর কোন কবির নিচেয় বসাইবেন না। তবে অন্যান্য গুণে অন্যান্য কবিগণ কেহ না কেহ কালিদাসের সমকক্ষ হইতে পারেন, কিন্তু অলঙ্কার প্রয়োগে কালিদাসের সমকক্ষ হইতে পারে, এমন কেহই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নাই।

* পক্ষান্তরে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে মধুসূদনের রচনায় বিশুদ্ধ অলঙ্কারেরও অভাব নাই।

অলঙ্কার বিবিধ প্রকার—তন্মধ্যে উপমা একজাতীয় অলঙ্কার। ইহাই এখন আমাদের আলোচ্য বিষয়। কালিদাসের উপমা বিখ্যাত। এক্ষণ-কার বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশুদ্ধ অলঙ্কারশূন্য শোভাহীন অবস্থা দেখিয়া কালিদাসের উপমার প্রতি বাঙ্গালি লেখক ও পাঠকদিগের চিত্তাকর্ষণ করা আবশ্যক বোধ হইয়াছে। এজন্য আমরা দুই চারিটা উপমা কালিদাসের কাব্য হইতে সংগ্রহ করিয়া অসংস্কৃতজ্ঞ পাঠককে উপহার দিব ইচ্ছা করিয়াছি। সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকও তাহা পুনঃ পাঠ করিলে সুখী ভিন্ন অসুখী হইবেন না। দুই একটা উপমা সম্বন্ধে আমাদের দুই একটা কথা বলিবারও আছে, এজন্য তাঁহাদিগকে এ প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

আমরা প্রথমতঃ "কুমারসম্ভব" হইতে উপমা সংগ্রহ করিব। কুমার-সম্ভবের প্রায় আরম্ভেই এমন একটী উপমা আছে যে তাহা এখন "কথার কথা" হইয়া দাঁড়াইয়াছে—"Familiar as household words"—লোকের মুখে সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। হিমালয়ের বর্ণনায় কবি হিম ছাড়িতে পারেন না, অথচ হিমটা ভাল জিনিষও নহে। কবি উপমা দ্বারা বুঝাই-তেছেন যে শুধু হিমে হিমালয়ের গুণের লাঘব হইতেছে না।

> অনন্তরত্নপ্রভবস্য যস্য
> হিমং ন সৌভাগ্যবিলোপি জাতং।
> একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে
> নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ॥

হিম অনন্ত রত্নের আকর সেই হিমালয়ের সৌভাগ্য হানি করে নাই. (কেন না) গুণসমূহেতে একমাত্র দোষ—চন্দ্রকিরণেতে কলঙ্কের ন্যায় ডুবিয়া থাকে।

এইখানে উপমা বুঝিবার সম্বন্ধে একটা কথা বলিয়া গেলে বোধ হয় ক্ষতি হইবে না। যে পাঠক সোজা বুঝেন তিনি এই উপমা পড়িয়া বলিবেন যে উপমাটা বড় লাগিল না। কৈ চন্দ্রের কিরণে কলঙ্ক ত ডুবিয়া যায় না—পূর্ণচন্দ্রেও আমরা মৃগাঙ্ক বেশ দেখিতে পাই। কিন্তু যিনি বুঝেন তিনি দেখিবেন যে এই মৃগাঙ্ক পূর্ণচন্দ্রের শোভা বর্দ্ধন করে। চাঁদখানা আগা গোড়া সাদা হইলে তত শোভা হইত না। কলঙ্ক সৌন্দর্য্য রাশির মাঝে

পড়িয়া, নিজে অসুন্দর হইয়াও সৌন্দর্য্যে পরিণত হয়, অসৌন্দর্য্য সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া যায়—নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।

কিন্তু এ উপমার আর এক প্রকার প্রতিবাদ হইতে পারে। সত্য সত্যই কি একটা দোষ গুণরাশিতে ডুবিয়া যায়? একজন ইংরেজি কবি ইহার ঠিক বিপরীত কথা বলিয়াছেন,

"In beauty, faults conspicuous grow,
As smallest speck is seen on snow."

এখন কোন্ কথাটা ঠিক? "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ" সত্বেও যুধিষ্ঠির ধাৰ্ম্মিক, রামচন্দ্র নিরপরাধিনী পত্নী ত্যাগ করিয়াও ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা স্বরূপ পরিচিত, William Pitt প্রভৃতি মদ্য-মাংসের শ্রাদ্ধ করিয়াও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনুষ্যের মধ্যে গণ্য। তাঁহাদের "গুণসন্নিপাতে" এক এক দোষ ডুবিয়া গিয়াছে। ইংরেজ কবির জয় আমরা গায়িতে পারিলাম না। কিন্তু একজন দেশী কবি এই উপমার যে প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহার আর উত্তর নাই বলিলেও হয়। প্রবাদ যে ঘটকর্পর কালিদাসের সমসাময়িক কবি। ইহাও এক প্রকার স্থির হইয়াছে যে কালিদাসের অবস্থা উত্তম ছিল। ডাক্তার ভাওদাজি প্রভৃতি বলেন তিনি কাশ্মীরের রাজা ছিলেন। ঘটকর্পর দরিদ্র ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার মনে মনে বিশ্বাস ছিল যে তিনি কালিদাসের তুল্য কবি, তবে তিনি দরিদ্র বলিয়া তাঁহার কবিতার আদর হয় না। তিনি এক কথায় কালিদাসের উপমার বড় সকরুণ প্রতিবাদ করিলেন।

একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীতি কবি যদ্ভাবে।
নূনং ন দৃষ্টং কবিনাপি তেন
দারিদ্র্য-দোষো গুণরাশিনাশী॥

কথাটা বড় ঠিক্। সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে ঠিক হউক না হউক, আধুনিক বাঙ্গালা সমাজ সম্বন্ধে বড় ঠিক। সর্ব্বগুণসম্পন্ন দরিদ্রের কোন দর নাই, আর সর্ব্বদোষসম্পন্ন ধনী ব্যক্তি অর্জ্জুনের রথধ্বজস্থিত কপির ন্যায় সমাজের চূড়ায় বসিয়া লাঙ্গুলাস্ফালন করিতেছে দেখা যায়।

কুমারের প্রথম সর্গে কবি প্রধানতঃ হিমালয়ের ও হিমালয়কন্যা উমার বর্ণনা করিয়াছেন। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলন—ইহাই কাব্যের উদ্দেশ্য। ইন্দ্রিয়জয় অর্থাৎ কামের ধ্বংস, এবং তপস্যার দ্বারা জীবাত্মা পরমাত্মাকে লাভ করিবে। তৃতীয়ে সেই কামের ধ্বংস বা ইন্দ্রিয়জয়। পঞ্চমে তপস্যা। ইন্দ্রিয়জয় ও তপস্যার ফলে সপ্তমে মোক্ষ, পরমাত্মায় জীবাত্মার লয়, বা হরপার্ব্বতীর বিবাহ। প্রথম সর্গে সেই জীবাত্মার পরিচয়।* সচরাচর কালিদাসের কাব্যের উদ্দেশ্য আদর্শ প্রণয়ণ বা চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি। জীবাত্মাকে পরিস্ফুট করিতে জড়প্রকৃতি এবং তাহাতে বদ্ধ জীবকে পরিস্ফুট করিতে হয়। হিমালয় এই জড়ের চরমাদর্শ এবং উমা এই বদ্ধ জীবের চরমাদর্শ। অতএব কালিদাস প্রথম সর্গে হিমালয় এবং উমার বর্ণন করিয়াছেন। এই উভয় বর্ণনার মধ্যে প্রভেদ এই দেখা যায় যে হিমালয় বর্ণনে উপমার প্রয়োগ বড় অল্প; উমার বর্ণনায় উপমার বড় আধিক্য। তাহার কারণ সহজেই অনুমেয়। জড়ের যে সৌন্দর্য্য তাহা একজাতীয়, উপমার সাহায্য ব্যতীত কেবল বর্ণন মাত্রেই সহজে বুঝা যায়। কিন্তু চৈতন্যবিশিষ্টের বিশেষতঃ জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্যের সৌন্দর্য্য এত জটিল—এমন বহুজাতীয়, যে সহজে বাক্যে তাহা ধরা যায় না,—উপমার প্রয়োজন হয়। উমার বর্ণনা হইতে আমরা দুইটী উদাহরণের দ্বারা ইহা দেখাইতেছি। একটী মানসিক সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে, আর একটী শারীরিক সৌন্দর্য্যসম্বন্ধে।

উমাকে কালিদাস প্রকৃত মানবীস্বরূপ চিত্রিত করিয়াছেন। পূর্ব্বকালে আর্য্য কন্তাকে সচরাচর লেখাপড়া শিখানর প্রথা ছিল; উমাকেও বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইল। কিন্তু উপদেশকালে মেধাবিনী উমা এমনি সহজে বিদ্যা লাভ করিলেন যে তাহা উপমার দ্বারা ভিন্ন বুঝান যায় না। কবি বলিতেছেন, যে উমার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিতা বিদ্যা যথাসময়ে আপনি আসিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইল। যেমন হংসগণ অন্য সময়ে যেখানেই থাকুক না

* জ্ঞানমার্গে মুক্তি লাভের রূপক হরপার্ব্বতীর উপন্যাস। ভক্তিমার্গে মুক্তি লাভের রূপক রাধাকৃষ্ণের উপন্যাস।

শরৎকালে গঙ্গায় আসিয়া উপস্থিত হইবেই; যেমন ওষধি সকলের প্রভা রাত্রি হইলে আপনিই সঞ্চারিত হয়, তেমনি উপদেশ কাল উপস্থিত হইলে বিদ্যা আসিয়া উমাকে প্রাপ্ত হইল,

তাং হংসমালাঃ শরদিব গঙ্গাং
মহৌষধিং নক্তমিবাত্মভাসঃ।
স্থিরোপদেশামুপদেশকালে
প্রপেদিরে প্রাক্তন-জন্ম-বিদ্যাঃ॥

শারীরিক সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে উপমাটী আরও সুন্দর। উমার প্রথম যৌবন সঞ্চারের শোভা সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন,

উন্মীলিতং তুলিকয়েব চিত্রং
সূর্য্যাংশুভির্ভিন্ন মিবারবিন্দং।
বভূব তস্যাশ্চতুরস্রশোভি
বপুর্বিভক্তং নবযৌবনেন॥

যেমন তুলিকার সম্বন্ধে চিত্র উদ্ভাসিত হয়, যেমন অরবিন্দ সূর্য্য রশ্মির দ্বারা প্রোদ্ভিন্ন হয় তেমনি তাঁহার "সর্ব্বত্র ন্যূনাতিরেকশূন্য" দেহ নবযৌবনের দ্বারা উদ্ভিন্ন হইল।

চতুরস্রশোভি শব্দের প্রতিশব্দ দুর্লভ। মল্লিনাথ অনুবাদ করিয়াছেন "ন্যূনাতিরেক শূন্য" আমরাও তাই রাখিলাম। ইংরেজি Symmetrical শব্দ কথাটা উহার নিকটে আইসে। কিন্তু বস্তুতঃ সূর্য্যাংশুভিন্ন অরবিন্দের চতুরস্র শোভা না মনে করিলে, ইহার অপরিমেয় সৌন্দর্য্য বুঝা যায় না। এই শব্দটী এখানে অমূল্য, আর উপমা দুটীও অমূল্য।

দ্বিতীয় সর্গে তারকাসুর-পীড়িত দেবগণ স্বর্গের দ্বারে উপায় জন্য ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত। দেবগণ সম্মুখে বিধাতার রূপ প্রকাশ কালিদাস উপমার দ্বারা বুঝাইতেছেন।

তেষা মাবিরভূদ্ব্রহ্মা পরিম্লানমুখশ্রিয়াং।
সরসাং সুপ্তপদ্মানাং প্রাতর্দীধিতিমানিব॥

অর্থাৎ পরিম্লানমুখশ্রী সেই দেবগণের সম্মুখে ব্রহ্মা আবির্ভূত হইলেন যেমন সুপ্তপদ্ম সরোবরের সম্মুখে প্রাতঃসূর্য্যের প্রকাশ হয়। এইস্থলে

উপমা বুঝাইবার জন্য কিছু বলিবার আছে। তাহা বুঝাইবার জন্য বর্ত্তমান লেখক প্রণীত কালিদাসের উপমা সম্বন্ধীয় পূর্ব্বপ্রচারিত একটি প্রবন্ধ হইতে প্রথমতঃ কিছু উদ্ধৃত করিব। যাহা বক্তব্য তাহা পূর্ব্ব প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইব।

"উপমা দ্বিবিধ। প্রথম সামান্য উপমা। কতকগুলি উপমাতে কেবল একটী বস্তুর সহিত আর একটী বস্তুর সাদৃশ্য নির্দ্দিষ্ট হয়, যথা চন্দ্র তুল্য মুখ। ইহার নাম সামান্য উপমা দেওয়া যাইতে পারে।

"দ্বিতীয়, যুক্ত উপমা। যেখানে দুইটী বা ততোধিক পরস্পরের সম্বন্ধের সাদৃশ্য প্রদর্শিত হয় সেখানে উপমার নাম যুক্ত দেওয়া যাইতে পারে। মেঘ যেমন বারি বিকীর্ণ করে, রাজা দশরথ তেমনি ধন বিকীর্ণ করিয়াছিলেন। এই উপমার এক দিকে দশরথ ও ধন একটী বিশেষ সম্বন্ধ বিশিষ্ট; দশরথ ধন ব্যয়কারী, ধন দশরথ কর্ত্তৃক ব্যয়িত। অন্য দিকে মেঘ ও জল সেই রূপ সম্বন্ধ বিশিষ্ট—মেঘ ব্যয়কারী, জল মেঘ কর্ত্তৃক ব্যয়িত। মেঘের সঙ্গে দশরথ এবং জলের সঙ্গে ধন তুলিত। সামান্যতঃ মেঘ ও দশরথে বা ধনে এবং জলে কোন সাদৃশ্য নাই, কিন্তু এখানে কল্পিত সম্বন্ধবশতই সাদৃশ্য ঘটিল। অতএব এখানে সম্বন্ধই উপমেয়। সম্বন্ধের যেরূপ সাদৃশ্য, যদি সম্বন্ধ বিশিষ্টেরও সেইরূপ সাদৃশ্য থাকে, সেই উপমাই সম্পূর্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। উপরে তেষামাবিরভূৎ ইত্যাদি যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি ইহাতে এইরূপ সম্পূর্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উপমা আছে। এখানে চারিটী বস্তু চারিটীর সঙ্গে তুলিত। (১) দেবতাদিগের মুখ ও সরোবরের পদ্ম, (২) দেবতাদিগের মুখের পরিম্লানাবস্থা এবং পদ্মগণের সুপ্তাবস্থা, (৩) ব্রহ্মা এবং প্রাতঃসূর্য্য, (৪) অপর দুইটী যুগ্মের সহিত শেষোক্ত যুগ্মের সম্বন্ধ অর্থাৎ ম্লানাবস্থাপন্ন দেবগণের মুখের সঙ্গে এবং সুপ্তাবস্থাপন্ন পদ্মের সঙ্গে ব্রহ্মা ও প্রাতঃসূর্য্যের সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধ এই যে, উভয়েই প্রফুল্লতা সম্পাদন করে। অতএব সম্বন্ধের সাদৃশ্য সম্পূর্ণ। কিন্তু সম্বন্ধবিশিষ্টেরও সাদৃশ্য তেমনি সম্পূর্ণ। কেন না দেবতাদিগের মুখ ও পদ্ম উভয়েই সুন্দর; পদ্মের সঙ্গে সুন্দর মুখের সাদৃশ্য এত সহজে অনুমেয় যে পদ্মমুখ ইতি উপমা চিরপ্রচলিত। পরে ম্লানমুখে এবং মুদিতপদ্মে সাদৃশ্যও বড় সুন্দর।

এবং শেষে তেজঃপুঞ্জ ব্রহ্মরূপে এবং তেজঃপুঞ্জ সূর্য্যে তুলনাও অতি সুন্দর। অতএব এই উপমা সম্পূর্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর—ঈদৃশ উপমা অতি দুর্লভ। কিন্তু কালিদাসের এমনই শক্তি যে কেবল সুন্দর মুখের সহিত পদ্মের সাদৃশ্য এই প্রাচীন উপমা লইয়া তিনি অনেকবার এইরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নূতন উপমা প্রযুক্ত করিয়াছেন। দুই একটা উদ্ধৃত করিতেছি।

মেঘদূতের যক্ষ মেঘকে বলিতেছেন,

রাজন্যানাং শিতশরশতৈর্ষত্র গাণ্ডীবধন্বা
ধারাপাতৈস্ত্বমিবকমলান্যভ্যবর্ষণ্মুখানি ॥

যেখানে (অর্থাৎ ব্রহ্মাবর্ত্তে) গাণ্ডীবধন্বা (অর্জ্জুন) নিশিত শর নিকরের দ্বারা ভূপতিবর্গের মুখ সকল নিষিক্ত করিয়াছিলেন, বৃষ্টিধারার দ্বারা তুমি যেমন পদ্ম সকল নিষিক্ত কর।

এর একটী রঘুবংশ হইতে।

ইদমুচ্ছসিতালকং মুখং
তববিশ্রান্তকথং দুনোতি মাং।
নিশিসুপ্তমিবৈকপঙ্কজং
বিরতাভ্যন্তরষট্পদস্বনং ॥

বায়ুবশে অলকাগুলি চালিত হইতেছে অথচ বাক্যহীন তোমার এই মুখ রাত্রিকালে প্রমুদিত, সুতরাং অভ্যন্তরস্থিত ভ্রমরের গুঞ্জন রহিত, একটী পদ্মের ন্যায় আমাকে ব্যথিত করিতেছে।

পুনশ্চ—

যবনীমুখপদ্মানাং সেহে মধুমদং ন সঃ।
বালাতপমিবাজ্ঞানামকালজলদোদয়ঃ ॥

অকালে উদিত মেঘ যেমন পদ্মের বালাতপ (রঞ্জন) সহিতে পারে না, তেমনই তিনি (রঘু) যবন রমণীগণের মুখ পদ্মের মধুমদ সহ্য করিতে পারেন নাই। অর্থাৎ যেমন অকাল জলদ পদ্মকে রৌদ্রে রাঙ্গা হইতে দেয় না, রঘু ও যবনীদিগের মুখগুলিকে রঞ্জিত করিতে দেন নাই। স্বামীবধ দুঃখে তাহারা কাতর।

জগতের সকল বস্তুই উপমার বিষয় হইতে পারে, এবং এক বস্তুই ভিন্ন ভিন্ন

বিষয়ের সহিত তুলনীয় হইতে পারে। কালিদাসের কখন কখন এমন আশ্চর্য্য কৌশল দেখিতে পাই, যে এক বস্তুর সঙ্গে যাহার তুলনা করিলেন সময়ান্তরে ঠিক তাহার বিপরীত প্রকৃতির বস্তুর সঙ্গে তুলনা করিবেন; সাদৃশ্যও দেখাইবেন এবং তদুপলক্ষে অত্যুৎকৃষ্ট কবিত্বের অবতারণা করিবেন। একটা উদাহরণ দিতেছি। আমরা দেখিয়াছি, যে উমার যৌবনোদ্ভেদ চিত্রের সঙ্গে তুলিত করিয়া কালিদাস বড় সুস্পষ্ট করিলেন। বাল্যে যে সৌন্দর্য্য জীবন শূন্য ছিল চিত্রের তুলনায় তাহা জীবনময় হইয়া উঠিল। আবার নিম্নলিখিত কবিতায় দেখিব যে যাহা অত্যন্ত জীবনময়, তাহা অত্যন্ত নির্জীব করিয়া প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত সেই চিত্রের সঙ্গেই তুলিত করিতেছেন। মহাদেব অরণ্য মধ্যে দেবদারুদ্রুমবেদিকায় তপস্যায় নিমগ্ন। তপোবিঘ্ন বিনাশার্থে নন্দী লতা-গৃহ-দ্বারে দাঁড়াইয়া আপনার বামপ্রকোষ্ঠে হেম-বেত্র রক্ষা করিয়া মুখে অঙ্গুলি মাত্র প্রদান করিয়া ইঙ্গিত দ্বারা সকলের চাপল্য নিষেধ করিতেছেন, তাহাতে সমস্ত তপোবন নিস্তব্ধ হইয়া আছে।

নিষ্কম্পবৃক্ষং নিভৃতদ্বিরেফং
মূকাণ্ডজং শান্তমৃগপ্রচারং।
তচ্ছাসনাৎ কাননমেবসর্ব্বং
চিত্রার্পিতারম্ভমিবাবতস্থে॥

গাছের পাতা নড়িতেছে না, ভ্রমর সকল লুকাইয়াছে, পক্ষী সকল নীরব, বনে আর মৃগ বিচরণ করে না, নন্দীর শাসনে সেই কানন সর্ব্বত্র চিত্রার্পিতবৎ নিস্তব্ধ। নীরব ও নির্জনতার বর্ণনা এরূপ আর কোথাও দেখা যায় না। কোল্‌রিজ কৃত Ancient Mariner নামক কাব্যে বায়ুশূন্য সমুদ্রে গতিশূন্য অর্ণবযানের এইরূপ একটা বর্ণনা আছে, সেখানেও এইরূপ চিত্রের উপমা আছে— .

Like a painted ship on a painted ocean !

কিন্তু কোল্‌রিজের সে বর্ণনা কালিদাসের এ বর্ণনার কাছে তুলনীয় নহে। কালিদাস ও আর এক স্থানে (রঘুবংশে) নীরব ও নির্জ্জন বর্ণন করিয়াছেন, সেও অতি সুন্দর।

অথার্দ্ধরাত্রে স্তিমিতপ্রদীপে
শয্যাগৃহে সুপ্তজনে প্রবুদ্ধঃ।
কৃশঃ প্রবাসস্থকলত্রবেশ্যা
অদৃষ্টপূর্ব্বাং বনিতামপশ্যৎ ॥

কিন্তু ইহাও পূর্ব্বোক্ত কবিতার তুলনীয় নহে।

আর স্থান নাই, এ জন্য আর বিস্তারিত টীকার সহিত উদাহরণ গুলি বুঝাইতে পারিতেছি না। এই কুমারের তৃতীয় সর্গে একটী শ্লোকে এমন কয়েকটী উপমা আছে যে বোধ হয়, আর কখন কোন কবি কর্ত্তৃক তাদৃশ উৎকৃষ্ট উপমা প্রযুক্ত হয় নাই। যোগস্থিত মহাদেবের বর্ণনায় কবি লিখিতেছেন—

অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহ
মপামিবাধারমনুত্তরঙ্গং।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধা
ন্নিবাত নিষ্কম্পমিব প্রদীপং ॥

যোগস্থিত মহাদেব বৃষ্টি সংরম্ভশূন্য মেঘের সহিত, তরঙ্গশূন্য সমুদ্রের সহিত এবং বায়ু ও কম্পশূন্য প্রদীপের সহিত তুলিত হইলেন। কিন্তু উপমা সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহার সাহায্যে পাঠক যেন এই কবিতাটীর বিচার করেন।

কালিদাসের উপমা সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা পুনর্মুদ্রিত হয় নাই এবং হইবারও সম্ভাবনা নাই এবং বঙ্গদর্শনের যে সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা এখন পাঠকদিগের প্রাপ্যও নহে। অতএব সেই প্রবন্ধে উদ্ধৃত আর কয়েকটী উপমা আমরা অন্যান্য উপমার সহিত সঙ্কলিত করিলাম।

উমার বর্ণনা কালে—

আবর্জ্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং
বাসো বসানা তরুণার্ক রাগং।
পর্য্যাপ্ত পুষ্পস্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব ॥

স্তনভরে (উমার) শরীর যেন ঈষৎ নত হইয়াছে। বালসূর্য্যের ন্যায় অরুণবর্ণের বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন। যেন পর্য্যাপ্ত পুষ্প স্তবকে নম্র ও নবপল্লবশালিনী লতা বায়ুভরে ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে।

বসন্ত এবং মদনের কার্য্যে

হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্য্য

শ্চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ—

চন্দ্রোদয়ে জলনিধির ন্যায় মহাদেব ও কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন।

পরে রতিবিলাপে—

কৃতবাংস্ত্বমধীনজীবিতাং

বিনিকীর্য্য ক্ষণভিন্নসৌহৃদঃ।

নলিনীং ক্ষতসেতুবন্ধনো

জলসংঘাতইবাসি বিদ্রুতঃ॥

ভগ্নসেতুবন্ধ জলরাশি যেমন জলাধীন জীবিতা নলিনীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করে, তদ্রূপ ত্বদধীনজীবিতা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণমাত্রে প্রণয় ভগ্ন পূর্ব্বক কোথায় পলায়ন করিলে?

কামসখ বসন্তকে রতি বলিতেছেন—

গতএব ন তে নিবর্ত্ততে

স সখা দীপইবানিলাহতঃ।

অহমস্য দশেব পশ্যমা

মবিষহ্য ব্যসনেন ধূমিতা॥

তোমার সেই সখা বায়ুতাড়িত দীপের ন্যায় পরলোক গমন করিয়াছেন, আর ফিরিবেন না। আমি নির্ব্বাপিত দীপের দশাবৎ অসহ্য দুঃখে ধূমিত হইতেছি দেখ।

রতির প্রতি অনুকূল আকাশবাণী হইল—

ইতি দেহবিমুক্তয়ে স্থিতাং

রতিমাকাশভবা সরস্বতী।

সফরীং হ্রদশোষবিক্লবাং

প্রথমা বৃষ্টিরিবান্বকম্পয়ৎ॥

সরোবর শুষ্ক হইলে বিপন্না সফরীকে প্রথম জলধারা যেমন অনুকম্পা প্রদর্শন করে, সেইরূপ দেহ ত্যাগে কৃতনিশ্চয় রতিকে আকাশবাণী অনুগৃহিত করিল।

উমা তপশ্চারণে অভিলাষিণী হইয়ে জননী মেনকা তাহাকে বিরত করিতেছেন—

মণীষিতাঃ সন্তি গৃহেষু দেবতা
তপঃ ক বৎসে ক চ তাবকং বপুঃ।
পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং
শিরীষপুষ্পং ন পুনঃ পতত্রিণঃ॥

হে বৎসে গৃহেতেই মনোভীষ্ট দেবতা আছেন। তুমি তাঁহাদিগের আরাধনা কর। কষ্টসাধ্য তপই বা কোথায় আর তোমার সুকোমল শরীরই বা কোথায়? কোমল শিরীষ কুসুম কেবল ভ্রমরেরই পদভার সহ্য করিতে পারে, পক্ষীর পারে না।

মেঘদূতে—

তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতংমে দ্বিতীয়ং
দূরীভূতে ময়িসহচরে চক্রবাকীমিবৈকাং।
গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুষু দিবসেষেষু গচ্ছৎস্মুবালাং
জাতাং মন্যে শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাং॥

আমি প্রিয়ার সদাই সহচর ছিলাম। কিন্তু দৈব নিগ্রহে এক্ষণে দূরবর্তী। সুতরাং সহচর চক্রবাক বিরহিত একাকিনী চক্রবাকী তুল্যা সেই মিত-ভাষিণীকে আমার দ্বিতীয় জীবিত তুল্য জানিবে। আমি অনুমান করিতেছি প্রবল উৎকণ্ঠান্বিতা সেই সুকোমলাঙ্গী বিরহমহৎ এই সকল দিবস অতি-ক্রান্ত হইতে হইতেই হিমক্লিষ্টা পদ্মিনীর ন্যায় পূর্ব্বাকারের বিপরীতাকার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

নূনং তস্যাঃ প্রবল রুদিতোচ্ছূননেত্রং প্রিয়ায়াঃ
নিশ্বাসানামশিশিরতয়া ভিন্নবর্ণাধরৌষ্ঠং।
হস্তন্যস্তং মুখমসকলব্যক্তি লম্বালকত্বা
দিন্দোর্দৈন্যং ত্বদনুসরণ ক্লিষ্টকান্তের্বিভর্ত্তি॥

হে মেঘ! প্রবল রোদন হেতু উচ্ছলিত নেত্র, উষ্ণ নিশ্বাস বশতঃ বিবর্ণ অধরোষ্ঠ, সংস্কারাভাবে লম্বমান কুন্তলহেতু অসম্পূর্ণ প্রকাশিত এবং করতলবিন্যস্ত প্রিয়ার বদন, তোমারই অবরোধে ম্লানকান্তি চন্দ্রের ন্যায় হইয়াছে।

তামুত্তীর্য্য ব্রজ পরিচিত ভ্রূলতা বিভ্রমানাং
পক্ষোৎক্ষেপাদুপরিবিলাস কৃষ্ণসারপ্রভানাং।
কুন্দক্ষেপানুগ মধুকর শ্রীমষামাত্ম বিম্বং
পাত্রীকুর্ব্বন্দশ পুরবধূনেত্র কৌতুহলানাং॥

এই কবিতায় দশ-পুরবধূ দিগের উৎক্ষিপ্ত কটাক্ষের সহিত প্রক্ষিপ্ত কুন্দের অনুগামী মধুকরের তুলনা করা হইয়াছে।

ঈশ্বর গুপ্তের জীবন চরিতে যে উপমাকে লক্ষ্য করিয়া দেশী রুচি ও বিলাতি রুচির প্রভেদ দেখান গিয়াছে সে উপমা এই—

ছন্নোপান্তঃ পরিণতফলদ্যোতিভির্কাননাম্রৈ
স্তয্যারূঢ়ে শিখরমচলঃ স্নিগ্ধবেণীসবর্ণে।
নূনং যাস্যত্যমরমিথুনপ্রেক্ষণীয়ামবস্থাং
মধ্যেশ্যামঃ স্তন ইব ভুব শেষবিস্তারপাণ্ডুঃ॥

ঈশ্বরের গুপ্তের জীবনীতে ইহার তাৎপর্য্য বুঝান হইয়াছে। এখানে পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

আধিক্ষামাং বিরহশয়নে সন্নিষণ্ণৈকপার্শ্বাং
প্রাচীমূলে তনুমিব কলা মাত্র শেষাং হিমাংশোঃ—

হে মেঘ! মানসিক যন্ত্রণায় কৃশাঙ্গী বিরহশয্যায় এক পার্শ্বে শায়িনী—সেই প্রিয়াকে পূর্ব্বদিকে কলামাত্রাবশিষ্ট চন্দ্রের ন্যায় দেখিবে।

পাদানিন্দোরমৃত শিশিরান্ জালমার্গ প্রবিষ্টান্
পূর্ব্বপ্রীত্যা গতমভিমুখং সন্নিবৃত্তং তথৈব।
চক্ষুঃখেদাৎ সলিলগুরুভিঃ পক্ষ্মভিশ্ছাদয়ন্তীং
সাভ্রেহ্নীব স্থলকমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাং॥

পূর্ব্ববৎ প্রীতিপ্রদ হইবে বলিয়া গবাক্ষপথে প্রবিষ্ট শীতল চন্দ্ররশ্মির প্রতি গত, কিন্তু অসহ্য বোধে তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবৃত্ত চক্ষু, জলভরগুরুপক্ষ্ম

দ্বারা আচ্ছাদন করতঃ, মেঘাচ্ছন্ন দিনে অবিকসিত অথচ অমুদিত স্থলনলিনীর অবস্থাপ্রাপ্ত তাঁহাকে দেখিবে।

রুদ্ধাপাঙ্গপ্রসরমলকৈরঞ্জনস্নেহশূন্যং
প্রত্যাদেশাদপিচ মধুনো বিস্মৃতভ্রূবিলাসং।
ত্বয্যাসন্নে নয়নমুপরিস্পন্দি শঙ্কে মৃগাক্ষ্যা—
মীনক্ষোভাকুল কুবলয় শ্রীতুলামেষ্যতীতি॥

অবিন্যস্ত দীর্ঘালকবশতঃ অপাঙ্গ প্রসরবিহীন, স্নিগ্ধাঞ্জনরহিত, মধুপানাভাবে ভ্রূবিলাসবর্জ্জিত, মৃগ নয়নীর নয়ন তুমি নিকটবর্ত্তী হইলে উপরিভাগে স্পন্দিত হইয়া মীনচলনবশতঃ চঞ্চল কমলশোভার তুলনা প্রাপ্ত হইবে।

যে অলকানগরীতে মেঘ যাইবে সেই অলকানগরীর প্রাসাদ সমূহের সহিতই কবি মেঘের তুলনা করিতেছেন।

বিদ্যুত্বন্তং ললিতবনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ
সঙ্গীতায় প্রহতমুরজাঃ স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষং।
অন্তস্তোয়ং মনিময়ভুবস্তুঙ্গমভ্রংলিহাগ্রাঃ
প্রাসাদাস্ত্বাং তুলয়িতুমলং যত্র তৈস্তৈর্বিশেষৈঃ॥

মেঘে যেমন বিদ্যুৎ আছে অলকানগরীর প্রাসাদে তেমনই সুন্দরী রমণী আছে, মেঘে যেমন ইন্দ্রধনু, প্রাসাদ সকলে তেমনি চিত্রশ্রেনী, মেঘের যেমন স্নিগ্ধ গম্ভীর গর্জ্জন, প্রাসাদ সকলে তেমনি সঙ্গীতার্থবাদিত মৃদঙ্গ বাদ্য—মেঘের জল, প্রাসাদের মণি—মেঘ যেমন উচ্চ, প্রাসাদ সকল তেমনই মেঘস্পর্শী।

স্ত্রীলোকদিগের হৃদয়ের কোমলতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উপমাটী সুন্দর—

আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রায়শোহ্যঙ্গনানাং
সদ্যঃপাতি প্রণয়িহৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি।

অর্থাৎ কুসুম যেমন শুষ্ক হইলেও বোঁটায় আটক থাকে, স্ত্রীলোকদিগের কুসুমসুকুমার হৃদয়ও বিরহ দুঃখে সদ্যঃপাতী অর্থাৎ ভগ্নপ্রায় হইলেও আশাবৃন্তে বদ্ধ হইয়া থাকে—আশাকেই অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষা করে।

[ক্রমশঃ।